গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০২৫

Date 05/08/2024

মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান। তোমার কথা অমান্য কোরে বের হোলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাই রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম কোরে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধি কিশোর, ৭ বছরের বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেনো বোসে থাকবো ঘরে। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর ভয় কোরে স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেঁচে না ফিরি তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।

আনাস

Apetiz

উৎসর্গ

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ উৎসর্গকারী জুলাই শহিদ আনাসসহ অন্যান্য জুলাই শহিদ ও অসম সাহসী জুলাই যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদনটি আমরা উৎসর্গ করছি।

* পূর্বের পৃষ্ঠার চিঠিটি চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ আনাসের মায়ের কাছে লেখা শেষ চিঠি।

প্রকাশক
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ
চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমন্বয়
মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

* এই বইয়ের কোনো কপিরাইট নেই। যে কেউ
কোনোরকম পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ছাড়া
প্রতিবেদনের মূল লেখা প্রকাশ ও বিতরণ করতে পারেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার মাধ্যমে। এই অভ্যুত্থানের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশে এমন এক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত হবে, কোনও ব্যক্তি বা দল দেশের মানুষের জীবন ও দেশের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না, সকলের ভোট দেবার অধিকার আর কোনও দিন লুণ্ঠিত হবে না এবং নাগরিকদের সম্মতিতে দেশ পরিচালিত হবে। দেশ পরিচালনার এই পদ্ধতি তৈরি করতে হলে দরকার বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহিদরা, যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারের দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপরে অর্পণ করেছেন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ১১টি সংস্কার কমিশন গঠণ করা হয়েছে। এইসব কমিশনের সদস্যরা নিরলস পরিশ্রম করে সংস্কারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করছেন। কমিশনগুলোর এইসব প্রতিবেদন মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্ষিত হবে। এখান থেকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কতটুকু গ্রহণ করবো, কোনটা কখন কাজে লাগাতে পারব, কিভাবে অগ্রসর হবো তা নির্ধারণের জন্য দরকার দেশের সব মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশন সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, পুলিশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত ৫টি সংস্কার কমিশন গণমাধ্যম, নারী বিষয়ক, স্থানীয় সরকার, শ্রম এবং স্বাস্থ্যখাত সংস্কার বিষয়ক কমিশনগুলোর প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করা হল।

জুলাই অভ্যুত্থানে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ-দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এখন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত এবং মসৃণ হোক এই কামনা করে এই সুপারিশমালা দেশবাসীর নিকট তুলে দিলাম।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় কমিশন প্রধানের বাণী

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং এ কমিশন গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী সমাজ তাদের দীর্ঘদিনের দাবি, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা একটি মলাট বন্দি দলিলে সন্নিবেশিত করার ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন প্রণয়নে কোন বিশেষ ধর্ম, শ্রেণী, পেশা, জাতিস্বত্তা বা গোষ্ঠীকে বিবেচনা না করে একটি সর্বজনীন দলিল তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছে। তথাপি সব মতাদর্শের মানুষ বিনা বাক্যে আমাদের সকল প্রস্তাব যে গ্রহণ করবেনা এটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হবে এটাই প্রত্যাশিত। আমি মনে করি নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বিভিন্ন আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে পরিচিতি পাবে।

এ মলাট বন্দী দলিলের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন স্বল্প বা মধ্যমেয়াদে সম্ভব নয়; কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে নারী আন্দোলনের দাবি জনগণ অনুধাবন করবে এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে ও জন পরিসরে গুরুত্ব পাবে।

শিরীন পারভিন হক

কমিশন প্রধান
নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন
এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, নারীপক্ষ

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

মাহীন সুলতান
সদস্য, এবং
সিনিয়র ফেলো, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট

কামরুন নাহার
সদস্য, এবং
আইনজীবি ও পরিচালক, নারীপক্ষ

ফৌজিয়া করিম ফিরোজ
সদস্য, এবং
সিনিয়র আইনজীবি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও
সভাপতি, ফাউন্ডেশন ফর ল' এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ফ্ল্যাড)

কল্পনা আক্তার
সদস্য, এবং
সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশন

হালিদা হানুম আক্তার
সদস্য, এবং
নারী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

সুমাইয়া ইসলাম
সদস্য, এবং
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

নিরূপা দেওয়ান
সদস্য, এবং
সাবেক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ফেরদৌসী সুলতানা বেগম
সদস্য, এবং
জেন্ডার ও সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ

নিশিতা জামান নিহা
সদস্য, এবং
শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন

সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলুপ্তি এবং নারী-পুরুষ এর সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ

সূচিপত্র

সূচিপত্র.. xiii

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার... xvii

শব্দসংক্ষেপ.. xviii

সারসংক্ষেপ.. xxi

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা.. ১

১.১ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট.. ৩

১.২ বাংলাদেশ নারী উন্নয়নে সংস্কার উদ্যোগ ও নারীদের অবস্থা ও অবস্থান..................... ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম... ৯

২.১ লক্ষ্য.. ১১

২.২ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম.. ১১

তৃতীয় অধ্যায়: সংবিধান, আইন ও নারীর অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি.......................... ১৩

৩.১ ভূমিকা... ১৫

৩.২ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়... ১৫

৩.২.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.. ১৫

৩.২.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন.. ২২

চতুর্থ অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহ...................... ২৯

৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.. ৩১

৪.২ বৈষম্য, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ.. ৩৩

৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়... ৩৫

৪.৩.১ অন্তর্বর্তী.. ৩৫

৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিতসরকারের মেয়াদে করণীয়... ৩৮

৪.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন.. ৪০

পঞ্চম অধ্যায়: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন............ ৪১

৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.. ৪৩

৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ... ৪৩

৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়... ৪৪

৫.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.. ৪৪

৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়.. ৪৫

৫.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন.. ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: নারী ও মেয়েশিশুর জন্য সংহিসতামুক্ত সমাজ................ ৪৯
৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা................ ৫১
৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ................ ৫২
৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়................ ৫৪
৬.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়................ ৫৬
৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়................ ৫৬
৬.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন................ ৫৭
সপ্তম অধ্যায় জনপরিসরে নারীর ভূমিকা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে)................ ৫৯
৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা................ ৬১
৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ................ ৬২
৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়................ ৬৩
৭.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়................ ৬৩
৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়................ ৬৩
৭.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন................ ৬৭
অষ্টম অধ্যায়: জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ................ ৬৯
৮.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা................ ৭১
৮.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ................ ৭১
৮.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়................ ৭৩
৮.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়................ ৭৩
৮.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়................ ৭৪
৮.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন................ ৭৬
নবম অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি................ ৭৭
৯.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা................ ৭৯
৯.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ................ ৭৯
৯.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়................ ৮১
৯.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়................ ৮১
৯.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়................ ৮৪
৯.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন................ ৮৬

দশম অধ্যায়:........ ৮৭

১০.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা........ ৮৯

১০.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ........ ৯০

১০.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়........ ৯২

১০.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়........ ৯২

১০.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়........ ৯৫

১০.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন........ ৯৭

একাদশ অধ্যায়: অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার........ ৯৯

১১.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা........ ১০১

১১.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ........ ১০২

১১.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়........ ১০৩

১১.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়........ ১০৩

১১.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়........ ১০৫

১১.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন........ ১০৮

দ্বাদশ অধ্যায়: শ্রম ও কর্মসংস্থান........ ১০৯

১২.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা........ ১১১

১২.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ........ ১১১

১২.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়........ ১১৩

১২.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়........ ১১৩

১২.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়........ ১১৪

১২.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন........ ১১৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়: নারী-শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন........ ১১৭

১৩.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা........ ১১৯

১৩.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ........ ১১৯

১৩.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়........ ১২০

১৩.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়........ ১২০

১৩.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়........ ১২২

১৩.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন........ ১২৪

চতুর্দশ অধ্যায়: দারিদ্র-হ্রাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা ১২৭
১৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১২৯
১৪.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ ১৩০
১৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ১৩১
১৪.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয় ১৩১
১৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয় ১৩২
১৪.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ১৩৫
পঞ্চদশ অধ্যায়: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ন ও প্রকাশ ১৩৭
১৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১৩৯
১৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ ১৪০
১৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ১৪২
১৫.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয় ১৪২
১৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয় ১৪৪
১৫.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ১৪৫
ষোড়শ অধ্যায়: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ ১৪৭
১৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১৪৯
১৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ ১৪৯
১৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ১৫২
১৬.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয় ১৫২
১৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয় ১৫৫
১৬.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ১৫৬
সপ্তদশ অধ্যায়: নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয় ১৫৭
১৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১৫৯
১৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ ১৬০
১৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ১৬১
১৭.৩.১ অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয় ১৬১
১৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয় ১৬২
১৭.৩.৩ আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ১৬৫
সংযুক্তিসমূহ ১৬৭
সংযুক্তি ১: প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশনের কাঠামো ও ভূমিকা ১৬৯
সংযুক্তি ২: নারী বিষয়ক সংস্কার উদ্যোগের সময়রেখা ১৭৪
সংযুক্তি ৩: তথ্যসূত্র ১৮৩

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে গঠিত ১০ সদস্য-বিশিষ্ট নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। সময়, শ্রম, মেধা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কমিশনের সদস্য ও সহায়কদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে নারীর অধিকার-রক্ষা, নারী-পুরুষ বৈষম্যদূরীকরণ ও নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের বিষয়গুলো প্রতিবেদনে তুলে আনার জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় পরামর্শ-সভা করেছে। সভায় অংশীজনরা মূল্যবান মতামত ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন এবং কমিশনকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। অনেকে লিখিত সুপারিশ জমা দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরামর্শ-সভা ছাড়াও বিভিন্ন সংশ্লিষ্টজনের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত ১১টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ব্যতীত অন্য সকল কমিশনের সাথে বৈঠক করা হয়েছে। হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও সময় ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করে আমাদের সহায়তা করার জন্য তাঁদের প্রতি কমিশন কৃতজ্ঞ।

নিরবিচ্ছিন্ন দাপ্তরিক সুবিধা-প্রদানের মাধ্যমে কমিশনকে সহায়তা দিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাদের সহযোগিতা করেছেন। ঢাকার বাইরে অংশীজন পরামর্শ সভা আয়োজনে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন রাঙামাটিতে জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ এর জেলা প্রসাশন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ ছাড়া ইফফাত জাহান অন্তরা, মোসা. ফাতিমা আক্তার, নাঈমুল আলম, ফাইজা মেহেরীন ও প্রীতি হক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন এবং প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন কারিশমা শামস। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যেসব কর্মকর্তা আমাদের সাচিবিক, দাপ্তরিক সেবা ও গবেষণা-সহায়তা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষেপণ	পূর্ণ রূপ
AI	Artificial Intelligence (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)
APA	Annual Performance Agreement (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি)
APD	Academy for Planning and Development (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি)
BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো)
BAPSA	Bangladesh Association for Prevention of Septic Abortion
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BMET	Bureau of Manpower, Employment and Training (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Centre (বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)
BPDB	Bangladesh Power Development Board (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)
BPfA	Beijing Platform for Action (বেইজিং ঘোষণাপত্র ও কর্মপরিকল্পনা)
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন)
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
CCGAP	Climate Change and Gender Action Plan
CDMP	Comprehensive Disaster Management Programme
CEDAW	Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ)
CHCP	Community Health Care Partnership
CMSME	Cottage, Micro, Small, and Medium Enterprises
CRSV	Conflict-Related Sexual Violence (সংঘাত-সম্পর্কিত যৌন সহিংসতা)
CSBA	Community Skilled Birth Attendant
DBID	Digital Business Identification Number
DDM	Department of Disaster Management (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর)
DEMO	District Employment and Manpower Office (জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস)
DIFE	Department of Inspection for Factories and Establishments (কলখারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর)
DRR	Disaster Risk Reduction (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস)
DRU	Dhaka Reporters Unity
DUJ	Dhaka Union of Journalists (ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন)
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী পরিষদ)
EIA	Environmental Impact Assessment (পরিবেশের উপর প্রভাব যাচাই)

সংক্ষেপণ	পূর্ণ রূপ
EIS	Employment Injury Scheme
FIMA	Financial Management Academy
FLFPR	Female Labour Force Participation Rate
4IR	Fourth Industrial Revolution (চতুর্থ শিল্প বিপ্লব)
GDP	Gross Domestic Product (মোট দেশজ উৎপাদন)
GED	General Economics Division (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ)
GFT	Gender Finance Tracking
Globocan	Global Cancer Observatory: Cancer Today
GRB	Gender Responsive Budgeting (জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং)
GRP	Gender Responsive Planning (জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিকল্পনা)
G2P	Government to Person
HFA	Hyogo Framework for Action
HIES	Household Income and Expenditure Survey (গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপ)
iBAS	Integrated Budget and Accounting System (সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
ICPD	International Conference on Population and Development (জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন)
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited (অবকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানি)
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন বিভাগ)
ILO	International Labour Organization (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
IOC	International Olympic Committee (আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি)
LFS	Labour Force Survey (শ্রমশক্তি জরিপ)
MFI	Microfinance Institution (ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান)
MFSP	Mobile Financial Service Provider
MOI	Ministry of Industries (শিল্প মন্ত্রণালয়)
MOPA	Ministry of Public Administration (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs (নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)
MPDRS	Maternal and Perinatal Death Review and Surveillance
MR	Menstrual Regulation (মাসিক নিয়মিতকরণ)
MRDI	Media and Resources Development Initiative
MRM	Menstrual Regulation with Medication
NAP	National Action Plan (জাতীয় কর্মপরিকল্পনা)
NAP-WPS	National Action Plan on Women, Peace, and Security (বাংলাদেশের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা)

সংক্ষেপণ	পূর্ণ রূপ
NASCIB	National Association of Small and Cottage Industries of Bangladesh
NASS	National Academy for Social Services (জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি)
NCWCD	National Council for Women and Child Development (জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ)
NEET	Not in Employment, Education, or Training
NILG	National Institute of Local Government (জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)
NIPORT	National Institute of Population Research and Training (বাংলাদেশ জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
NSDS	National Strategy for Development of Statistics (জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশল)
NSSS	National Social Security Strategy (জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল)
NTRCA	Non-Government Teachers' Registration and Certificate Authority (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ)
NWDP	National Women Development Policy (জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতি)
OCC	One-stop Crisis Centre
OGSB	Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh
OKUP	Ovibashi Karmi Unnayan Program
OSC	One Stop Centre
PAC	Post-Abortion Care
PLAU	Policy and Leadership Advocacy
RMG	Ready-Made Garments (তৈরি পোশাক কারখানা)
SDG	Sustainable Development Goals (টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট)
SHS	Solar Home Systems
SMEs	Small and Medium Enterprises (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ)
SOD	Standing Order on Disaster (দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি)
SOP	Standard Operating Procedure
SREDA	Sustainable and Renewable Energy Development Authority (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত)
TBA	Traditional Birth Attendant (দাই)
TUS	Time Use Survey (সময় ব্যবহার জরিপ)
UNICEF	United Nations Children's Fund
VWB	Vulnerable Women's Benefit (ঝুঁকিপূর্ণ নারী সুবিধা)
WFHI	Woman Friendly Hospital Initiative (নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি)
WFP	World Food Programme (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি)
WID	Women In Development

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

১৮ নভেম্বর ২০২৪ইং তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের নারীদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য শিরীন পারভীন হক এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট 'নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন' গঠন করা হয়। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কমিশনের প্রধান বিবেচনা হবে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন এবং নারী পুরুষ সমতা অর্জনে পদক্ষেপ সমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়নে সুপারিশ তৈরি করা। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচলিত আইন ও বিধিমালা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষন, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন করতে প্রথমত নারীর জীবন ও জীবিকার জন্য যেসকল চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী সমাজের বর্তমানে অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনে ইতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ সনাক্ত করে সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী সমাজের অবস্থান রূপান্তরে কৌশলগত পদক্ষেপ পূরণে বিভিন্ন মেয়াদে টেকসই সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বশেষ ও দীর্ঘমেয়াদে নারী আন্দোলনের স্বপ্ন এবং আকাঙ্খাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম

প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান ,অগ্রগতির ক্ষেত্র এবং সংস্কারের অতীত উদ্যোগ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে নারী-উন্নয়নে বিভিন্ন আইনগত, নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও দেশে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সুপারিশ প্রণয়নে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক খাতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে ১৭টি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের আশা এই সকল অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সুপারিশমালা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন একটি ঐতিহাসিক সুযোগ যা নারীর চাওয়া পাওয়াকে আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে জাতি ও নীতি নির্ধারকদের কাছে পরিচিত করবে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন আশা করে এই প্রতিবেদন জনমানসে নাড়া দেবে, ভাবাবে এবং তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারীর সমতা অর্জনে সহায়ক করবে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা থাকবে এবং নারীরা তাদের জীবনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের অবদানকে মূল্যায়ন করা হবে।

সংবিধান, আইন এবং নারী অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি

সংবিধান ও আইনের সংমিশ্রণে একটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা গঠিত হয়, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের অধীনে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক বিধান বিদ্যমান, বিশেষ করে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইন অনুসরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় নারীরা বৈষম্যের শিকার হন। যার ফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিদ্যমান অসমতা তাদের সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ করে রাখছে। নারী নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কিত আইনের বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আদালতের অপর্যাপ্ত সংখ্যা, দীর্ঘসূত্রিতা, পুরাতন অবকাঠামো এবং ন্যূনতম মৌলিক সুবিধার অভাবে নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আইন সংস্কারের পাশাপাশি সংবিধানের সংশোধনও প্রয়োজন। সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮(৩), ২৯, ৩২ ও ৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে।। রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক, মানবিক এবং কল্যানমুখী। সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মের স্বীকৃতি দেয়া এবং এই অধিকারগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিসহ বলবৎযোগ্য করা। একইসাথে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত না করা অর্থাৎ মৃত্যুদন্ডের বিধান বিলুপ্ত করা।

আইনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: ব্যক্তিগত জীবন ও জনজীবন। ব্যক্তিগত আইনে, বিশেষ করে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে অভিন্ন পারিবারিক আইন (Uniform Family Code) প্রণয়ন, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ থেকে ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)-এর সংরক্ষণসমূহ প্রত্যাহার, স্থায়ী নারী বিষয়ক কমিশন প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যমূলক সকল আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন করে সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংগতিপূর্ণ করা, নারী ও শিশু-বান্ধব আদালত প্রতিষ্ঠা, ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা এবং বিচারক ও প্রসিকিউটরদের নারীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, পাশাপাশি আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর ও পুর্ণ বাস্তবায়নের সুপারিশগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহ

নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ সরকার নারীর অধিকার, নারীপুরুষ সমতা ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আইন, নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেখানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। বহুস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আইন ও কর্মসূচি থাকা সত্বেও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, সমন্বয় ও জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। পরিবীক্ষণ, বাজেট ব্যবহার এবং গৃহীত উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত সক্ষমতার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও পরিকল্পনা শক্তিশালী করা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বৃদ্ধি ও নীতির বাস্তবায়নে মনোযোগ বাড়ানো জরুরি।

নারীর অধিকারবিষয়ক আইন সংশোধন করা, ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশাবলি আইনে পরিণত করা, CEDAW-এর সংরক্ষণ প্রত্যাহার এবং নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ হালনাগাদ করা আবশ্যক। নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন নারী কমিশন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ পুনর্গঠন করা জরুরি। এই মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব একজন পূর্ণ মন্ত্রীর কাছে ন্যস্ত করা। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদান, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণে শক্তিশালী করে তোলা আবশ্যক। মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশু বিষয়ে পৃথক উইং, প্লাউ, ও সহিংসতা প্রতিরোধ অধিশাখাকে শক্তিশালীকরণ এবং সকল নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিগুলো কার্যকর করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কাজ সুসংহত করে জাতীয় মহিলা সংস্থা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি উন্নতে করা, ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে অঙ্গনা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একীভূত করা বাঞ্ছনীয়। নারীপুরুষ সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সকল মন্ত্রণালয়ে নারী-পুরুষ সমতা ইউনিট প্রতিষ্ঠা, প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রস্তাবনায় নারী-পুরুষ সমতা বিষয় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা দরকার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জেন্ডার সমতার সূচক সংযোজন, জেন্ডার বাজেটের ব্যয় পর্যবেক্ষণ এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। সব কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং কর্মজীবী নারীদের হোস্টেল ও সহায়ক অবকাঠামো নিশ্চিত করা ও তা পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ, ছোট ছোট কর্মসূচি একীভূতকরণ, উপকারভোগী বাছাই ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নতকরণ, এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, নীতিনির্ধারণ ও সেবা প্রদানে তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের সবচেয়ে কাছের প্রশাসন কাঠামো হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের-বিশেষ করে নারীদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে তাদের মতামত প্রকাশ এবং জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করার সুযোগ প্রদান করে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কর্মসূচি ও সেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, নারীদের অংশগ্রহণ ও দাবি প্রকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাস্তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবল সংকটে ভুগছে। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি হলেও, সক্ষমতা সীমিত। সরকারের বিভিন্ন বিষয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু লাইন ডিপার্টমেন্টগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করছে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির জন্য যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তাতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী করা, যাতে স্থানীয় জনগণ সরকারের আরও কাছে পৌঁছাতে পারে এবং স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহি করতে পারে। এতে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি বৃদ্ধি করতে হবে। নারীদের জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব। গ্রাম-আদালত এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শক্তিশালী করে তুললে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী কমিটিগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটি/স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত ও কার্যকর করা, যেখানে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সেবার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, যার সুবিধাভোগীদের মধ্যে নারীরা একটি বিশেষ অংশ। উপযুক্ত উপকারভোগী নির্বাচন এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারই নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে শিশু-দিবাযত্নকেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় সরকারের একটি বিশেষ দায়িত্ব হবে এগুলির গুনগত মান তদারকি করা।

নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতা মুক্ত সমাজ

নারীর উপর সহিংসতা একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা। সকল বয়সের, সকল শ্রেণি-পেশার নারীই সর্বদা সহিংসতার ঝুঁকি ও আতঙ্কে থাকে। নারীর উপর সহিংসতার সুত্রপাত হয় নারীর প্রতি বৈষম্যের গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে। ধর্ম, প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ। এ অবস্থাকে আরও জোরদার করেছে বৈষম্যমূলক আইন। ঘরে, বাইরে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, দুর্যোগে-দুর্বিপাকে, এমন কি প্রতিনিয়ত আনন্দানুষ্ঠানেও নারী যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ফলে নারীর অগ্রগতি, বিকাশ ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথা ও ধর্ম, বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইন, আইনের দূর্বল প্রয়োগ ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা, সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও দুর্নীতি ।

নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতা মুক্ত সমাজ নির্মাণে, সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের সমন্বয়ে নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা, এর বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বাজেটে খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও পশ্চাদপদ আইন সমূহ সংস্কার করা জরূরী। সহিংসতার ঘটনার অভিযোগ প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে সকল আদালত ও থানায় নারী, শিশু, বয়স্কসহ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা ডেস্ক চালু ও সক্রিয় করা আবশ্যক। তদন্ত ও বিচার তরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থানা, হাসপাতাল ও আদালত ইত্যাদিকে নারীবান্ধব করতে ইতোমধ্যে প্রণীত প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক সহায়তা, পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান কর্মসুচির মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে সমাজে পুনরায় স্থান করে দিতে হবে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের অবহেলা ও অপমান অবসানে সম্মানসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংঘাতশ্লিষ্ট এলাকা (পার্বত্য চট্টগ্রাম, রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির) ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে। একটি মানবিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করা, যেখানে সকলে নারীকে মানুষ হিসেবে চিনবে, জানবে ও সম্মান করবে।

জনপরিসরে নারীর ভূমিকা : জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে

নারী স্বার্থ ও দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আবশ্যক। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করতে নারীদের জন্য অস্থায়ী ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে সংরক্ষিত আসনের বিধান রয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে খুব কমসংখ্যক নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ এ বেশ কিছু প্রগতিশীল সংশোধনী নেয়া হয়েছিল। তবে এই অধ্যাদেশে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক বিধান না মানলে কোন দন্ড বা জরিমানার ব্যবস্থা না থাকায় এ বিধানগুলো সর্বক্ষেত্রে মানা হয় নি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

প্রতিবন্ধকতার কারণে স্থানীয় পর্যায়েও নারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত হতে পারেন না। এছাড়া নির্বাচনে সহিংসতা,অনিয়িম,ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোট কারচুপি এবং সমান প্রতিযোগিতার সুযোগের অভাব থাকে। নারী রাজনীতিবিদরা প্রায়শই শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা ও হুমকির সম্মুখীন হন। তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনে সদস্য ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬০০-তে উন্নীত করা, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য একটি সরাসরি নির্বাচিত সংরক্ষিত আসন থাকবে। জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ করার সিদ্ধান্ত হলে সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন বণ্টন করা হবে যেখানে নারী-পুরুষ মনোনয়ন পর্যায়ক্রমে জিপার (zipper) পদ্ধতিতে দেয়া হবে। জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের জন্য কমপক্ষে ৫ টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা থাকতে হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের বিধান না মানলে দল পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা হারাবে এমন বিধান রাখতে হবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় হতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি সমন্বিত ও একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আদিবাসী নারীদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন এবং একটি সংরক্ষিত নারী আসন থাকবে এবং একজন স্থানীয় অবকাঠামোর দায়িত্ব নেবেন এবং অন্যজন সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং কমিটিগুলিতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন এবং একটি নারী আসন থাকবে। এই ব্যবস্থা অস্থায়ী বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে আগামী তিনটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রযোজ্য হবে।

জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ

জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রশাসনিক বিষয়, যা নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা ও সমাজের উন্নয়নের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতিনির্ধারণী পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তাবাহিনীতেও নারীরা অবদান রাখছেন, তারা প্রশাসন থেকে আইনপ্রণয়ন, বাস্তবায়ন, আইনপ্রয়োগ, উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীতে রয়েছেন। নারীদের ,কূটনীতি ,গার্হস্থ্য ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সীমিত উপস্থিতি ,কর্মক্ষেত্রে মৌখিক বা যৌন হয়রানি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ না থাকা নিরাপত্তা, পদায়নে বৈষম্য , ঝুঁকি প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ এর কারণে বিভিন্ন সরকারি পদে নারীরা এখনও কম। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নরূপ সুপারিশ দেয়া হল।

সরকারি কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ হাইকোর্টের যৌন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে সংশোধন করে সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠন ও কার্যকর করতে হবে। সরকারি চাকুরির বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে ইতিবাচক নীতি গ্রহণ, এবং আউটসোর্স বিষয়ক নীতিমালা সংশোধন করা আবশ্যক। যেসব খাতে ও পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি কম, সেখানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। বেসরকারি খাত ও কর্পোরেটসহ সকল প্রতিষ্ঠানে ছয়মাস প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি এবং ২ সপ্তাহ পিতৃত্ব সম্পর্কিত ছুটির আইনগত বিধান করা প্রয়োজন। বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কেবল দুইবার ছুটির বিধান শিথিল করা উচিত। সকল কার্যালয়ে নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুকূল কাজের পরিবেশ, যেমন শিশু-দিবাযত্ন, টয়লেট ও নিরাপদ পরিবহণ-সুবিধা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে অভিযোগ কমিটি গঠন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। নারীপুরুষ বৈষম্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অভিযোগ-নিষ্পত্তিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাড়ি থেকে কাজ, নমনীয় কর্মসময়, স্বামী-স্ত্রীর কাছাকাছি পদায়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং ল্যাটারেল এন্ট্রি প্রভৃতি পদক্ষেপ নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও টিকে থাকায় সহায়ক হবে। নারীপুরুষ সমতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও শিখনপদ্ধতির আধুনিকায়ন প্রয়োজন। নারী-কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে মেন্টরশিপ কর্মসূচি ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নারী কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষা লাভে নেটওয়ার্ক তৈরি উৎসাহিত করতে হবে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮, সরকারি কর্মচারী বিধিমালা ১৯৭৯ এবং শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা ২০১৮ সংশোধন করে গ্রহণযোগ্য আচরণ, জবাবদিহিতা, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতাবৃদ্ধি

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কম। এইসকল বিষয়ে শিক্ষায় নারীরা মাত্র ২০.৬ শতাংশ। বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাধা, যা আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে আরও বাড়ছে। পার্বত্য ও সমতলের আদিবাসীদের এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব ও শিক্ষকের সংকট শিক্ষার সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। দুর্গম ও প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে, পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা, ২০১২ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কোভিড-১৯ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি চালু রেখে তাদের পুনরায় শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। ঝড়ে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বয়সের সাথে সংগতিপূর্ণ সমন্বিত যৌন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা। শিক্ষাব্যবস্থায় **আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য** সংযোজন করতে হবে। সকল মেয়েশিশুর বিদ্যালয়ে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষক-অভিভাবক কমিটিকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগপ্রবণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে **ডিজিটাল শিক্ষার ব্যবস্থা** করতে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। হাওর, চর, বন্যাপ্রবণ ও পার্বত্য এলাকায় **আবাসিক বিদ্যালয়** স্থাপন করা প্রয়োজন ও জাতীয় পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল ধর্ম, জাতিসত্তা ও বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্বাস্থ্য

নারীর স্বাস্থ্য শুধু তার প্রজনন-ভূমিকার জন্য নয়, তার জীবনচক্রজুড়ে বিবেচনা করা উচিত। নারী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার, যা নিজ ঘর থেকে শুরু করে এলাকা, গোষ্ঠী, স্বাস্থ্যব্যবস্থাসহ সকল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়নসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সহস্রাব্দের উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা (২০০০-২০১৫)-তে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্রে ২০১৭-২০৩০-এ কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, তাদের পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীদের উপর সহিংসতা ও তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব চিহ্নিত করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশে এখনো ৫১ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়। ফলে কৈশোরকালীন গর্ভধারণ, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ (৪৮ শতাংশ) ও অনিরাপদ গর্ভপাতের হার এখনো কমেনি; মাসিক নিয়মিতকরণ-সেবাসমূহ অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অনিরাপদ গর্ভপাতের শিকার হয়ে অনেক নারী মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন।

সকল নারীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও মাসিক নিয়মিতকরণ চিকিৎসা গ্রহণে বাধা দূর করে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে MR, MRM এবং PAC সেবা প্রদানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে ২০২৩ উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা জরুরী। প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যু পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা কার্যক্রমটি সারাদেশে সব পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রে মৃতের পরিবারের সদস্যসহ গঠিত কমিটির মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে। প্রতিবন্ধী নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা কম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষ চাহিদাসমূহ উল্লেখ করে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। অসংক্রামক রোগে নারীদের আক্রান্তের হার ও ঝুঁকি বেশি। পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ ও

ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি বেশি। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস অথবা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগে ৩০-৭০ বছর নারীদের মধ্যে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতার তথ্য-উপাত্তে প্রবীণ নারীদের তথ্য-সংগ্রহ উপেক্ষিত থাকে। এজন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা ও দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য-ক্লিনিক স্থাপন করা, নারীদের চিকিৎসা সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেবার মান উন্নত করতে হবে। চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি-রোধে শূন্য সহনশীলতা-নীতি গ্রহণ করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ সংশোধন করে প্রবীণ নারীদের বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার

নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলত কৃষিতে স্বকর্মসংস্থানের কারণে হয়েছে। প্রায় ৫০ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত। প্রায় ১১.৮ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ রয়েছে, যার মধ্যে নারী উদ্যোক্তারা ৭.৮ শতাংশ মালিক, যা প্রায় ৬০,৮৪,০০০টি প্রতিষ্ঠান। এ উদ্যোগগুলো জাতীয় জিডিপির ২৫ শতাংশে অবদান রাখছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন ব্যবসার প্রসারের ফলে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অর্থনৈতিক মন্দা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও আয়বৈষম্যের বৃদ্ধি নারীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। নারীর কৃষি ও মৎস্য খাতে অবদানের ও স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। তরুণদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব এবং NEET (Not in Employment, Education, or Training) পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে এই হার নারীদের ক্ষেত্রে বেশি। নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

খাসজমি বন্দোবস্ত ও বনজ সম্পদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্যজীবী হিসেবে নারীদের নিবন্ধনের মাধ্যমে স্বীকৃতি ও সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংস্কার করে জলমহাল ইজারা গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সম্পত্তিতে নারীদের সমান উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা জরুরী। অপরদিকে আনুষ্ঠানিক খাতে নারীদের জন্য অনুকূল কর্মসংস্থান নীতি তৈরি করে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা কর্মক্ষেত্রের জন্য আচরণবিধি, যেমন শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, প্রণয়নের মাধ্যমে যৌন হয়রানি মুক্ত কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সহায়তায় ব্যবসায়িক সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী এবং নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য ঋণের শর্তাবলি সহজ ও নারীবান্ধব করতে হবে। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল কর্মপরিকল্পনায় নারীর প্রয়োজন (২০২১)ও প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারী উদ্যোক্তারা যেন কেবল প্রচলিত ও কম লাভজনক ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যবসায়িক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ই-কমার্সের জন্য একটি আইনগত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করা এবং ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ও নবায়ন করার প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন। শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান প্রকৌশল এবং গণিত ,প্রযুক্তি ,শিক্ষাপ্রদান ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে যুব নারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করতে হবে। এছাড়া গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোঝা কমাতে হবে ,এটার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করতে হবে। যুবনারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে তাদের উপযোগী শিক্ষা, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সম্ভাবনা সংক্রান্ত তথ্য, আর্থিক সমর্থন ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রদান করা।

শ্রম এবং কর্মসংস্থান

নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বাড়লেও তারা এখনও ব্যাপক বৈষম্য ও সমস্যার শিকার। কর্মজীবী নারীদের ৯৬.৬শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে ন্যায্য মজুরি, প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে, বিশেষ করে পোশাক শিল্পে যান্ত্রিকীকরণের ফলে। নারীরা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, সহিংসতা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হন, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। সম কাজে সম মজুরি না পাওয়ার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও দিবাযত্ন সুবিধার অভাব নারীদের কর্মজীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সীমিত, যা ভবিষ্যতে তাদের আরও পিছিয়ে দেবে।

নারী শ্রমশক্তির প্রতি বৈষম্য কমাতে প্রথমেই প্রয়োজন কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সকল খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা, যাতে মজুরী বৈষম্য নিরসন হয়। নুন্যতম মজুরী বৈশ্বিক মানদন্ডের সাথে মিল রেখে প্রতি বছর পূনর্মূল্যায়ন করা এবং বাঁচার মত মজুরীর জন্য নীতি প্রণয়ন করা। শ্রম আইন সংশোধন করে প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা ও পিতৃত্ব সম্পর্কিত ছুটি চালু করা জরুরি। সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে কঠোর তদারকি ব্যবস্থা থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নারী শ্রমিকদের প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা উচিত, যাতে তারা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা প্রয়োজন। শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরি ও নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও জরুরি। যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি খাতে কার্যকর নজরদারি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

নারী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন

বিশ্বায়নের এ যুগে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশি নারী-অভিবাসী কর্মীরা পরিবারের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। নারী-অভিবাসীদের সামাজিক মূলধন, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, সংযোগ ও পারস্পারিক যোগাযোগ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার প্রসারে সহায়ক। নতুন আয়ের সুযোগ অভিবাসী নারীর সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় এবং তার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকরা অভিবাসন-প্রক্রিয়া শুরু থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। নারী-অভিবাসী শ্রমিকরা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, কম মজুরি ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। নারী অভিবাসী গৃহকর্মীকে দৈনিক ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ভারী পরিশ্রম করতে হয়। ভাষা না জানায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারেন না।

অভিবাসী ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা, সম্মান, কল্যাণ এবং নিয়োগ সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইন ও বিধি সংশোধন করা। প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও যৌন হয়রানি থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা, আইএলও সনদ ১৮৯ এবং ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা, শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এর মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক ও CEDAW-এর সাধারণ সুপারিশ ২৬ অনুসরণ নিশ্চিত করতে সরকারের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য, অধিকার, সুরক্ষা এবং সাপ্তাহিক ছুটির বিষয়গুলো দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রত্যাগতদের পুনঃএকত্রীকরণের জন্য খসড়া নীতি অনুমোদন করা, নারী-অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দুতাবাসের শ্রমিক সেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আরও সক্রিয় করা এবং রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণ জোরদারে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করা প্রয়োজন। অভিবাসন ব্যয় কমাতে সরকার নির্ধারিত ফি ব্যতীত অন্য সব খরচ বন্ধ করতে হবে। নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য BMET ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে নিজ দেশ ও গন্তব্যদেশে ২৪/৭ হেল্পলাইন ও সেবা চালু করতে হবে। অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় যৌথ কারিগরি কমিটির নিয়মিত সভা করা এবং প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আবশ্যক। নিরাপদ অভিবাসনের পথ সুগম করা ও নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার-সুরক্ষায় বেসরকারি সংগঠন, নিয়োগ এজেন্সি এবং সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা শক্তিশালী করতে হবে। সকল খাতে শোভনকাজ ও বাঁচার মত মজুরীসহ অধিক সংখ্যক নারী অভিবাসনের ব্যবস্থা নেওয়া, যেখানে তারা আন্তর্জাতিক শ্রম ও অভিবাসন আইনের সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং তাদের কর্মপরিবেশ ও মর্যাদা বর্তমানের চেয়ে উন্নত হবে।

দারিদ্র- হ্রাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-হ্রাসে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, দ্রুত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনীতি ও দারিদ্র্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সামাজিক সুরক্ষা সকল বয়সে নারীদের দারিদ্র্য

থেকে রক্ষা ও জীবনমান উন্নত করতে সহায়ক ও নারী নির্যাতন, বৈষম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ায়। সামাজিক সুরক্ষা ভাতার পরিমাণ অপর্যাপ্ত, বরাদ্দের হিসাব ত্রুটিপূর্ণ, সুবিধাভোগী বাছাইয়ে ত্রুটি, শহরে সুরক্ষা সহায়তা বরাদ্দ কম, সমন্বয়হীনতা, সহায়তার অর্থ সরবরাহে ঝুঁকি, জলবায়ু অভিঘাতের তুলনায় অপ্রতুল সহায়তা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় সহায়তার অভাব, বীমা ব্যবস্থা না থাকা ও কার্যকর অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা না থাকা প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি ও কার্যকারিতা বাড়াতে সুবিধাভোগী বাছাইয়ের শর্ত পর্যালোচনা, একক নিবন্ধন ও তথ্যভান্ডার চালু করা প্রয়োজন, যাতে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা, বার্ধক্যভাতার বয়সসীমা পুনর্বিবেচনা করা এবং নারীদের জন্য সামাজিক বীমা চালু করা প্রয়োজন। সকল নাগরিকের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল জীবনচক্রভিত্তিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা দরকার। গৃহস্থালি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত নারীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ; স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ও প্রসূতি প্রসবজনিত বীমা, বেকারত্ব-ভাতা ও অবসরভাতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রয়োজনে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা, অবকাঠামো ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। শহুরে দরিদ্রদের জন্য বস্তির বদলে 'নিম্ন-আয়ের এলাকা' শব্দ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থার আওতা বাড়ানো, ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বরাদ্দ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং ভাতার পরিমাণ নিয়মিতভাবে মুদ্রাস্ফিতি বিবেচনায় নিয়ে বৃদ্ধির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন। খাদ্য-বিক্রয়সহ সহায়তা দানে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে । নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে জরুরি সহায়তা তহবিল গঠন, বাজারমুখি জীবিকা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নীল অর্থনীতির সাথে সামাজিক সুরক্ষা সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শিশু ও প্রবীণ সহ সকলের বয়স অনুসারে সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জীবনচক্রভিত্তিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও নগর-দারিদ্র্যের জন্য জীবনচক্র ভিত্তিক চাহিদাগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। সার্বজনীন সুরক্ষা নিশ্চিতে ধাপে ধাপে সামাজিক সুরক্ষা ভিত তৈরি করা, যা মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়-নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ন ও প্রকাশ

গণমাধ্যম সমাজের প্রতিচ্ছবি বহন করে, কিন্তু এখানেও নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য স্পষ্ট। নারীদের হেয় করে উপস্থাপন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। সাংবাদিকতায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত, বিশেষত রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধ ও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায়। পুরুষ-প্রধান ক্রীড়া সাংবাদিকতায় নারীদের সুযোগ কম। শীর্ষ পর্যায়ের পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অনলাইন গণমাধ্যমে সাইবার বুলিইং ও যৌন হয়রানি নারীদের জন্য অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বেসরকারি খাতে সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো না থাকায় আর্থিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়।

গণমাধ্যমে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইন ও নীতি সংস্কার জরুরি। খসড়া গণমাধ্যমকর্মী আইন ২০২২ পর্যালোচনা করে বৈষম্যমূলক দিকগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নারীদের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিইং ও যৌন হয়রানি রোধে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা দরকার। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ অনুসারে, নারী ও অন্যান্য লিঙ্গের সম্মানজনক উপস্থাপনা নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগ কমিটি গঠন করা জরুরি। সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণে নারীবান্ধব উপস্থাপনার কৌশল, ভাষার যথাযথ ব্যবহার ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সংযোজন করা প্রয়োজন। গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপনা বাড়াতে তাদের অর্জন ও ভূমিকা তুলে ধরতে হবে। সহিংসতার শিকার নারীর পরিচয় গোপন রাখা উচিত। অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবদান সম্পর্কে গণমাধ্যমে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য একটি অভিযোগ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চালু করা। গণমাধ্যমের প্রত্যেক শাখা ও স্তরে ৫০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ

নারীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও এখনও নানা বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছেন। নারী ক্রীড়াবিদদের বেতন পুরুষদের তুলনায় অনেক কম, এমনকি পুরস্কারের অর্থেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ২০২৪ সালে দক্ষিণ এশিয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল টুর্নামেন্টের আগে তিন মাস বেতনহীন ছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষ সংস্কৃতিকর্মীদের পারিশ্রমিকে বৈষম্য রয়ে গেছে এবং দর কষাকষির সুযোগ নেই। এছাড়া, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে মহিলা ক্রীড়া সংস্থাগুলো পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ পায় না এবং নারী সংস্কৃতি কর্মীদের জন্যও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে, যা তাদের পেশাগত বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

নারীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮ সংশোধন করা প্রয়োজন। ক্রীড়া পরিষদ ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে এবং রাজনৈতিক নিয়োগের পরিবর্তে দক্ষতার ভিত্তিতে সদস্য নিয়োগের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পার্বত্য ও প্রান্তিক অঞ্চলের সম্ভাবনাময় কিশোরীদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ সংশোধন করা জরুরী। নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদদের বেতন বৈষম্য দূর করতে জাতীয় ক্রীড়া বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীদের নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬ সংশোধন করা দরকার। পেশাদার সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য চুক্তিপত্র বাধ্যতামূলক করা জরুরি, যাতে তাদের অধিকার ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এছাড়া, নারীদের বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম ও পোশাক সরবরাহ করতে হবে, যাতে তারা খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত হন। শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নারীর উজ্জ্বল, অবাধ ও নিরাপদ অংশগ্রহণ, অবদান ও স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে।

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে নারী

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির দিক থেকে বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের রয়েছে বহুমুখী হুমকি যা, নারীদের ও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারীরা শুধু দুর্যোগের শিকার নন, বরং তারা সংকটপুরুষ বৈষম্য-মোকাবিলা ও জীবনধারণের জন্য প্রধান অবদানকারী। নারী-, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে মিলিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে। জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারীদের ওপর ঘরোয়া যত্নের কাজের চাপ বাড়ে এবং পুরুষদের স্থানান্তরের অভিবাসনের কারণে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের পানীয় জলের লবণাক্ততার সাথে উচ্চ রক্তচাপ, প্রি-এক্লাম্পসিয়া, হৃদরোগ, কিডনির কার্যকারিতার হ্রাস, দীর্ঘস্থায়ী কিডনিরোগ-, ত্বক ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা, শিশুমৃত্যু, গর্ভাশয়ের ভ্রূনের বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা ও অকাল জন্ম ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।

নারীদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কিত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যে সকল সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং দুর্যোগের সময় প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় নারীদের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করতে হবে। পরিবেশগত আইনগুলোতে জলবায়ু ও জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পর্যালোচনা ও সংস্কার করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ: পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করতে বলা আছে, এগুলোতে জেন্ডারভিত্তিক প্রভাবের সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন নীতি, যেমন বিদ্যমান পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিগুলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সংক্রান্ত সকল নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংস্কারে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের প্রতি জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রাম অঞ্চলে নারী কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও অভিযোজন সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত বীজ, যন্ত্রপাতি, সেচের ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদনে সৌরশক্তি যুক্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা দান এবং নারীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক বা জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনীয়তা মেটানো ও নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট

জুলাই ২০২৪-এ শিক্ষার্থী-জনতার এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। ৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরশাসক দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ৮ আগস্ট ২০২৪-এ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। সরকার বিভিন্ন খাতে ও ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রথমে ৬ (ছয়)-টি বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে আরও ৫ (পাঁচ)-টি বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়; তন্মধ্যে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন অন্যতম। সরকার সংস্কার কমিশন প্রধানদের নির্ধারণ করে দেন। জনাব শিরীন পারভীন হক কে প্রধান করে গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধানের কাছে সম্ভাব্য সদস্য তালিকা চাওয়া হয়। কমিশন প্রধানসহ মোট ১০ (দশ) জন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা নারী-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। তন্মধ্যে আটজন সদস্য কমিশন-প্রধান নির্বাচন করেন এবং শিক্ষার্থী-প্রতিনিধি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-কর্তৃক নির্বাচিত হয়। যদিও কমিশন গঠন সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশিত হয় ১৮ নভেম্বর ২০২৪-এ, কমিশনের কাজ শুরু হয় ২ ডিসেম্বর ২০২৪-এ। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক ও লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত ছিলেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও দুজন অফিস সহায়ক। জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের জন্য সভাকক্ষ ও কার্যালয়ের ব্যবস্থা করেছে।

সংস্কার কমিশনের প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ কমিশনের প্রধান বিবেচনা হবে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য-নিরসন ও জেন্ডার-সমতা অর্জনে পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়নে সুপারিশ তৈরি করা। সুপারিশসমূহ ৩টি মেয়াদে ভাগ করা হয়েছে, যথা: প্রথমত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য; দ্বিতীয়ত, নির্বাচিত সরকারের ৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নকাম্য এবং তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদে নারী-আন্দোলনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাগুলো তুলে ধরা।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ১৭ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩টি বৈঠক করেছে; বিভিন্ন অংশীজনের সাথে পরামর্শ-সভা করেছে—ঢাকায় ২৩টি ও ঢাকার বাইরে ০৭টি। এছাড়া অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সাথে ০৯টি সভা করা হয়েছে। যেহেতু নারীর প্রতি বৈষম্য সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে বিদ্যমান, সেহেতু নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন চেষ্টা করেছে অন্যান্য কমিশনের সাথে বৈঠক করে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো তুলে ধরতে এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনের সুপারিশের মধ্যে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো যুক্ত করতে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সর্বমোট ০৯টি সংস্কার কমিশনের সাথে বৈঠক করেছে, যথা: পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, শ্রম সংস্কার কমিশন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। নারীর প্রতি বৈষম্য বিশ্লেষণ করতে ২টি তাত্ত্বিক ধারণা ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, নারীর জীবন ও জীবিকার জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন, তা অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নারী-সমাজের বর্তমান অধস্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে দীর্ঘমেয়াদে করণীয় পদক্ষেপ শনাক্ত করে সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী-সমাজের অবস্থান রূপান্তরে ও কৌশলগত স্বার্থপূরণে বিভিন্ন মেয়াদে টেকসই পদক্ষেপ সমূহ সুপারিশ করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে মোট ১৭টি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক খাতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে ১৫টি অধ্যায়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিশন আশা করে এ সকল অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সুপারিশমালা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরসনে গঠিত সংস্কার কমিশন বাংলাদেশের নারী-মুক্তি আন্দোলন ও দীর্ঘদিনের সংগ্রামের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। নারী-আন্দোলনের তৎপরতা ও দাবিনামা বিশেষত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারীপক্ষ’র দাবিনামা[1] কমিশনের মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

[1] বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ charter of demand, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ এবং নারীপক্ষ: নারীর অধিকার ও মুক্তি: প্রত্যাশা ও করণীয়, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪।

১.২ বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সংস্কার উদ্যোগ ও নারীদের অবস্থা ও অবস্থান

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীদের ক্রমাগত প্রতিরোধ সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ আইন, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে নারী ও মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে উদ্যোগ এবং নারীদের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা মোকাবেলায় সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধাহত নারীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই প্রচেষ্টা পরবর্তীতে বিস্তৃত হয় নারী ও মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আয়মূলক দক্ষতা, আত্মকর্মসংস্থান, রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচিতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইতিবাচক সংস্কার ও পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের স্বীকৃতি: সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার এবং ধর্ষণের ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের শিকার নারীদের অবস্থা ছিল অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়। সমাজের অপমান, ঘৃণা ও অবহেলা নিরোধে এসকল নারীদের ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ "বীরাঙ্গনা" উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বীরাঙ্গনা উপাধিকে গালিতে পরিণত করা হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। বীরাঙ্গনাদের সহায়তার জন্য একটি পৃথক সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের গর্ভপাত ও সন্তানকে দত্তক প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকুরিতে তাদের জন্য চাকরির কোটা নির্ধারণ করা হলেও, পর্যাপ্ত সংখ্যক "বীরাঙ্গনা" নারী এই কোটা দাবি করেনি, তাই ১৯৭৬ সালে এটিকে সাধারণ নারী কোটায় রূপান্তরিত করা হয়। এরপর বীরাঙ্গনা নারীদের কথা সকলেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। ১৯৯২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত "গণ আদালত" এই নারীদের কথা বলার সুযোগ দিলে বীরাঙ্গনা নারীদের অবদান ও যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। নারী আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করে বীরাঙ্গনাদের নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে এই মর্মে একটি গেজেট প্রকাশ করে। এরপর তাদেরকে সরকার থেকে ভাতা প্রদান শুরু হয়। তথাপি বীরাঙ্গনা নিবন্ধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল বিধায় এ পর্যন্ত ৫০৫ জন নিবন্ধিত হয়ে ভাতার আওতাভুক্ত হয়েছে। এখনো অনেকে গেজেট ভুক্তির অপেক্ষায় আছেন।

সাংবিধানিক সমতা: স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-উন্নয়নে অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সকল নাগরিকের সমান অধিকার, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যরোধ এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি, যদিও ব্যক্তি জীবনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়নি।

রাজনীতি ও জনপরিসরে নারী: স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান তৈরি ও প্রথম সংসদ নির্বাচনের সময় থেকেই সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম সংসদে ১৫টি সংরক্ষিত আসন ছিল যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বিগত সংসদ কালে ৫০টিতে পৌঁছেছে। তবে এ আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচন না থাকায় নারী-আসনের সংখ্যা বাড়লেও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের কার্যকর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ২টি সংরক্ষিত আসন রাখা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন অনেক বার সংশোধন করা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) দ্বিতীয় সংশোধনী আইন ১৯৯৭ তে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসন এবং বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়, যেখানে তারা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এছাড়া উপজেলাতে নির্ধারিত ভাইস চেয়ারপার্সন এবং স্থায়ী কমিটিতে নারীর অংশ নিশ্চিত করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী-প্রার্থী নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে নারীরা নেতৃত্বে আসতে পারেন।

শিক্ষাখাতে অগ্রগতি: ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর থেকে নারী ও মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে ভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭১ সালে নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল আনুমানিক ১৮ শতাংশ, যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে।[2] প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি-হার সমান, এবং কখনো ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২১ সালে মেয়েদের ভর্তি-হার ছিল ৫৪ শতাংশ। নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, যা বিদ্যালয়ে তাদের ধরে রাখা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এই কর্মসূচি প্রথম ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন[3] এর মাধ্যমে কুমিল্লার শাহরাস্তিতে ড. এলেন সাত্তারের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়। সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগ, উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি, শিক্ষায় স্থিতি ও সমাপনীর হার বেড়েছে এবং সামগ্রিক সাক্ষরতার হারও ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। তবে পার্বত্য অঞ্চল, চর ও হাওরের মতো দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সমস্যার কারণে এই সুবিধা এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। উচ্চশিক্ষায় নারীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত [4] বিষয়ে অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে কম, যা তাদের শ্রমবাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই এই খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নারীর স্বাস্থ্যসেবায় একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত পদ্ধতির সূচনা হয়েছে, যা শুরু হয় পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভনিরোধক ব্যবহার দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও নারী আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গুরুত্ব পেয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় পরিবার পরিকল্পনার আওতায় গর্ভনিরোধক, এবং পানিশূন্যতা নিরসনের[5] সহজ পদ্ধতি এবং টিকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সকল পদক্ষেপ ছিল উদ্ভাবনিমূলক এবং কার্যকরী। বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধে, বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার মাসিক নিয়মিতকরণ পদ্ধতি সহজলভ্য করে। ১৯৭৬ সালে গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসে গর্ভপাত বৈধ করার চেষ্টা করা হলেও তা আইনি বাস্তবায়ন পায়নি। ১৯৯৪ সালের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, যৌন সম্মতি এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে সমন্বিত যৌন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও এটি কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ, তথাপি রক্ষণশীল বিরোধিতা এখনো রয়ে গেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ স্বাস্থ্যখাতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে বিশেষত গ্রামীণ এলাকায়।

এ সকল উদ্যোগের ফলে গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য (২০২২) অনুযায়ী, ১৯৭৫ সালে পুরুষের গড় আয়ু ছিল ৫১ বছর এবং নারীর ৪৯ বছর, যা ২০২৩ সালে বেড়ে যথাক্রমে ৭০.৮ এবং ৭৩.৮ বছর[6] হয়েছে। ১৯৭১ সালে প্রসূতিমৃত্যুর হার প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মদানে ৬০০ এর বেশি ছিল, ২০০০ সালে তা প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মদানে ৪৪১[7]-এ নেমে আসে এবং ২০২৩ সালে এটি আরও কমে প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মদানে ১৩৬ এ পৌঁছেছে। জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ১৯৭১ সালে গড় জন্মহার ছিল নারী-প্রতি ৬.৯ সন্তান, ২০২৩ সালে এটি কমে ২.১৭ হয়। ২০২০-এর তথ্য অনুসারে, দেশে শিশুর লিঙ্গ-অনুপাত ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে যা প্রমাণ করে নারীর প্রতি বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।[8] তবে এখনো পার্বত্য এলাকা, হাওর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ এবং অপুষ্টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

---

[2] World Bank, 2022. সম্পূর্ন তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[3] Bangladesh Association of Community Education (BACE)

[4] Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

[5] এক চিমটি লবণ ও এক মুঠো গুড় পরিস্কার পানিতে গুলিয়ে পান করা

[6] BBS, 2024. সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[7] Maternal Mortality, Levels and Trends 2000-2020 (https://mmr2020.srhr.org/)

[8] *State of the World's Children Reports: 1971 & 2021*. New York: UNICEF.

নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ: নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। শুরুর দিকে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ পাশ হয়েছিল। এরপর নারীর উপর সকল ধরনের সহিংসতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। তথ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে সহিংসতার ব্যাপকতা বোঝা যায়। যেমন ১৯৯৭ সালে নারীপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত জরিপ, ২০০৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০১১, ২০১৫ ও ২০২৪ সালে পরিচালিত জরিপসমূহ, নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও প্রবণতা চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়েছে। সহিংসতার প্রকৃতি বিবেচনায় এনে নানা ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেমন-নারীর উপর সহিংসতা (দমনমূলক শাস্তি) আইন, ১৯৮৩; নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫, যা ২০১০ সালে সংশোধিত হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন নামে কার্যকর হয়; এসিড সহিংসতা প্রতিরোধে এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২; এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে, যেমন ২০০০ সালে চালু হওয়া নারীর উপর সহিংসতা মোকাবেলায় বহুখাতভিত্তিক কর্মসূচি। বহু আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর উপর সহিংসতা, নারীবিদ্বেষ, বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও অগ্রগতি: ১৯৭০-এর দশকে আনুষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত ছিল এবং বেশির ভাগ নারী কৃষিতে কাজ করতেন।[9] শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবে তা পুরুষের তুলনায় এখনো অনেক কম, ২০২৩ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪৩.৭ শতাংশ এবং পুরুষের ছিল ৮১.১ শতাংশ। নারীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ-সুবিধা, উদ্যোক্তা-উন্নয়ন কর্মসূচি ও দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এতে সহায়ক হয়েছে। রপ্তানি-শিল্প, বিশেষত তৈরি-পোশাকশিল্পে যদিও নারীদের অংশগ্রহণ আশির দশকে ৮০ শতাংশ ছিল, বর্তমানে তা ৫৩ শতাংশ।[10] ১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত সরকারি চাকুরীতে নারীর জন্য কোটা ব্যাবস্থা (অফিসার পদে ১০% ও কর্মচারী পদে ১৫%) ছিল অন্যতম সহায়ক পদক্ষেপ। এছাড়া পুলিসসহ আইন শৃঙ্খলা ও সশস্ত্র বাহিনীতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ছিল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নারীর কর্মসংস্থান ও কর্মস্থলে সুরক্ষার জন্য 'শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩ ও ২০১৮)', 'কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশনা, ২০০৯' এবং নারী-কর্মীদের জন্য সরকারি খাতে ৬ মাসের ও বেসরকারি খাতে ৪ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক খাতে নারীদের কর্মক্ষেত্রে থাকার সহায়ক ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তা হতে সহায়ক হয়েছে।

নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: নারীর অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা খুঁজে বের করার জন্য সরকারি কাঠামো সংস্কারে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা স্থাপন ছিল নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের সূচনা। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে একে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে পরিণত করা হয়। নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সনদগুলোর সাথে সংগতি রেখে ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে নারী-বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয় যা ১৯৭৮ সালে নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়। নারী-সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে এই মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন পরিবর্তনের পর ১৯৮৯ সালে আবার একটি নতুন নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা হয় , যা পরে বিভিন্ন ধাপে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে একটি নারী বিষয়ক সেল গঠিত হয়। পরে ১৯৭৯ সালে সমাজকল্যাণ ও নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে নারী বিষয়ক পরিদপ্তর কে নারী বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নারীদের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা মোকাবিলায় সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য সর্বোত্তম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

সরকারি কাঠামোতে নারী উন্নয়নের অন্তর্ভুক্তি: বৃহত্তর সরকারি পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোতে যাতে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার নিয়ে কাজ করা হয় সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর অবস্থান সম্পর্কিত ম্যাক্রো অধ্যায় যুক্ত করা, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি

[9] International Labour Organization (ILO). *Women in the Bangladesh Labour Force: 1970s-2020*. Geneva: ILO.
[10] Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), 2023

অন্তর্ভুক্ত করা (পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়)। পরবর্তীতে সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার জন্য একটি বিশদ ফ্রেমওয়ার্ক দেয়া হয়। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে ২০০৯ সালে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় নারী উন্নয়নের বিষয় যুক্ত হয়। বিভাগ, মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নারীপুরুষ বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের গৃহীত জেন্ডার পরিসংখ্যান অনুসরণে বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীপুরুষ বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মডিউল সন্নিবেশিত করে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা ছিল নারীপুরুষ সমতাকে মূলধারায় আনার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি-এর মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির প্রতি অঙ্গীকার : ১৯৭৫ সালের মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রভাবস্বরূপ, ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অধীনে নারী-বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়। ১৯৮০ সালে নাইরোবিতে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (CEDAW) অনুমোদিত হয়। ১৯৮৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন। বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত ভিয়েনা-ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় সম্মতি প্রদান করে, যা নারী-পুরুষের সমতা, সুরক্ষা ও উন্নয়নের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। একইসঙ্গে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রচারে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো নারীর উন্নয়নে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ খাত নির্ধারণ করে এবং 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭' প্রণয়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে ২০০৪ ও ২০০৮ সালে নীতিটি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি এখনো কার্যকর রয়েছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০'-এর বিশেষ করে অভীষ্ট ৫-এর মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে কাজ করছে। এসব উদ্যোগ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি বৈশ্বিক নারী আন্দোলন এবং নারী-পুরুষ সমতার কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সংস্কারে নারী-আন্দোলনের ভূমিকা: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে নারী-আন্দোলন দেশের নারী অধিকার, সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাধারে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই আন্দোলনের ফলে আইন সংস্কার, শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সম্প্রসারণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইন ও কর্মসূচি প্রণয়ন হয়েছে। এখনো অভিন্ন পারিবারিক আইন[11] প্রণয়নের দাবিতে ও নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংস্কারের পক্ষে বেসরকারি পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

নারী উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ: নারী উন্নয়নের পথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রায়শই রক্ষণশীল ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে নারী-আন্দোলন ও নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলো আইনগত সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রেখে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল হয়রানি, নারীবাদী কর্মীদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব এবং উন্নয়ন-সহযোগীদের অর্থায়নে ঘাটতি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সংস্কার একটি চলমান ও অব্যাহত প্রক্রিয়া, কারণ দেশকে সর্বদাই নতুন বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তবে আশার বিষয় হচ্ছে যে পূর্ববর্তী সকল শাসনামলে বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন এবং টেকসই হওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সবসময়ই অতীত অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারণা এবং আইন, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচির সফলতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে।

১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারী অধিকার বিষয়ক সংস্কারের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি ২ দেখুন।

[11] Uniform Family Code

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম

২.১ লক্ষ্য

যুগ-যুগ ধরে নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরসনের দাবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে করে আসছে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন। কখনো তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীদের সংগঠিত করে, কখনো রাস্তায় সোচ্চার হয়ে, কখনো সরকারি নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কখনো কখনো আন্তর্জাতিক পরিসরে দেনদরবার করে বিভিন্ন ইস্যুতে অগ্রগতি অর্জনে সচেষ্ট থেকেছে। এসব কিছুর মূল লক্ষ্য নারীকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। দেশ ও সমাজের চোখে নারী এখনো অধস্তন ও অসম অধিকারের ধারক। এর পেছনে রয়ে গেছে নারীকে চিরাচরিত ভূমিকায় দেখার প্রবণতা। নারীর নানাবিধ অর্জন সত্ত্বেও নারী সর্বোপরি মা, স্ত্রী ও কন্যা।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন একটি ঐতিহাসিক সুযোগ নারীর চাওয়া-পাওয়াকে আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে জাতি ও নীতিনির্ধারকদের কাছে পরিচিত করার। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন আশা করে, এ প্রতিবেদন জনমানসে নাড়া দিবে, ভাবাবে ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করবে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা থাকবে এবং নারীরা তাদের জীবনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। একটি উন্নত ও সমান সুযোগপূর্ণ সমাজ, যেখানে নারীরা যে-কোনো ক্ষেত্রে—রাজনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য—সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। যেখানে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে তাদের অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

২.২. নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কর্মপদ্ধতি

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনকে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তুত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে দুই দফায় দুই মাস বাড়িয়ে ১৫০ কার্যদিবস করা হয়।

প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন প্রথমেই নিজেদের মধ্যে একাধিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু, কাঠামো, প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের কৌশল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে কীভাবে সমন্বয় করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তথ্যসংগ্রহের পাশাপাশি প্রচলিত আইন ও বিধিমালা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ, মাঠপর্যায় থেকে তথ্যসংগ্রহ এবং বিশিষ্টজনদের সাথে পরামর্শ-সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কমিশন ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৩০টি পৃথক পরামর্শ সভা করে, যেখানে নারীর অধিকার ও কল্যাণে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও শ্রীমঙ্গলে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী নারীদের পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে কমিশন সেখানে গিয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ সংগ্রহ করে।

নারী-শ্রমিকদের সমস্যা ও করণীয় নির্ধারণে কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। বিশেষত, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও শ্রম-অধিকার সংগঠনের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে কারখানাগুলোর বিদ্যমান অবস্থা ও শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করা হয়। নারী-শ্রমিকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ চা-বাগানের শ্রমিকরা, যাদের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য সিলেটের শ্রীমঙ্গলে আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয় এবং তাদের উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তরুণ সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনা করে নতুন বাংলাদেশ গঠনে নারীদের ভূমিকা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়। নারী-স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে উন্নয়নের জন্য শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে চলমান আইনের দুর্বলতা ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারীদের সুরক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সংযোজন করা হয়।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কার কমিশন-ব্যতীত অন্যান্য ৯টি সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শ-সভা করেছে, যেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরোধ ও সমতার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেছে। নারী-উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়। কমিশনের সদস্যরা আশা করেন, সুপারিশগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের নারী-সমাজের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ ছাড়া, বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, যাঁরা কমিশনকে মন্তব্য, পরামর্শ ও তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের সহায়তা ছাড়া এত ব্যাপকভাবে বিষয়গুলো বিবেচনা করা সম্ভব হতো না। এর বাইরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিত মতামত চাওয়া হয়েছিল, যা অনেক সংস্থা, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল দিয়েছেন।

সবশেষে, কমিশন নিয়মিত বৈঠক করেছে, যেখানে কাজের পরিকল্পনা, প্রতিবেদনের খসড়া ও চূড়ান্তকরণের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: সংবিধান, আইন ও নারীর অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি

রাষ্ট্র এবং পরিবারে, সমান হবো অধিকারে

৩.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে জনপরিসরে নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনে নারীর প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান, যেমন: বিয়ে, তালাক, অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার। তা ছাড়া অন্যান্য আইনেও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে।

আইন-সংস্কারের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আইনগত বৈষম্য, পুরোনো বিধান ও দুর্বল প্রয়োগ-প্রক্রিয়া উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, নারীদের অধিকার সংরক্ষণে ৫৬টি আইন, নীতি ও নির্দেশিকা রয়েছে। তথাপি আইনি ফাঁকফোকর ও প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকারিতার কারণে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, বৈষম্য ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধাগুলো অব্যাহত রয়েছে।

বিচার প্রার্থীরা হরহামেশা দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়। কাঠামোগত বাধা ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যক্তিবাচক আইনগুলো নারীদের জন্য বিশেষভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এ সমস্যাগুলোকে আরও প্রকট করে তুলেছে, ফলে নারীরা স্থায়ী ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

ব্যভিচার, পারিবারিক সহিংসতা ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি-সংক্রান্ত আইনগুলোতে বৈষম্যমূলক ভাষা রয়েছে, যা সমাজের পশ্চাদপদ মানসিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও, যৌন হয়রানির মতো অপরাধের স্পষ্ট সংজ্ঞার অভাবে অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যায়।

প্রতিবেদনের এ অংশটি আইনি ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের ত্রুটিগুলোর বিশ্লেষণ করে সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। বিভিন্ন আইনের পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংযুক্তি ২-এ বিস্তারিতভাবে দেওয়া রয়েছে।

৩.২ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৩.২.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৩.২.১.১ সাংবিধানিক সুরক্ষা: বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের জন্য বিশেষ বিধান-সংক্রান্ত সুপারিশ (সংবিধান সংস্কারের শর্তসাপেক্ষে):

৩.২.১.১.১ মৌলিক অধিকার-বিষয়ক

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ	বর্তমান সংবিধান	সংস্কার প্রস্তাব
ক)	২৮। (১)	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।	'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ পরিচয়, বয়স বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না' লেখা।
খ)	২৮। (২)	রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।	'সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার লাভ করিবেন'
গ)	২৮। (৩)	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।	'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ পরিচয়, বৈবাহিক অবস্থা, বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না'

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ	বর্তমান সংবিধান	সংস্কার প্রস্তাব
ঘ)	**২৮। (৪)**	নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না	নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের 'যে-কোনো সুবিধাবঞ্চিত/প্রান্তিক/অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না
ঙ)	**২৯। (২)**	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।	'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গপরিচয় বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না'
চ)	**২৯। (৩) (খ)**	কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,	'কোনো ধর্মীয় বা সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে-কোনো আইন কার্যকর করা হইতে'
ছ)	**৩২**	আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।	'বেঁচে থাকার অধিকার হইতে কাউকে বঞ্চিত করা যাইবে না এবং আইনানুযায়ী ব্যতীত ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না'
জ)	**৩৫। (৫)**	কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না	কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক, লাঞ্ছনাকর বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না 'মৃত্যুদণ্ড' শব্দটি যুক্ত করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্ত করা।
ঝ)	**৩৯। (২)**	রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে	'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে'
ঞ)	**৩৯। (২) (খ)**	সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল	সংবাদক্ষেত্রের পাশাপাশি প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল
ট)	**৪১। (১) (খ)**	প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।	'প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে'

৩.২.১.১.২ রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি-বিষয়ক

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ	বর্তমান সংবিধান	সংস্কার প্রস্তাব
ক)	৯	ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।	''যেহেতু বাঙালি ও অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছে; সেহেতু বাঙালিসহ সকল জাতিসত্তার ঐক্য ও সংহতি হইবে 'বাংলাদেশি পরিচয়ের ভিত্তি' লেখা।
খ)	১৫	রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।	খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্ম ও স্বাস্থ্য অধিকারকে রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের[12] প্রতিশ্রুতিসহ বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা।
গ)	১৮। (২)	গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	গণিকাবৃত্তির বিষয়টি বাদ দিতে হবে। কারণ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার নামে যৌনকর্মীদের পেশাকে নিরোধ করা মানবাধিকার লঙ্ঘন।
ঘ)	১৯। (৩)	জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন	'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও অন্যান্য পিছাইয়া পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন'
ঙ)	২৩ ক	রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	'রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'

[12] Progressive realization

৩.২.১.১.৩ সংবিধান-সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী নিশ্চিত করা

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ	বর্তমান সংবিধান	সংস্কার প্রস্তাব
ক)	২ক	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন	যেহেতু রাষ্ট্র একটি ইহজাগতিক সত্তা, সেহেতু কোনো ধর্মীয় বিধান অনুসরন করে সংবিধান শুরু হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তাই, অনুচ্ছেদটি বাতিল করা প্রয়োজন।
খ)	৩	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা৷	'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, তবে রাষ্ট্র অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিকদের ভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করিবে'
গ)	৬। (২)	বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।	'বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসবাসরত প্রতিটি গোষ্ঠী, জাতি, ভাষাভাষী নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন'
ঘ)	৭০	কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি– (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা। কারণ গণতান্ত্রিক চর্চাকে অব্যাহত রাখতে এবং ব্যক্তি-মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে 'রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য' হওয়া উচিত নয়।

সংবিধান-সংক্রান্ত অন্যান্য সংস্কার প্রস্তাব :

ঙ) যে-কোনো রাষ্ট্রীয় পদে জনপ্রতিনিধি হিসেবে (উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় সংসদে) কেউ পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না—এমন বিধান রাখা।

চ) সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

ছ) শব্দ-প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। উদাহরণস্বরূপ: মহিলার পরিবর্তে সকল ক্ষেত্রে 'নারী' শব্দ ব্যবহার করা এবং 'উপজাতি, গণিকাবৃত্তি, উপ সম্প্রদায়, শালীনতা, নৈতিকতা' শব্দসমূহের ব্যবহার পরিহার করা।

জ) ১৯৯৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বহাল রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও চুক্তি এবং প্রথাগত আইনসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে বিশেষ বিধান রাখা।

৩.২.১.১.৪ নারী কমিশন গঠন করা

একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নারী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যার ক্ষমতা থাকবে বৈষম্যমূলক আইন, নীতি ও প্রথা পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করার; যা লিঙ্গ-সংবেদনশীল আইনগত, নীতিগত ও বাস্তব সংস্কার তদারকি করবে এবং কার্যকর-বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এ কমিশনের তদন্ত ও প্রয়োগ ক্ষমতা থাকবে, অভিযোগ-গ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার অধিকার থাকবে, লিঙ্গ-সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে নীতি-সংস্কারকে উৎসাহিত করবে এবং লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও প্রতিবন্ধিতাসহ অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে করা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। (সংযুক্তি: ০১ দ্রষ্টব্য)।

৩.২.১.২ পারিবারিক আইন ও ব্যক্তি-অধিকার

৩.২.১.২.১ অভিন্ন পারিবারিক আইন ঐচ্ছিক করা

ক) একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করা, যা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে।

খ) একটি বিশেষায়িত ফাস্ট ট্র্যাক সিভিল পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে একটি সম্মিলিত আইনি কাঠামোর আওতায় সকল পারিবারিক বিষয়ে বিচারকাজ পরিচালিত হবে, ধর্মভিত্তিক বৈষম্য দূর হবে এবং নারী পুরুষ সমতা আরও সুসংহত হবে।

গ) ভরণ-পোষণের ওপর একটি অভিন্ন ভরণ-পোষণ নীতিমালা তৈরি করা যা একজন ব্যক্তির সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার মানদন্ডের ওপর নির্ধারণ করা হবে। প্রতিটি ভরণ-পোষণ দেনমোহর ও অন্যান্য অর্থ মামলার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে আপীল করতে পারবে।

৩.২.১.২.২ সহিংসতা-সংক্রান্ত আইন: পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ কার্যকর করা।

ক) সুরক্ষা-আদেশের কার্যকর প্রয়োগের দুর্বলতা

- সুরক্ষা-আদেশের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর প্রয়োগব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- সুরক্ষা-আদেশ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি নিশ্চিত করা।
- মামলাগুলোকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উন্নততর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

খ) ক্ষতিপূরণ ও সঠিক অধিক্ষেত্রের অভাব

- সহিংসতার শিকার নারীর জন্য সময়মতো ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
- ২০২৩ সালের পারিবারিক আদালত আইনের ১৭(৫) ধারার অধীনে আদালতকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মামলা দায়েরের এ অধিক্ষেত্র পরিবর্তন করে পারিবারিক আদালতে আনা।
- বিবাহবিচ্ছেদের ৩ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারবে—এমন বিধান রাখা।
- প্রতিকারের সময়সীমা ও কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করা।

৩.২.১.২.৩ হিন্দু ব্যক্তিগত আইন সংস্কার করা।

ক) নিবন্ধন: হিন্দু দম্পতির আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ সংশোধন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করা।

খ) বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিধানের অভাব: বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

গ) উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারের অনুপস্থিতি: হিন্দু বিবাহিত নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণ অধিকার আইন, ১৯৪৬[13] সংশোধন করে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সুস্পষ্ট আইনি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা এবং হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করা।[14]

---

[13] The Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946

[14] The Sindh Hindu Marriage Registration Act, 2016

৩.২.১.২.৪ সন্তানের ওপর নারীর অধিকার

ক) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের ওপর গুরুত্বারোপ করে পিতার ন্যায় মাতার সমান অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ সংশোধন করে মাতার স্বয়ংক্রিয় অভিভাবকত্বের অধিকার প্রদান করা, বিশেষ করে যখন পিতা অনুপস্থিত, অযোগ্য বা অনিচ্ছুক।

খ) সন্তানের অভিভাবকত্বের আবেদন করার সময় পিতার নাম প্রদান করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ এমন একক মা[15] অথবা অজৈবিক মা ও নারী আইনি অভিভাবকরা যেন বৈষম্যের শিকার না হন, সে জন্য জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টে পিতা বা মাতার নামের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে আইনগত অভিভাবকের নাম অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে উচ্চ আদালতে অপেক্ষমান জনস্বার্থ বিষয়ক মামলায় জারিকৃত নির্দেশনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গ) শিশুদের কল্যাণের ভিত্তিতে মায়েদের সমান হেফাজতের অধিকার[16] নিশ্চিত করা এবং সন্তানের মতামত সাপেক্ষে তার হেফাজত নিশ্চিত করা। তা ছাড়া, যৌথ হেফাজতের বিধান চালু করা, যাতে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের ক্ষেত্রে পিতামাতা সমান দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।[17]

ঘ) কর্মজীবী নারীকে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে অযোগ্য বিবেচনা না করা এবং পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতনের ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।[18] অভিভাবকত্ব নির্ধারণে আর্থিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা[19] যা একটি নাবালকের/শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাকে সমানভাবে গুরত্ব দেওয়া।

ঙ) হেফাজত, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

চ) পিতৃহীন নাবালক সন্তানদের সম্পত্তিতে মায়ের আইনি অভিভাবকের অধিকার থাকবে যতক্ষণ তাকে আদালত দ্বারা অযোগ্য/অসমর্থ ঘোষণা করা না হয়।

৩.২.১.৩ জনপরিসরে নারীর আইন ও অধিকার

৩.২.১.৩.১ যৌন হয়রানি ও জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়ন/অধ্যাদেশ জারি।

ক) কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও হেনস্তার সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা।

৩.২.১.৩.২ প্রতিবন্ধী নারীর অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান।

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে স্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধী নারীর বিশেষ প্রতিবন্ধকতাগুলোর কথা উল্লেখ করা, যাতে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ পায়।

খ) প্রতিবন্ধী নারীর সমাজের মূলধারায় সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচিতে নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ[20] গ্রহণ করা।

৩.২.১.৩.৩ যৌনকর্মীদের আইনি সুরক্ষার নিশ্চয়তা দান।

ক) যৌন পেশাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত না করা এবং শ্রম আইনে একে স্বীকৃতি দেওয়া।

খ) যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুবিধাগুলোর নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং শোষণ ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য আইনি সুরক্ষার বিধান করা।

---

[15] Single mother
[16] Custody Rights
[17] Article 12, Convention on the Rights of the Child (CRC) and Section 17(3), Guardian and Wards Act 1890. Anika Ali vs. Rezwanul Ahsan, 10 ADC (2013)
[18] Farhana Azad Vs. Samudra Ejazul Haque and others, 60 DLR (2008) 12, Writ Petition No.770 of 2007.
[19] psychological well-being
[20] affirmative action

৩.২.১.৩.৪ ধর্ষণ-সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করা।

ক) ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের লিঙ্গপরিচয়, যৌনতা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধিতা ও বয়স নির্বিশেষে নিরপেক্ষ বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আইনগত সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে মানবাধিকার মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্ষণ অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্কার করা এবং ধর্ষণের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা।

খ) ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিবাহকে আইনিভাবে নিষিদ্ধ করা।

গ) বারবার ধর্ষণ করা অপরাধীদের দাগি অপরাধীদের সাথে তালিকাভুক্ত করা।

৩.২.১.৩.৫ শ্রম আইন: কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও শ্রম-সুরক্ষা বৃদ্ধি।

ক) নারীরা যেন কর্মস্থলে তাদের ওপর সহিংসতা ও হয়রানি আইনিভাবে মোকাবিলা করতে পারে, সে জন্য শ্রম-সুরক্ষা উন্নত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯ ও ১৯০[21] অনুস্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করা।

খ) নারীদের নিরাপদ ও সমতামূলক কর্মস্থলে কাজ করার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন করে কর্মঘণ্টা, মাতৃত্ব-সুবিধা ও স্বাস্থ্যমান সম্পর্কে আরও কঠোর ও কার্যকর নিয়মাবলি অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.২.১.৩.৬ নাগরিকত্ব আইন সংস্কার করা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী অধ্যাদেশ, ২০০৮[22] ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০০৯[23] অনুযায়ী, বাংলাদেশি নারীরা তাদের বিদেশি স্বামীর মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানদের কাছে তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব হস্তান্তর করতে পারলেও, তারা তাদের বিদেশি স্বামীর বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন না। অথচ, বাংলাদেশি পুরুষরা তাদের বিদেশি বংশোদ্ভূত স্ত্রীর জন্য বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন। এমন আইনি বিধান বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি নারী ও পুরুষের নাগরিকত্বের অধিকারের ক্ষেত্রেও বৈষম্যপূর্ণ। আইন সংশোধন করে বাংলাদেশি নারী নাগরিক কর্তৃক তার বিদেশি স্বামীকে নাগরিকত্ব প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।[24]

৩.২.১.৩.৭ অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে অভিবাসন-সংক্রান্ত আইন সংস্কার করা।

৩.২.১.৩.৮ অপরাধের শিকার ব্যক্তি এবং সাক্ষী সুরক্ষা আইনঃ খসড়া ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও সাক্ষী সুরক্ষা বিল (২০০৬ সালে আইন কমিশন প্রথম খসড়া তৈরি করেছিল এবং ২০১১ সালে সেটি পর্যালোচনা করা হয়েছে) পুনর্বিবেচনা করে তা প্রণয়ন করা এবং এর মধ্য দিয়ে অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা, জরুরি আশ্রয়, জীবিকানির্বাহের সহায়তা, মনো-সামাজিক সহায়তা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তা ছাড়া, অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীর নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সুরক্ষা-ব্যবস্থা চলমান রাখা।

৩.২.১.৩.৯ বৈষম্য বিলোপ আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য-নিরসনের লক্ষ্যে বহুল প্রতীক্ষিত ‘বৈষম্য বিলোপ আইন’ দ্রুত প্রণয়ন করা এবং এর বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা।

৩.২.১.৪ আন্তর্জাতিক সনদের অনুমোদন

ক) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদ এর উপর করা সংরক্ষণসমূহ প্রত্যাহার করা।

খ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা ও পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

[21] International Labour Organisation (ILO) Convention 189 and 190
[22] The Citizenship Amendment Ordinance of 2008
[23] The Citizenship Amendment Act 2009
[24] Article 9, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

৩.২.১.৫ নীতিসংক্রান্ত সংস্কার

খ) বিধি অনুযায়ী মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯-এর ফর্ম ঘ (মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন ফরম বা নিকাহনামা)-এর ৫ নং ধারা থেকে 'কন্যা, কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত' শব্দসমূহের জায়গায় 'বর্তমানে অবিবাহিত কি না', তা প্রতিস্থাপন করা এবং এটি বর-কনে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা।[25]

৩.২.১.৬ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত সংস্কার

ক) অভিবাসী শ্রমিকদের যে-কোনো সময় অভিযোগ জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ দূতাবাস অবস্থিত থাকা দেশসমূহে ২৪/৭ হেল্পলাইন চালু করা। এ ছাড়া, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইনি সহায়তা প্রদান এবং নির্যাতন বা শোষণের শিকার শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করা।

খ) পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০ (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা)বাস্তবায়ন করতে যথাযথ পরিবীক্ষণ, সেবাপ্রদানকারীর সংবেদনশীলতা, সহিংসতার শিকার ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় নিয়ে মামলায় দ্রুত তদন্ত ও রায় নিশ্চিত করা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কার্যকর ভ্রাম্যমান আদালতের বিধান চালু করা।

গ) শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করতে আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন কর্মকর্তা বা বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি দ্বারা হোম ভিজিটের বিধান চালু করা এবং প্রতিবেদন-সাপেক্ষে আদালত-কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

৩.২.১.৭ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

হেল্পলাইনের কার্যকর ব্যবহার: দেশব্যাপী বিনা খরচে সমন্বিত একটি (টোল ফ্রি) কার্যকর হটলাইন স্থাপন করা, যা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। নারীর উপর সকল ধরনের সহিংসতার ঘটনায় দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে এ হটলাইন পরিচালনায় যুক্ত কর্মীদের নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে মৌলিক দক্ষতা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তারা নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান করতে পারে।

৩.২.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৩.২.২.১ আইনসংক্রান্ত সুপারিশ

৩.২.২.১.১ ধর্ষণ আইন-সংক্রান্ত সুপারিশ

ক) বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে ধর্ষণ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে আইন সংশোধন করা।

৩.২.২.১.২ মুসলিম পারিবারিক আইন (মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১) ও মুসলিম বিবাহ আইন এবং বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২ সংস্কার করা।

ক) বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

- বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধনের আগে সালিশি পরিষদের মাধ্যমে আর্থিক বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন সংশোধন করা এবং উভয় পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করে সালিশি পরিষদের কার্যক্রমকে বাধ্যতামূলক করা এবং দেনমোহর, সন্তানের জিম্মাদার ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- দশ বছরের অধিককাল ব্যাপ্ত বিবাহ স্বামী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য আইন সংশোধন করা।

---

[25] BLAST and others v Bangladesh and others [Amendment of kabin-nama], Writ Petition No. 7878 of 2014

খ) স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ

- পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধন করে ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়সীমা **বেঁধে** দেওয়া যেমন ৬ মাসের মধ্যে।
- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্যতা ও মুদ্রাস্ফীতি মূল্যায়ন করে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের অর্থ প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় বেতন কর্তনের **নিয়ম** প্রবর্তন করা বা অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আইন সংশোধন করা।[26]

গ) দেনমোহর

- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ সংশোধন করে বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধনের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেনমোহর পরিশোধ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।
- পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধন করে দেনমোহর সংক্রান্ত দাবির দ্রুত সমাধানের জন্য বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক পারিবারিক আদালত স্থাপনের বিধান রাখা **এবং** মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি অন্তর্ভুক্ত করা।
- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্যতা ও স্বর্ণের বাজারদর মূল্যায়ন করে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা, যেন দেনমোহর সংক্রান্ত মামলা দায়েরের এক বছরের মধ্যে মূল দেনার ৫০% পরিশোধ করা হয়।

৩.২.২.১.৩ খ্রিস্টান ব্যক্তিগত আইন (খ্রিস্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯) ও উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ সংস্কার।

ক) পুরোনো ও জটিল বিবাহবিচ্ছেদ আইন: পুরুষদের ন্যায় নারীদের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিশ্চিত করে The Indian Divorce (Amendment) Act, 2001-এর ন্যায় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯ সংশোধন করে যুগোপযোগী করা, যাতে নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর আর্থিক স্থিতিশীলতা, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার নিশ্চিত হয়।

খ) উত্তরাধিকারে খ্রিস্টধর্মীয় নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ সংশোধন করা।

৩.২.২.১.৪ শিশু ও দত্তক গ্রহণ (অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০) সংস্কার করে আইনি দত্তক-গ্রহণ বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা, যা শিশুটিকে দত্তক পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেবে, পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রদান করবে এবং শিশুটিকে গর্ভজাত সন্তানের মতো একই আইনি সুবিধা প্রদান করবে। আইনে নিশ্চিত করতে হবে যে, দত্তক-গ্রহণ এমনভাবে স্বীকৃত হয়, যা শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ও পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রদান করে।

৩.২.২.১.৫ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা২০১৮ , সংস্কার করা।

ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান সম্পর্কিত ধারা ১৯ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৭ এর কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিধান সমূহের অধীনে সংঘটিত প্রতিটি বাল্যবিবাহের কঠোর ও নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা আবশ্যক। এছাড়া আইনে উল্লেখিত ''বিশেষ প্রেক্ষাপট'' কোন বয়সের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা উল্লেখ না থাকায় আইনের অপব্যববহার ঝুঁকি রয়ে যায়। সেক্ষেত্রে উক্ত ''বিশেষ প্রেক্ষাপট''-কে পুনরায় বিবেচনা করে অপব্যবহার রোধে যৌক্তিক শর্ত আরোপ করা উচিত।

[26] Section 29, The Child Maintenance and Other Payments Act 2008 (UK). Section 125 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/6/section/29
The Madras High Court in Mani vs. Jaykumari (1998) https://indiankanoon.org/doc/1712155/

৩.২.২.১.৬ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

ক) বিবাহ বিচ্ছেদের ৩ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারবে এমন বিধান ধারা ২(৬) অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা পরিবর্তন এবং পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলা পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করতে আইন সংশোধন করা।

গ) বারবার পারিবারিক সহিংসতা করা অপরাধীদের জন্য বাধ্যতামূলক গ্রেপ্তারের নীতি চালু করা।

ঘ) পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে এর মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নির্যাতনকে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। তা ছাড়া, নির্যাতনের ফলে আর্থিক ক্ষতির শিকার হওয়া নারীদের জন্য বিদ্যমান ক্ষতিপূরণের বিধানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

৩.২.২.১.৭ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সংস্কার: প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সংশোধন করে ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন-সংক্রান্ত উপাদান ও ডিজিটাল অসম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফিকে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। অনলাইন ক্ষতির যথাযথ প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞায় ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি, ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন-সংক্রান্ত উপাদান এবং ডিজিটাল অসম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা সংযোজন করা।

৩.২.২.১.৮ বাংলাদেশে কারাবন্দিদের অধিকার, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ জেল কোড, ১৯২০ এবং কারাগারে দণ্ডিত নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬[27] সংশোধন করা।

৩.২.২.১.৯ সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সংশোধন করে আদালতে অনলাইন সাক্ষ্যগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.২.২.১.১০ প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীনে আদালতে ডিজিটাল হয়রানি-সংক্রান্ত মামলায় ডিজিটাল ফরেনসিক প্রমাণের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা।

৩.২.২.১.১১ সম্পত্তির অধিকার

ক) উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে নারীদের জন্য সমান উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা, যাতে ধর্মীয় ও নাগরিক আইনের মধ্যকার বৈষম্য দূর হয় এবং সম্পত্তির ওপর নারীদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

খ) মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মডেলের ন্যায় বাংলাদেশেও বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বৈবাহিক সম্পত্তির ৫০-৫০ ভাগাভাগি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা।[28]

গ) স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিয়ের আগে সম্পদের বাধ্যতামূলক প্রকাশ[29] চালু করা।

৩.২.২.২ নীতিসংক্রান্ত

৩.২.২.২.১ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত নারীর উপর সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, বেইজিং ঘোষণা ও গৃহীত কর্মসূচি, ১৯৯৫[30], টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (বিশেষ করে লক্ষ্য ৫: লিঙ্গ-সমতা) এবং সমান বেতন ও মাতৃত্ব-সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সনদসমূহে বিদ্যমান নারীর অধিকার বিষয়ক লক্ষ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংসদের মাধ্যমে সনদসমূহের বিধান জাতীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা।

---

[27] The Special Benefit for Women Convicted in Prisons Act, 2006

[28] The Turkish Civil Code No. 4721 which came into effect on January 1, 2002 introduced the regime of participation in acquired property as the default matrimonial property regime. Section 76 of the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA 1976 empowers the court to order the division of matrimonial assets acquired during the marriage upon granting a decree of divorce or judicial separation. While the law does not prescribe a default 50-50 division, the courts often aim for an equitable distribution.

[29] pre-marriage disclosure of assets

[30] The Beijing Declaration and Platform for Action, 1995

৩.২.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৩.২.২.৩.১ বিচারব্যবস্থা নারীর জন্য উপযোগি করা।

ক) অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সকল পর্যায়ের সরকারি আইনজীবীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের বিধান করা।

খ) নারী পুরুষের সমতার ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ, অরাজনৈতিক, মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক বিচারক নিয়োগব্যবস্থা চালু করা।

গ) বাংলাদেশ জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক নারীর ওপর বৈষম্য প্রতিরোধে, বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ও দুর্নীতি-নির্মূলে ভূমিকা রাখা।

ঘ) মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে আইনসমূহে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম বাধ্যতামূলকভাবে নিষ্পত্তি করা।

৩.২.২.৩.২ আদালতের অবকাঠামো নারীবান্ধব করা।

ক) শিশু ও নারীবান্ধব বিশেষায়িত আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ব্যক্তিগত শুনানির স্থান এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে পৃথক সুবিধা থাকবে।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সকল বিরোধের কোনো পক্ষ বাঙালি-ব্যতীত অন্য নৃগোষ্ঠীর অধিবাসী, সে সকল ক্ষেত্রে প্রথাগত আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা। প্রয়োজনের ভিত্তিতে দোভাষী ও প্রথাগত আইন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

গ) অনলাইন অপরাধের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, বিশেষ করে নারীর প্রতি প্রযুক্তি-উদ্ভূত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা যেসব জেলায় বেশি, সেসব জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সাইবার ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ঘ) লিঙ্গ-সংবেদনশীল জিজ্ঞাসাবাদ ও সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঙ) দীর্ঘদিন একস্থানে থাকার ফলাফল হিসেবে একচ্ছত্র ক্ষমতার ব্যবহার বন্ধে পেশকার, ক্লার্কসহ আদালত-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বদলি নিশ্চিত করা।

চ) প্রতিটি আদালতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস বা ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা, যেখানে বিভিন্ন আদালত ও বিভাগের অবস্থান জানা যাবে, দরখাস্ত করা ও নথি তোলাসহ সকল প্রয়োজনীয় সেবা ও তথ্য পাওয়া যাবে, বিচারপ্রার্থীরা মামলার অগ্রগতি-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আইন সহায়তা কর্মকর্তা (লিগ্যাল-এইড অফিসার) বা আইন সহায়তা সহকারী (লিগ্যাল-এইড অ্যাসিস্ট্যান্ট) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

৩.২.২.৩.৪ ন্যায় বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

ক) সহিংসতার শিকার নারীদের অনলাইন সাক্ষ্য: আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ ও সাক্ষ্য (সংশোধন) আইন, ২০২২-এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) আদালতে অনলাইন বা ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা: নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রান্তিক বিচারপ্রার্থীর আদালতে সম্মুখীন হওয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে আদালতে শুনানির তারিখসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য খুদেবার্তার মাধ্যমে মোবাইলে প্রেরণ করা যেতে পারে।

গ) প্রতিবন্ধী নারীর অভিগম্যতা

- নারী-প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল হাসপাতাল, থানা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও আদালতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- লিফট ও র‍্যাম্পসহ বিভিন্ন অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব করে তোলার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মাণ বিধিমালায় উল্লিখিত বিধানের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।[31]
- মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিষ্পত্তি-সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে ইশারা ভাষায় পরিষেবা প্রদান করা এবং দোভাষী ও ইশারা-ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা রাখা।
- নির্ধারিত আদালতকক্ষ প্রবেশের অযোগ্য হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (মামলার পক্ষ বা সাক্ষী) অনুরোধের ভিত্তিতে শুনানি একটি প্রবেশযোগ্য কক্ষে স্থানান্তর করা।

ঘ) আইন ও দলিলদস্তাবেজ সহজ বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা এবং আদালতের আদেশ ও রায় ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা।

ঙ) কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন: আদালতকে বিচারপ্রার্থীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। অন্তত উপজেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালত ও বিভাগীয় পর্যায়ে উচ্চ আদালত স্থাপন করা। এ ছাড়া, দুগ্ধপোষ্য, নাবালক ও অভিযুক্ত শিশুকে আদালতে আনা বন্ধ করে বিকল্প উপায়ে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে তার বসবাসের স্থানে গিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

৩.২.২.৩.৫ পরিষেবা বা সহায়তার সম্প্রসারণ করা।

ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে দেশে বিদ্যমান বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা।

খ) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন:

- বিবাহ নিবন্ধনের তথ্য-সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা এবং যার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মসনদ আবশ্যক করা। নতুন বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আগে বিদ্যমান বৈবাহিক অবস্থা যাচাই করার ব্যবস্থা (ডিজিটাল তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত) চালু করা।
- জাতীয় তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত বাধ্যতামূলক অনলাইন বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন বাস্তবায়ন করা।
- বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধনের জন্য নারী নিবন্ধনকারী নিয়োগ করা।

গ) বিরোধপূর্ণ পারিবারিক মামলা হ্রাস এবং শান্তিপূর্ণ সমঝোতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা[32] বাধ্যতামূলক করা।

ঘ) সহিংসতার শিকার নারীদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে কাউন্সেলিং সেবা সংযুক্ত করা।

৩.২.২.৩.৬ আইন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ক) তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সাক্ষ্যগ্রহণ ও সমন-পদ্ধতি সহজ করার মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা।

---

[31] Chapter 2- Classification of buildings based on occupancy, part 3- General building requirements, control and regulation, Bangladesh National Building Code, 2020

[32] pre-trial mediation

খ) রায় প্রদানের পর দ্রুততম সময়ে অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রমতো পক্ষগণের কাছে রায় বা আদেশের কপি সরবরাহ করা **এবং** ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

গ) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে তার শারীরিক ও মানসিক ডাক্তা**রি** পরীক্ষা নিশ্চিত করা, পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য নথিভুক্ত করা **এবং** গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মুক্তির সময়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা।

৩.২.২.৩.৭ আইন ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

ক) আইনগত বিধানের সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা না হলে বিচারসংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে দায়িত্ব অবহেলায় সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সময়ের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা।

গ) মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যকর করতে এ যাবৎ প্রণীত বিধানসমূহ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা।

৩.২.২.৩.৮ মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

ক) কারাগার ও হাজতবাসী এবং নিরাপদ হেফাজতে থাকা নারীসহ সকল ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা, পরিবার ও আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের অধিকার, মানসম্মত খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা এবং নারীদের জন্য মাসিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

খ) দেহতল্লা**শি**র নামে যৌন হেন**স্তা** বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ) সহিংসতার শিকার নারী ও নারী-অপরাধীদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া

৩.২.২.৩.৯ সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বিশেষায়িত আইনি সহায়তা ও ভুক্তভোগী সহায়তা কেন্দ্র গঠন করা।

৩.২.২.৩.১০ আইনি সহায়ক/সহকারী (প্যারালিগ্যাল) স্বীকৃতি দেয়া।

ক) কার্যকর আইন সহায়তার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্যারালিগ্যাল দ্বারা সেবা প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় প্যারালিগ্যাল নিয়োগ করা, যিনি নারী-বিচারপ্রার্থীদের সহায়তা করবেন।

খ) আদালত, থানা, হাসপাতাল, কারাগার ও শরণার্থীশিবিরের মতো স্পর্শকাতর স্থানে নারীসহ সকল বিচারপ্রার্থীর প্রবেশগম্যতাকে সহজ করা।

গ) দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে এটিকে রাষ্ট্রের আইনগত সহায়তা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.২.২.৩.১১ মীমাংসাযোগ্য দেওয়ানি ও অধর্তব্য ফৌজদারি অপরাধ আপস-মীমাংসার[33] মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা। অসন্তোষের ক্ষেত্রে আপিলের বিধান রাখা। গুরুতর অপরাধ ব্যতিরেকে সকল অপরাধের বিচারের প্রথম ধাপ হিসেবে আপস-মীমাংসা পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৩.২.২.৩.১২ বিচারব্যবস্থা যুগোপযোগী করতে প্রয়োজনীয় বাজেট, জনবল ও অবকাঠামো-ব্যবস্থা করা।

[33] Arbitration

৩.২.২.৩.১৩ নারী-কারাবন্দিদের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষা করা।

ক) কারাগারের ভিড় বা অতিরিক্ত বন্দিত্ব কমানোর জন্য লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে বিকল্প শাস্তি (**অব্যবহিত শাস্তি** বা কারাগারে আটক না রেখে প্রদত্ত শাস্তি) প্রদান করা, নারী-সংবেদনশীল ও শিশুদের যত্নের সুবিধাসহ অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

খ) স্বাস্থ্যসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির সুবিধা ব্যবস্থা রাখা।

গ) কারাগারে নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যে নারী-কারারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাধীন পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ) নারী-কারাবন্দিদের সমাজে পুনঃপ্রবেশ সহজ করতে পুনর্বাসন-কর্মসূচির মধ্যে মৌলিক শিক্ষা ও মানসিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা।

ঙ) দণ্ডিত নারী-বন্দিদের জন্য বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার ভিত্তিতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৩.২.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত সুপারিশ

৩.২.২.৪.১ বিচার বিভাগ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি: বিচারক, আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারি আইনজীবীদের জন্য বাধ্যতামূলক লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা ও পক্ষপাতহীনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা, যাতে তারা ভুক্তভোগী ব্যক্তির স্বার্থকেন্দ্রিক ও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

৩.২.২.৪.২ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ও সকল সরকারি চিকিৎসককে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষায় দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা[34] নিষিদ্ধ বিষয়ে সচেতন করা।

৩.২.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৩.২.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৩.২.৩.১.১ অভিন্ন পারিবারিক আইন

ক) অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করা, যা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তান পালনের অধিকার ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

খ) বিশেষায়িত সিভিল পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সম্মিলিত আইনি কাঠামোর আওতায় সকল পারিবারিক বিষয়ে বিচারকাজ পরিচালিত হবে, ধর্মভিত্তিক বৈষম্য দূর হবে এবং লিঙ্গ-সমতা আরও সুসংহত হবে।

গ) বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হবে।

৩.২.৩.২ নীতিসংক্রান্ত

৩.২.৩.৩ রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক এবং মানবিক

[34] two-finger test

চতুর্থ অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহ

পুরুষের ক্ষমতা ভেঙ্গে গড়ো সমতা

৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই নারীর অগ্রগতি, উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্র নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরসন, নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে সরকার নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বহুস্তরীয় কাঠামো স্থাপন করেছে। এ বহুস্তরীয় কাঠামোর মাধ্যমে নারী-পুরুষ ভেদে সংবেদনশীল নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।[35]

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা: এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নারীর অধিকার সংরক্ষণ, সমান সুযোগ সৃষ্টি, ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এ মন্ত্রণালয়টি নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নারীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এছাড়া, নারী উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য[36] অর্জনে কাজ করা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা, এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও নারী সংগঠনের সাথে সমন্বয় করাও এর দায়িত্ব। নারী উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কমিটি গঠন করেছে, যারা নীতিনির্ধারণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মূল্যায়নের কাজ করে। এমন কয়েকটি কমিটি নিম্নরূপ:

জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ[37]: এর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নারী ও শিশু উন্নয়ন-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা ও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় এবং তদারকি করা।

নারী-উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি: মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় তদারকি করে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নারী-উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টগণ নিজ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়ক কাজ সমন্বয় করে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই ফোকাল পয়েন্টদের কাজের সমন্বয় করে।

মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান ও শাখাসমূহ:

পলিসি লিডারশীপ অ্যান্ড এডভোকেসি ইউনিট (প্লাউ)[38] বা নীতি ও দেনদরবারে নেতৃত্বদানকারী ইউনিট: নারী ও শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এটি নারীর অধিকার রক্ষা ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া, আইন পর্যালোচনা, সংশোধন, নতুন নীতি প্রণয়নে সুপারিশ, নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ অধিশাখা: নির্যাতিত নারীদের জরুরি সহায়তা এবং আইনি পরামর্শ প্রদান করে। এটি হেল্পলাইন, আশ্রয়কেন্দ্র, সচেতনতা বৃদ্ধি, পরামর্শ ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে এবং প্রশাসনিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে নারীদের সহায়তা নিশ্চিত করে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাঠপর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রধান প্রকল্পসমূহ:

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্তরে আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে আছে:

নারী বিষয়ক অধিদপ্তর: মাঠপর্যায়ে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে। এটি নারীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও ঋণসুবিধা প্রদান, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইনগত সহায়তা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। নারী উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্বও পালন করে। এছাড়া, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল[39] এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জরুরি সহায়তা, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয় এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়।

---

[35]মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম "নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বিধায় এ প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলা হচ্ছে। একইভাবে "মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর" কে "নারী বিষয়ক অধিদপ্তর" বলা হচ্ছে।

[36] SDG, CEDAW

[37] National Council for Women and Child Development (NCWCD)

[38] Policy and Leadership Advocacy Unit (PLAU)

[39] One-Stop Crisis Cell (OCC)

জাতীয় মহিলা সংস্থা: নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা, ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এছাড়া কর্মজীবি হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও নারীর উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি: শিশুদের সৃজনশীল বিকাশ ও প্রতিভা-উন্নয়নে সংস্কৃতি ও নৈতিকতা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে। শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং শিশুদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

ডিএনএ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর: নিরাপত্তাসংস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আদালতের সঙ্গে সমন্বয় করে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিচারিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানে ডিএনএ পরীক্ষা; ধর্ষণ, নির্যাতন ও মানবপাচার সংক্রান্ত মামলার ফরেনসিক তদন্তের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণ; নিখোঁজ শিশু ও নারী শনাক্তকরণে ডিএনএ ম্যাচিং; শিশুর পিতৃ পরিচয় যাচাইতে সহায়তা করে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নেও ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো হলো, ক) গ্রাম ও শহরের দরিদ্র স্তনদানকারী মায়েদের জন্য গর্ভকাল থেকে শিশুর ৩৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণে প্রদত্ত মাসিক **মা ও শিশু সুবিধাভাতা**; খ) দরিদ্র নারীর জন্য দুই বছর-মেয়াদি খাদ্যসহায়তা ও দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণে **ঝুঁকিপূর্ণ নারী সুবিধা**[40] **যাতে** ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারী সুবিধা পান; এবং গ) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং, বাজার-সংযোগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে **জয়িতা ফাউন্ডেশন** কাজ করে। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে আছে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য **ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার** এবং তরুণ ছেলে-মেয়েদের সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে তৈরি করতে **কিশোর-কিশোরী ক্লাব**।

আন্তর্জাতিক সনদ এবং নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক প্রতিশ্রুতি: নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, প্রটোকল ও জাতীয় প্রতিশ্রুতিগুলো প্রতিপালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলো হলো, ক) ১৯৭৯ সালে প্রণীত 'নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদ' এ বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে স্বাক্ষর করে ও প্রতি ৪ বছরে বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন দাখিল করে, খ) ১৯৯৫ সালে প্রণীত বেইজিং সম্মেলনের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ও ৫ বছর অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করে; গ) ২০১৫ সালে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে নারী-পুরুষের সমতা ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের বাস্তবায়ন মনিটরিং করে; এবং ঘ) ২০০০ সালে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে গৃহীত পালেরমো প্রটোকলের বাস্তবায়ন করে।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের নীতি কাঠামো: ১৯৯৫ সালে প্রণীত বেইজিং সম্মেলনের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি[41] ১৯৯৭, যা ২০১১-তে হালনাগাদ করা হয়। নারীদের আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষায় এটি একটি সামগ্রিক কাঠামো। এছাড়া আছে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা[42] (২০২২-২০৩০), নারী ও শিশু-নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫), নারী ও শিশু নির্যাতন নির্মূলে জাতীয় পরিকল্পনা (২০২২-২০৩২); বাংলাদেশের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা[43] ২০১৯-২০২৫; এবং বাল্যবিবাহ নির্মূলে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-২০৩০। বাংলাদেশের জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রয়েছে সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় নারী-পুরুষের সমতার অন্তর্ভুক্তি ও পরিবীক্ষণ কৌশল।

---

[40] Vulnerable Women Benefit (VWB)

[41] National Women Development Policy (NWDP)

[42] National Action Plan (NAP)

[43] National Action Plan on Women, Peace, and Security (NAP-WPS)

বৈষম্য দূর করার কৌশলসমূহ:

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা[44]: নারী-পুরুষের সমতার জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলো নারী-পুরুষের সমতা-উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং প্রকল্প প্রণয়ন ছকে একটি নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রকল্প নকশা ও পর্যালোচনার জন্য ২০০৯ সালে একটি নির্দেশিকা তৈরি করে যা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি[45] অনুমোদন করে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং[46]: নীতিনির্ধারণে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অধীনে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট চালু হয়। প্রথমে ৪টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৪টি মন্ত্রণালয় এর আওতায় আসে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—মন্ত্রণালয়গুলোর বাজেটের একটি অংশ জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ, নারী-উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতার জন্য নির্দিষ্ট বাজেট-বরাদ্দ, এবং বাজেটের ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ শুরু হয়, যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের ৩৪.৩৭ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.২৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়।

নারী-পুরুষ ভেদে উপাত্ত সংগ্রহ: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সময়ের সাথে সাথে জাতীয় জরিপ ও আদমশুমারিতে নারী-পুরুষ ভেদে সূচক সংযোজন করেছে। বাংলাদেশের জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপ[47] এবং শ্রমশক্তি জরিপ[48] এ নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক মডিউল সংযোজন হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে নারীর উপর নির্যাতন-বিষয়ক জরিপ; ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো সময় ব্যবহারের জরিপ[49] **পরিচালনা করে।** টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক সূচক জাতীয় নারী-উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: বাংলাদেশ জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র[50]; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি[51]; জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি[52] সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদের জন্য নারী-পুরুষের সমতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

৪.২ বৈষম্য, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:

নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য বহুমুখী প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। পরিবীক্ষণ, বাজেট ব্যবহার ও নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত সক্ষমতার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নারী সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকলেও মন্ত্রণালয়টি বরাবরই কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একজন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও মানবসম্পদ সীমিত। মন্ত্রণালয় দক্ষতা ও সামাজিক উন্নয়নের ছোটো-ছোটো প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প প্রদানে গুরুত্ব দেয়। অন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য এর দক্ষতা, কর্তৃত্ব এবং মনোযোগ অপর্যাপ্ত।

---

[44] Gender Responsive Planning (GRP)
[45] Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC)
[46] Gender Responsive Budgeting (GRB)
[47] Household Income and Expenditure Survey (HIES)
[48] Labour Force Survey (LFS)
[49] Time Use Survey (TUS)
[50] Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC)
[51] Academy for Planning and Development (APD)
[52] National Academy for Social Services (NASS)

জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ: উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয়কারী পরিষদ হলেও ২০১৫ সালের পর এর কোনো সভা হয়নি। এতে কৌশলগত পরিকল্পনা ও নীতিমালা বাস্তবায়নে পরিষদের কোনো ভূমিকা নেই বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট: নিয়মিত সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিতে[53] নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার ভূমিকার উল্লেখ নেই। ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের কর্মপরিধিতে উল্লেখ না থাকায় নারী উন্নয়নের বিষয়টি তাদের জন্য গৌণ, অস্থায়ী এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই।

নারী বিষয়ক অধিদপ্তর: নারীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও হেল্পলাইন সেন্টার, স্বেচ্ছাসেবী নারী সমিতি নিবন্ধন, বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, কর্মজীবী নারী হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরীদের ক্লাব এবং নারী, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নির্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করে। তবে, এর বাজেট এবং জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম।

জাতীয় মহিলা সংস্থা: নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা-উন্নয়ন, উদ্যোক্তা-উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, কর্মজীবী নারীর জন্য হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তা প্রদান করে। এর কর্মসূচী নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে একই রকম। সংস্থার নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নিয়োগপ্রাপ্ত। এর দিকনির্দেশনামূলক কোনো ভূমিকা নেই।

নারী বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা: উভয়ের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ, আইনি সহায়তা ও সহিংসতা প্রতিরোধ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম প্রায় একই ধরনের। একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, স্থানীয় পর্যায়ে জনবল, বাজেট ও দক্ষতার অভাব ও একই ধরনের কর্মসূচিতে সম্পদের অপচয় দেখা যায়।

নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের **অঙ্গনা** বিপণনকেন্দ্র **ও জয়িতা** ফাউন্ডেশনের কাজের দ্বৈততা রয়েছে। দুটি উদ্যোগই নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনে সহায়তা করে, যা সমন্বয়ের অভাব ও অর্থের অপচয় নির্দেশ করে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বাজেট সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রয়েছে, যাতে হিসাবে ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।

ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষাগার: ফরেনসিক বিজ্ঞান, জেনেটিক বিশ্লেষণ ও ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ জনবল ও সফটওয়্যারের অভাব রয়েছে। নমুনা সংগ্রহ থেকে প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি ধীরগতি, যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। ডিএনএ তথ্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় তথ্যভান্ডার, বায়োসেফটি স্ট্যান্ডার্ড, গোপনীয়তা রক্ষা এবং অপব্যবহার প্রতিরোধের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের নয়।

জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিকল্পনা: পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সরকারি বিনিয়োগ এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের নকশা, প্রক্রিয়া, অনুমোদন ও সংশোধনে নির্দেশিকা জারি ও সংশোধন করেছে। তবে, এই নির্দেশিকায় নারী-পুরুষেরর সমতা, প্রবীণ ও অন্যদের উপর প্রকল্পের প্রভাব এবং নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার পদক্ষেপ সম্পর্কে উল্লেখ করতে বলা হলেও নারী-পুরুষ সমতা বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা সূচক সংযুক্ত করার নির্দেশনা নেই।

২০০৯ সালে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নারী-পুরুষের সংবেদনশীল প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলেও তা পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প নকশা প্রণয়ন নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক স্পষ্ট পদক্ষেপের অভাব প্রতীয়মাণ হয়। অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রকল্প প্রস্তাবনায় নারীর সুবিধার বিষয়ে সাধারণ বিবরণ দেন, যা অনেক সময় অন্যান্য প্রকল্পের নথি বা প্রাক-প্রস্তাবনার নথি থেকে অনুলিপি করা হয়।

এছাড়া, পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প-সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ছকে নারী-পুরুষের সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া প্রায়ই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এড়ানোর জন্য ছোটো আকারের প্রকল্প নকশা ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা সম্পদের অপচয়ে পরিণত হয়।

[53] Allocation of Business

জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিবীক্ষণ সমস্যা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ উন্নয়ন-প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে, তবে এটি মূলত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির উপর গুরুত্ব দেয়। প্রকল্প নথিতে যদি নারী-পুরুষের সমতা এবং নারী-উন্নয়নের কার্যক্রম ও সূচক স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তবে সামাজিক এবং নারী-পুরুষের সমতার বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করা হয় না। বিদ্যমান ছকগুলোতে সামাজিক দিকগুলোর মূল্যায়নের জন্য কোনো নির্দেশনা নেই। তবে, প্রকল্পের মধ্য-মেয়াদ বা সমাপ্তির সময় কিছু প্রকল্পে সামাজিক ও নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে সীমিত মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিংয়ের সমস্যা: প্রথমে, GRB-তে পূর্বে ব্যবহৃত Recurrent, Capital, Gender and Poverty (RCGP) মডেল পরবর্তীতে iBAS++ এর সাথে একীভূত হয়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য iBAS++ এর আওতায় নতুন জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং[54] মডেল তৈরি করা হয়েছে, যা পেশাগতভাবে প্রশংসিত হলেও এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। GRB এখনো অনুমিত মানবণ্টনের ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে বাজেট বরাদ্দে অসামঞ্জস্য হতে পারে। মানবণ্টনের মানসম্পন্ন পদ্ধতি না থাকায়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং নারী-পুরুষ বিভাজিত সঠিক তথ্যের অভাবে বাজেট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনেক মন্ত্রণালয় জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিংকে শুধুমাত্র প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য দায়সারা পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করে। বাজেট সংশোধনের সময়, জেন্ডার বাজেটের অর্থ প্রায়ই অন্যত্র বরাদ্দ হওয়ায় জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারী অধিকার সংগঠনগুলো বাজেটের প্রকৃত ব্যয় অনুসরণের দাবি জানালেও, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এখনও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যানের সমস্যা: নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য ধারাবাহিক এবং পূর্ণাঙ্গ উপাত্তের অভাব রয়েছে, বিশেষ করে অবৈতনিক সেবামূলক কাজ, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রম ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে। এমনকি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ বিভাজিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এছাড়া, উপাত্ত প্রায়ই অন্যান্য উপাদান—যেমন: বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভাজিত না হওয়ায় নারী-পুরুষ বৈষম্যের প্রভাব ঠিকভাবে বোঝা যায় না। পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জেন্ডার বিশ্লেষণে দক্ষতার অভাব থাকায় উপাত্তের গুণগতমান ও নির্ভরযোগ্যতা প্রভাবিত হচ্ছে।[55]

৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৪.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৪.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৪.৩ ১.১.১.নারীর অধিকার বিষয়ে সকল আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

ক) ২০০৯ সালের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশাবলি আইনে পরিণত করে তা কার্যকর করা।

খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর ১৮ বছরের কম বয়সে বিবাহ অনুমোদনের বিশেষ ধারা বাতিল করা। (প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)

গ) এ প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে যেসব আইন সংশোধনের সুপারিশ আছে সেগুলো পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া।

[54] Gender Finance Tracking (GFT)

[55] Workshop presentation by Dilara Begum, Joint Secretary MOWCA, on Review Progress of SDG 5 in preparation for Voluntary National Review (VNR) b General Economics Division, Planning Commission, 2025

৪.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৪.৩.১.২ ১.নারীর অধিকার বিষয়ে সকল সনদে স্বাক্ষর করা।

ক) নারীর উপর সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ এর উপর বিদ্যমান সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা।

খ) আইএলও কনভেনশন ১৯০ ও কনভেনশন ১৮৯ এর অনুস্বাক্ষর সম্পন্ন করা।

৪.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৪.৩.১.৩.১ জাতীয় পর্যায়ে নারী অধিকার রক্ষা বিষয়ে নজরদারি ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

ক) একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা তৈরি এবং রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করা।

খ) নারী-উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদ পুনর্গঠন করা এবং এর কর্মপরিধি পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন করা।

৪.৩.১.৩.২ মন্ত্রণালয়ের নারী অধিকার বিষয়ে নেতৃত্ব দান ও পরিবীক্ষণকারী ভূমিকা শক্তিশালীকরণ ও পুনর্গঠন।

ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা।

খ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি হালনাগাদ ও সংশোধন করে নারীর উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব, সমন্বয় ও পর্যালোচনার মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমিকা, দায়িত্ব ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংশোধন করে সরকারের মধ্যে নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের মধ্যে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব স্পষ্ট করা।

৪.৩.১.৩.৩ নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

ক) মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের দক্ষ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি, দক্ষ জনবল, বাজেট ও সহায়ক সেবাসহ দুটি আলাদা উইং স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

খ) প্লাউ ইউনিট এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এর কার্যপরিধি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় জনবলসহ সমন্বয়, গবেষণা ও প্রচারণায় সহায়তা স্পষ্ট করা।

গ) নারী বিষয়ক অধিদপ্তর ও শিশু একাডেমি মাঠপর্যায়ে সচেতনতার জন্য দিবস পালনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলিতে দিবস পালনে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া।

ঘ) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ অধিশাখাকে আরও শক্তিশালী করা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে বিদ্যমান কমিটিগুলো পুনর্গঠন/কার্যকর করা।

৪.৩.১.৩.৪ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সুসংহত করা।

ক) জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিলুপ্ত করে এর মানবসম্পদ ও কার্যক্রম নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা।

খ) অধিদপ্তরের জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমিকে নারী-পুরুষের সমতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দক্ষ একাডেমিতে পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) বিচারিক কাজ তরান্বিত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৪.৩.১.৩.৫ নারী বিষয়ক অধিদপ্তর পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ।

ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে নারী বিষয়ক অধিদপ্তর করা।

খ) জেলা ও থানা কর্মকর্তাদের জন্য বাস্তবসম্মত ও স্পষ্ট দায়িত্ব, কাজ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কাজের বিবরণ তৈরি করা এবং মাঠ কার্যালয় ও মাঠ কর্মকর্তাদের আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ভূমিকা স্পষ্ট করা।

গ) মাঠপর্যায়ের কার্যালয়গুলোর দিকনির্দেশনা ও পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরে একটি নির্দিষ্ট ইউনিটকে দায়িত্ব প্রদান করা।

৪.৩.১.৩.৬ সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

ক) অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যপরিধি সংশোধন করে তাদের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়নের কাজ স্পষ্ট করার প্রস্তাবনা দেওয়া এবং অনুমোদনের ব্যবস্থা নেওয়া।

খ) প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সমতা-বিষয়ক ইউনিট/সেল প্রতিষ্ঠা করে, এর দায়িত্ব, জনবল এবং নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়নের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্দেশিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি[56] প্রণয়নের নির্দেশনায় নারী-পুরুষ সমতার প্রতিশ্রুতি, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম ও কর্মপরিধি পরিবর্তন করা। মন্ত্রণালয় দুইটি আলাদা উইং করে পার্বত্য জেলাসমূহ ও সমতলের সকল জাতিগোষ্ঠীর নারীর উন্নয়নে আইন, নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া।

৪.৩.১.৩.৭ জেন্ডার বাজেটিংয়ের অংশ হিসেবে ব্যয়ের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

ক) জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট পরিবীক্ষণ ও ব্যয়-ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অনুসরণ করা। এগুলো iBAS++ সিস্টেমে প্রয়োজনীয় কোড প্রবর্তন করে করা সম্ভব।[57] এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া।

৪.৩.১.৩.৮ সরকারি কাঠামোতে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন জোরদার করা।

ক) উন্নয়ন-প্রকল্প প্রস্তাবনা ও কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নের নির্দেশিকা ও ছক পর্যালোচনা করে প্রকল্প প্রস্তাবনা নির্দেশিকাতে নারী-উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতাসংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে চলমান পর্যালোচনায় প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করা।[58] নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০০৯) প্রণীত নির্দেশিকা হালনাগাদ করে পরিকল্পনা কমিশনের ছকে সংযুক্ত করা।

খ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্দেশিকা ও ছক সংশোধন করে সামাজিক ও নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে প্রাক মূল্যায়ন ব্যবস্থা যোগ করা।

গ) পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ[59] এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ[60] উভয়েই জেন্ডার সমতা সেল স্থাপন ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টরাল বিভাগে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা।

ঘ) নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য নাগরিক কমিটি গঠন করে নারী ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

---

[56] Annual Performance Agreement (APA)
[57] অর্থবিভাগের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় জানা গিয়েছে।
[58] নির্দেশিকাটি বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং এর সংশোধিত সংস্করণ ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ পাওয়া যাবে বলে একনেক (ECNEC) উইং-এর সঙ্গে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর বৈঠকে জানা গেছে।
[59] General Economic Division (GED)
[60] Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)

৪.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৪.৩.১.৪.১ নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

ক) সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থল ও আবাসস্থলে এলাকার ভিত্তিতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ,মানসম্মত পরিচালনা কার্যপ্রণালী[61] নির্ধারণ, নিবন্ধন এবং মান ও নিয়ম সঙ্গত বাস্তবায়ন নজরদারি নিশ্চিত করা।

খ) কর্মজীবী নারীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি আবাসিক হোস্টেল স্থাপন ও সহায়তা প্রদান, মানসম্মত পরিচালনা কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, নিবন্ধন, এবং মান ও নিয়মের সঠিক বাস্তবায়ন নজরদারি নিশ্চিত করা।

গ) নারী উপর নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে বহুখাতভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকে আরও শক্তিশালী করা।

৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৪.৩.২.১ নীতিসংক্রান্ত

৪.৩.২.১.১ নারী উন্নয়ন নীতি হালনাগাদ করা।

ক) নারী-উন্নয়ন নীতি ২০১১ পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করা।

৪.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৪.৩.২.২.১ নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালীকরণ।

ক) মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর পদে একজন পূর্ণ মন্ত্রীকে দায়িত্ব প্রদান করা।

খ) নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক দুইটি উইং স্থাপন করা।

গ) মন্ত্রণালয়ের নীতি ও দেনদরবারে নেতৃত্বদানকারী ইউনিটকে একটি দক্ষ কারিগরি ইউনিট হিসেবে সক্ষম করে তোলা।

ঘ) জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমিকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ একাডেমিতে রূপান্তরিত করতে, একাডেমির কার্যপরিধি পরিমার্জন, পর্যাপ্ত মানবসম্পদ ও বাজেট প্রদান করা।

৪.৩.২.২.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুসংহত করা।

ক) অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে নারীদের স্বার্থ পূরণের জন্য নিয়মিত সমন্বয়-সভা ও প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।

খ) সকল মন্ত্রণালয়ের নারী-পুরুষ সমতা সেলের সঙ্গে সমন্বয় কৌশল নির্ধারণ করে সচিবসহ কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান করা।

গ) নারী-উদ্যোক্তাদের বিপণন সহায়তার জন্য অঙ্গনা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একীভূত করা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় না রাখা।

ঘ) জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে পরিচালিত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল কর্মসূচিকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নিয়ে আসতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, মানবসম্পদ ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

[61] Standard Operating Procedure (SOP)

৪.৩.২.২.৩ নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে জবাবদিহি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা।

ক) প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তিতে নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রাখা।

খ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নকারী সংস্থায় নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ক সেল স্থাপন করা, যা নিজ প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমতা মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির কাজ সমন্বয় করবে।

৪.৩.২.২.৪ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

ক) জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট-প্রণয়ন এবং পর্যালোচনায় দক্ষতা বৃদ্ধি। বাজেট প্রস্তুতি কমিটিগুলোকে বাজেটের জেন্ডার বিশ্লেষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি[62] এর অধীনে সংযুক্ত করা যেতে পারে, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যা পরিবীক্ষণ করবে।

৪.৩.২.২.৫ সরকারি কাঠামোতে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

ক) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক পর্যালোচনা করে সামাজিক ও জেন্ডার-সম্পর্কিত কাজ ও তার ফলাফল পর্যালোচনার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা। প্রয়োজনে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা, যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম কর্মসূচি[63] এর পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা নেয়া যায়।

৪.৩.২.২.৬ নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করা।

ক) নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করতে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে কর্মকর্তা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রাহক ও বিশ্লেষকরা এ পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বুঝতে পারেন।

খ) নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কে সরকারের পারফরম্যান্সের সূচক সম্প্রসারণ করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট থেকে আরও সূচক নির্ধারণ করা। পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সমতা ফলাফলের সূচকের একটি সংকলন সব খাতের জন্য নির্ধারণ করে জাতীয় পর্যায়ে সূচকগুলোর একটি তালিকা চিহ্নিত করে পর্যবেক্ষণ করা।

গ) দারিদ্র্য ও আয়ের লিঙ্গ বিভাজিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা, যাতে নারীদের দারিদ্র্য লাঘব পরিমাপ করা যায়।

ঘ) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণগুলোকে জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি করা, যাতে নারীর উপর সহিংসতা ও অবৈতনিক যত্নের কাজের মতো বিষয়গুলোর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

ঙ) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অবাধে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও নীতিনির্ধারণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

চ) নারীর বয়স, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগলিক অবস্থান ও আয়সহ অন্যান্য উপাদানও বিবেচনায় নেওয়া, যাতে বৈষম্যের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

৪.৩.২.২.৬ আন্তঃমন্ত্রণালয় জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

ক) প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা।

খ) প্রত্যেক প্রকল্পের নারী-পুরুষের সমতার উপর ফলাফল পর্যালোচনার জন্য বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে দায়বদ্ধতা প্রদান করা।

গ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে নারী-পুরুষের বাজেটের ব্যয়-নিরীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা।

[62] Financial Management Academy (FIMA)
[63] Financial Management Reform Programme (FRMP)

৪.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৪.৩.২.৩.১ সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতায় জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক) সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ) সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য নারী-পুরুষের সমতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রম তৈরি বা হালনাগাদ করে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের মাধ্যমে সকল প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪.৩.২.৩.২ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি শক্তিশালী করা।

ক) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা এবং এর প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য সঠিক উপকারভোগী বাছাইপূর্বক যথাযথ বিতরণব্যবস্থা করা এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ করা।

খ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ মা ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে সম্প্রসারিত করা এবং ছোটো-ছোটো কর্মসূচি একীভূত করে বড়ো কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা (চতুর্দশ অধ্যায়ে সামাজিক সুরক্ষা দেখুন)। অন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে মিল হয় এমন কর্মসূচি নেওয়া থেকে বিরত থাকা।

৪.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

ক) রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ে এবং স্তরে নারী পুরুষ সমতা বিষয়ক নীতি অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন

আমার কথা আমি বলব, স্বাধীনভাবে পথ চলব

৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র-শক্তিশালীকরণ, নীতিনির্ধারণ ও সেবা প্রদানে তৃণমূল-পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের সবচেয়ে নিকটস্থ প্রশাসনকাঠামো হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের—বিশেষ করে নারীদের—রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়া, তাদের মতামত প্রকাশ এবং তাদের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে—এমন নীতিতে অবদান রাখার সুযোগ প্রদান করে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কর্মসূচি ও সেবায় জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, নারীদের অংশগ্রহণ ও দাবি প্রকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী পুরুষ-সংবেদনশীলতা ও নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেলে সমাজে জেন্ডারভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে অগ্রসর করা সহজ হয়। সর্বোপরি, একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ও টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে নারীর অধিকার ও চাহিদাগুলো স্থানীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সমন্বিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একের পর এক সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করেছে[64]। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জনগণ প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করবে।" এ-ছাড়াও, ৫৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হবে।"

স্থানীয় সরকারের কিছু বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হলো: সারা দেশে মোট ৩৮টি শহরে মাতৃস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৪৫টি নগরস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ২৭৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, শহরের অনুন্নত এলাকায় মা ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, জরুরি প্রসূতি পরিষেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছে। দেশের সকল জেলায় শুধু ৫৯,১৮০ জন দুস্থ নারীকর্মী দ্বারা প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার, অর্থাৎ সর্বমোট ৯০,১৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এতে ৬৪ লক্ষ জনগণের কাজের সুযোগ হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ নারীপ্রতিনিধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে নারী-সভাপতি রয়েছেন। শহরাঞ্চলে পরিকল্পনায় ওয়ার্ড ও শহরভিত্তিক কমিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা নগর পরিকল্পনায় অবদান রাখছেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরও দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ ও তৃণমূল জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে এবং ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড সভা গঠনের ব্যবস্থা করেছে। ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা—এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নাগরিকরা স্থানীয় উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থায় অংশ নিতে এবং প্রভাব রাখতে পারে। তবে, বাস্তবে এসব সভার কার্যকারিতা আশানুরূপ নয়।

৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

বাস্তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবল সংকটে ভুগছে। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি হলেও, ক্ষমতা সীমিত। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আইন ও বিধি-বিধানে একই বিষয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু লাইন বিভাগগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করছে না। স্থানীয় সরকার-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি ও নীতিমালায় নারীদের অংশ নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে তারা যথাযথ মর্যাদা ও ভূমিকা পালনের সুযোগ পান না। পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে নারীসহ নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন বিধান রয়েছে, কিন্তু প্রকল্প সহায়তা ছাড়া এগুলো নিশ্চিত করা কঠিন। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির জন্য বিভিন্ন কাঠামো তৈরি করেছে, তবে এরও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন—যথাযথ ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অভাব, সীমিত অংশগ্রহণ এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব। সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী সনাক্তকরণ এবং সহযোগিতা/ভাতা বিতরণে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তবে এই কর্মসূচিগুলো অন্তর্ভুক্তি ও বহিস্করণ ত্রুটির শিকার হয়, নারী-সুবিধাভোগীদের তথ্যসংগ্রহের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। (এ প্রতিবেদনের সামাজিক সুরক্ষা-সম্পর্কিত ১৪ নম্বর অধ্যায় দেখুন)। সবার জন্য জন্মনিবন্ধন এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতারোধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহরোধে স্থানীয় সরকার সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই তারা কার্যকর হয়নি।

---

[64] Fox and Menon, 2008. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৫.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৫.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) রাজনৈতিক দলভিত্তিক স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন রহিত করা।

খ) পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলবৎ থাকবে এবং হেডম্যান বা কারবারিদের মধ্যে থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা। এসব প্রতিষ্ঠানে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

গ) স্বাধীন ও স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা।

ঘ) সকল আইনে 'মহিলা' শব্দকে 'নারী' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

ঙ) সকল আইনে মেয়র (নগর পিতা/মাতা)/ সভাপ্রধান ও সদস্য/ কাউন্সিলর নাম পরিবর্তন করে এক রকম করা।

৫.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত করা।

খ) সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন সরাসরি নির্বাচনের বদলে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

গ) সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রথম ভাইস-চেয়ারপার্সন হবেন নারী।

৫.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৫.৩.১.৩.১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি বৃদ্ধি করা।

ক) সকল নাগরিকের জন্য অভিযোগ-প্রতিকারে সহজ ব্যবস্থা তৈরি করা, যা নারীরা সহজে অভিগমন করতে পারবেন এবং যার মাধ্যমে সহজে ও দ্রুত প্রতিকার পাওয়া যাবে। এ ব্যবস্থা ডিজিটাল ও সরাসরি উভয় রকমই হতে হবে, যেহেতু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া পছন্দ করেন।

খ) জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন—নারী-সংগঠনগুলো, যারা নারীদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের পক্ষে কথা বলতে পারে।

৫.৩.১.৩.২ নারীর উপর সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ করা এবং তা ঘটলে প্রতিকার করা।

ক) স্থানীয় সরকার কর্তৃক যৌতুক, বাল্যবিবাহ, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী-ধর্ষণ, নারী/শিশু পাচার, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড-নিক্ষেপসহ নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতারোধে নজরদারি নিশ্চিত করা ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীসমূহের সাথে সমন্বয় করা।

খ) নারী-জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা ।

ঘ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ব্যাপক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান[65] এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ করা।

[65] National Institute of Local Government (NILG)

৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৫.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৫.৩.২.১.১ স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন নারীদেরকে বাজেট-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।[66]

খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

গ) কেবল পৌরসভা আইনে আছে যে, প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে ৪০ শতাংশ নারী-সদস্য থাকবে। একইভাবে সকল স্তরে/ সকল পরিষদের/প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটিতে ৪০ শতাংশ নারী-সদস্য সংযুক্তির বিধান করা।

ঘ) পৌরসভা আইনে আছে, ওয়ার্ড সভায় ৪০ শতাংশ নারী হবেন। একইভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন আইনে এ বিধান রাখা।

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা জরুরি, যাতে জনগণ তথা নারীর অংশগ্রহণ বাইরের সহায়তার উপর নির্ভরশীল না হয়, কিংবা কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।

৫.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৫.৩.২.২.১ ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

ক) গ্রাম-আদালতকে সক্ষম করে তোলা, যাতে মধ্যস্থতা ও সালিশ মানবাধিকার মানদণ্ড মেনে চলে।

খ) গ্রাম-আদালত পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য মধ্যস্থতা করে পরিষেবা প্রদান করতে পারে। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উচিত নারীদেরকে গ্রাম-আদালতে ন্যায়বিচার চাইতে উৎসাহিত করা। এ-ছাড়া, অভিযোগ শুনানির প্যানেলে পাঁচজন সদস্যের মধ্যে অন্তত দুজন নারী থাকা উচিত, যার মধ্যে একজন অবশ্যই সে এলাকার নির্বাচিত নারী-প্রতিনিধি হবেন।

৫.৩.২.২.২ নারীবান্ধব স্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ।

ক) প্রত্যেক পৌরসভায় বীরাঙ্গনাদের স্মরণে ও সম্মানে 'বীরাঙ্গনা স্মারক' স্কয়ার/সড়ক বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা। নারী ও শিশুদের জন্য জনপরিসরে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত ও নিশ্চিত করা। বাস টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প ও সড়কগুলো পরিষ্কার, আলোকিত ও সিসিটিভি দ্বারা সুরক্ষিত রাখতে হবে। নারীদের জন্য 'লেডিস পার্ক' পুনঃপ্রবর্তন করা, যেখানে উপযুক্ত টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা থাকবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুসরণ করা যেতে পারে।

খ) পৌরসভা ও স্থানীয় বাজারে নারীদের জন্য পৃথক কর্নার নিশ্চিত করা, যেখানে পর্যাপ্ত আলো ও টয়লেট থাকবে।

৫.৩.২.২.৩ নারীদের জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ক) গ্রামপুলিশ ও কমিউনিটি পুলিশিং-ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, বিশেষ করে নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে।

খ) সকল এলাকার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় নারী-প্রতিনিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় নারী-হেডম্যান, কারবারি নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

---

[66] ADB/LGED বাস্তবায়িত, UGIIP ও CRDP এবং SDC/LGD পরিচালিত Sharique কর্মসূচি এর সফল উদাহরণ।

৫.৩.২.২.৪ সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক) স্থায়ী কমিটিগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করা: নারী ও শিশু, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক কমিটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভা নিয়মিত ও কার্যকর করা, যেখানে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। সকল নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

গ) সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কমিটি/স্থায়ী কমিটিগুলো সক্রিয় করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সদস্য সচিব হিসেবে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা।

ঘ) ভালোভাবে কার্যকর থাকা কমিটিগুলোর জন্য বিশেষ উৎসাহমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটি/স্থায়ী কমিটির পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

চ) সকল নারীপ্রধান স্থায়ী কমিটিকে সক্রিয় করা, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ হারাবে।

ছ) ইউনিয়ন পরিষদ আইনে বলা আছে যে, প্রয়োজনে ওয়ার্ড উপ-কমিটি গঠন করা যাবে। সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ) জনের বেশি হবে না। সদস্যদের মধ্যে অন্যূন ৩ (তিন) জন নারী হবেন। একই ব্যবস্থা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন করা উচিৎ। ওয়ার্ড সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে বলা আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে সাধারণ ঐক্যমত্যের মাধ্যমে এবং উপস্থিত নারীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ওয়ার্ড সভায় নারীর ভূমিকার বিষয় আরও পরিষ্কার করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন: সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা বিষয়।

জ) আদিবাসীদের প্রথাগত ব্যবস্থায়, যেমন হেডম্যান, কার্বারি পদে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া।

৫.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৫.৩.২.৩.১ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক ও ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ।

ক) শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পিতার নাম না পাওয়া গেলে মাতার নাম দিয়ে জন্মনিবন্ধনের ব্যবস্থা নেওয়া এবং জন্মনিবন্ধন সহজ করা।

খ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাকের তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কাজী অফিসের মধ্যে যাচাইয়ের জন্য তথ্য বিনিময়ের (ডিজিটাল এক্সেস) ব্যবস্থা করা, যাতে কম বয়সে বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করা যায়।

গ) ট্রেড লাইসেন্স, কর ইত্যাদির ব্যবস্থা সহজতর করা, অনলাইনে আবেদন ও প্রদানের ব্যবস্থা এবং লিঙ্গভেদে তথ্যসংগ্রহ নিশ্চিত করা।

৫.৩.২.৩.২ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচিতে অভিগম্যতা।

ক) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপকারভোগী হওয়ার যোগ্য নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইউনিয়ন ভিত্তিক একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা। পল্লী ও শহরাঞ্চলে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত, আদিবাসী নারীর জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা ও প্রাপ্তির শর্ত এলাকার জনগণকে জানানো, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সকল সেবাপ্রাপ্তির জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন ও সেবাদান নিশ্চিত করা।

৫.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৫.৩.৩.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

ক) নারী উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের সাথে সংগতি রেখে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পাশাপাশি অর্থ ও জন সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত হবে।

খ) স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হবে।

গ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করা হবে।

৫.৩.৩.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

ক) শিশু দিবাযত্ন আইন ২০২১ এর আলোকে নারী-উদ্যোক্তাদেরকে এলাকাভিত্তিক শিশুদিবাযত্ন-কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা। নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও শিশুদিবাযত্ন সেবার মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নারী ও মেয়েশিশুর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ

নারী নির্যাতন রুখবো সবে, হাত আছে হাতিয়ার হবে

৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

নারীর উপর সহিংসতা একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা। সকল বয়সের, সকল শ্রেণি-পেশার নারীই সর্বদা এ আক্রমণের ঝুঁকি ও আতঙ্কে থাকে। নারীর উপর সহিংসতার সূত্রপাত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দিয়ে। দৈনন্দিন জীবনে নারী প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। ধর্ম, প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ। এ অবস্থাকে আরও জোরদার করেছে বৈষম্যমূলক আইন। ঘরে, বাইরে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, দুর্যোগে-দুর্বিপাকে, এমনকি প্রতিনিয়ত আনন্দানুষ্ঠানেও নারী নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ফলে নারীর অগ্রগতি, বিকাশ ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলায় আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে আইন প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার করার সাথে সাথে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলোর অবসান প্রয়োজন। এ ছাড়াও প্রয়োজন নারী-পুরুষের সম্পর্কের পরিবর্তন, যাতে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো সমতায় রূপান্তর করে সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সংস্কার এবং নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা, চেনা ও সম্মান করার উদ্যোগ।

৬.১.১ বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত ২০২৪ সালের জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে নারীর উপর সহিংসতার প্রকৃতি, মাত্রা ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। জরিপমতে, বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী তাদের জীবদ্দশায় জীবনসঙ্গী বা স্বামী কর্তৃক অন্তত একবার হলেও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৪১ শতাংশ নারীর ক্ষেত্রে (প্রায় ২৬০ লক্ষ নারী) বিগত ১২ মাসে এ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালের জরিপমতে, ৮০ শতাংশ বিবাহিত নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের অনেকেই স্বামী দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।[67] ১৫-১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের ৩৭.৫ শতাংশ এবং প্রায় ৮৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী নারী সহিংসতার শিকার হয়। ইউএন উইমেনের ২০২১ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের ৯৩ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে, তারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন অথবা এমন নারীকে তারা চেনেন, যিনি এর শিকার হয়েছেন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ ২০১১)।

আমাদের সমাজে মেয়েদের জীবনের "সাফল্য" হচ্ছে বিয়ের **মাধ্যমে**। বাল্যবিবাহ নারীর উপর সহিংসতার একটি অন্যতম অনুঘটক। এটি শিশু-অধিকার লঙ্ঘনও বটে। ২০-২৪ বছর বয়সি ৮.২ শতাংশ নারীর তাদের ১৫তম জন্মদিনের আগেই এবং ৪১.৬ শতাংশ নারীর ১৮তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।[68] এ ছাড়া বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, ৫১ শতাংশ মেয়ে ১৮ বছরের আগে বিবাহিত হয়েছে।[69]

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীর অংশগ্রহণ একদিকে যেমন বাড়ছে, তেমনই অনলাইনে নারীদের হয়রানি ও সহিংসতার ঝুঁকিও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘৃণা-বিদ্বেষ, সহিংসতা ও হয়রানির সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউএন উইমেন বাংলাদেশ পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২১.২৫ শতাংশ নারী। বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত একটি সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেছে, ২০২১ সালে সংগঠিত সাইবার অপরাধের ৭০ শতাংশ ভুক্তভোগীই নারী। একশন এইড বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৬৪ জন নারীই জীবনের কোনো না কোনো সময় অনলাইনে হেনস্তার শিকার হয়েছেন; যৌন আক্রমনমূলক মন্তব্যের শিকার হয়েছেন ৮০ ভাগের বেশি নারী। এ ছাড়া অশ্লীল ছবি বা অনৈতিক প্রস্তাবের বার্তা দিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে ৫৩ ভাগের বেশি নারীকে।[70]

৬.১.২ অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন ১৯৯৩ ও গণচীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ পরবর্তীতে নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে করা প্রথম জাতীয় জরিপে[71] প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে এটার বিস্তৃতি ও ভয়াবহতা নিয়ে

---

[67] (https://bangladesh.unfpa.org/en/news/2024-violence-against-women-survey-intimate-partner-violence-remains-widespread-bangladesh)

[68] BBS, 2024. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[69] BDHS, 2022. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[70] হাসান, ২০২৩। সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[71] আইসিডিডিআরবি/নারীপক্ষ/ডব্লিউএইচও ১৯৯৭ পরিচালিত (অপ্রকাশিত)।

প্রথমবারের মতো জনপরিসরে আলোচিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ও নারী-আন্দোলনের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণীত হয়; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯৫, এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০, ইত্যাদি।

বেসরকারি সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা ও সরকারি উদ্যোগে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন-সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, নারী-সংগঠন ও একাধিক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে একটি বহুমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।[72] এ কর্মসূচির আওতায় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল, ডিএনএ ল্যাব, হটলাইন ও ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আওতায় পুলিশ সদর দপ্তরে পাচার-প্রতিরোধ সেল, নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন, হটলাইন এবং প্রত্যেক থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ডেস্ক স্থাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচিতে সহিংসতার শিকার নারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে কয়েকটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের দেওয়া বেশ কিছু নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য। যেমন: কর্মস্থল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা, দুই আঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ, পিতা বা মাতার নামের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে আইনগত অভিভাবকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি: নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে যুগে যুগে নারীর উপর নানাভাবে, নানা কৌশলে শারীরিক ও সামাজিক নির্যাতন চলছে। বাল্যবিয়ের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে সহিংস আচরণের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাছাড়া দাম্পত্য-সম্পর্কে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। নির্যাতনের জন্য ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করা হয়। ধর্ষণের শিকার নারীকেই অপবিত্র **এবং কলংকিত অপবাদ দিয়ে** দোষারোপ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে ধর্ষককে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। নারীকে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র ও যৌন সেবাদাসী হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা ও সংস্কৃতি এখনো বিদ্যমান। ধর্ষণ, যৌতুক বা পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় প্রায়ই সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে আপসের জন্য চাপ দেওয়া হয়, যা অবশেষে অপরাধীদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করে। পারিবারিক সহিংসতাকে একটি ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখার প্রবণতা বিদ্যমান। ফলে সহিংসতার ব্যাপারে অভিযোগ করার এবং অভিযোগের বিষয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

প্রথা ও ধর্ম: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উক্তি, "যখনই কোনো ভগিনী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমত যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

আদিযুগ থেকে সমাজে সংস্কৃতির ধারা অনুসারেই নারীর বঞ্চনার প্রথা চলে আসছে, যেমন: মেয়েরা বাবা-মায়ের কাছে অন্যের (স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির) গচ্ছিত সম্পদ। বিবাহিত নারী স্বামীর পরিবারে যুক্ত হয়। বংশ পরিচয়ের মাধ্যম হয় পিতার সূত্র ধরে।

আমাদের সমাজে মেয়েদের সফল জীবনের অর্থ হচ্ছে বিয়ে; অপরদিকে ছেলেদের সফল জীবন বলতে বুঝায় ভালো শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মসংস্থান। বিয়ের পাত্রী হিসেবে অল্পবয়সি কনে বেশি গ্রহণযোগ্য। প্রথাগত বিশ্বাসে আছে, অল্পবয়সি মেয়ের সাথে যৌনসম্পর্ক সুখের, যা বাল্যবিবাহের গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রচলিত প্রথা।

মুসলিম ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক বৈধ, হিন্দু মতে বিয়ে হলো ধর্মীয় বন্ধন। বিয়ের বাইরে যে-কোনো যৌন সম্পর্ককে পাপ হিসেবে দেখা হয় বলেই যৌন সহিংসতার শিকার নারীকেও অচ্ছুৎ মনে করা হয়। এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রাদি ও বক্তব্যে ১৯৭১ সালে যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণের শিকার নারীর শারীরিক ও মানসিক আঘাতের চেয়ে "ইজ্জতহানির" বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। অথচ যৌন আক্রমন একটি ফৌজদারি অপরাধ, এর সাথে নারীর ইজ্জত ও সম্ভ্রমের কোনো সম্পর্ক নাই।

[72] Multi-sectoral Programme on Violence Against Women (MSPVAW)

বৈষম্যমূলক ব্যক্তিবাচক আইন: ব্যক্তিবাচক বা প্রাতিষ্ঠানিক সকল আইনই বৈষম্যমূলক। নারী-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত আইনের অধীনে, যা ধর্মভিত্তিক ও বৈষম্যমূলক। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে আইনের মাধ্যমে বৈষম্য বিদ্যমান, যেমন: বিয়ে, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি পরিচালিত হয় ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র মনে করে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের দায়িত্ব একমাত্র নারীর, কিন্তু সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না। নারীকে সবসময়ই পরনির্ভরশীল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। মা, স্ত্রী, কন্যা বা বোন সকল পরিচিতিতেই আইন অনুযায়ী পুরুষ ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, যা উত্তরাধিকারে নারীর অসম অধিকারকে যুক্তিযুক্ত করে।

আইন ও আইনের প্রয়োগ

আইন: নারী-নির্যাতন রোধকল্পে আইন একটি উপায় বা মাধ্যম মাত্র। প্রচলিত দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অভিযুক্ত অপরাধীর শাস্তি এবং সকল আইন হচ্ছে বৈরীতামূলক[73] যা প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রণীত। বহুল আলোচিত সালেহা হত্যা, রীমা হত্যা ও ইয়াসমিন হত্যা মামলায় অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু এতে করে স্ত্রী বা নারী-হত্যা ও ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। শুধু শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমন বা নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে কার্যকর সমাধান নয়। উপরন্তু, মৃত্যুদন্ড স্পষ্টত মানবাধিকার লঙ্ঘন।

আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা: বাংলাদেশে নারীর উপর সহিংসতা-রোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, দণ্ডবিধি ১৮৬০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-সহ বেশ কিছু আইন আছে। কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত হলে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব এ অপরাধের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার করা। সরকারি আইনজীবীর অবহেলা ও অসহযোগিতায় অপরাধের শিকার ব্যক্তি মামলা পরিচালনায় ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও তার পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক সক্ষমতার অভাবের কারণে অনেক মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। বিশেষ করে প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধী নারীদের সীমাবদ্ধতাকে আমলে নেওয়া হয় না, যেমন: ভাষা, দারিদ্র্য, অভিগম্যতা ইত্যাদি।

আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট থানা, হাসপাতাল ও আদালত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ নারীবিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে। মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, প্রভাবশালী অপরাধীদের রক্ষা করার প্রবণতা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া, মামলা গ্রহণে গড়িমসি করা কিংবা ভুক্তভোগীকে মামলা করতে নিরুৎসাহিত করা ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত করে। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা ও সচেতনতার অভাবে নারীদের বিরুদ্ধে অনলাইন হেনস্তা, প্রতারণা ও ব্লাকমেইলের মতো অপরাধের ভুক্তভোগীরা সঠিক প্রতিকার পাচ্ছেন না। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অপরাধে ভুক্তভোগী ব্যক্তির চরিত্রগত সাক্ষ্যের প্রচলন বহাল আছে। ধর্ষণ-মামলায় অভিযোগকারী ধর্ষণ-অপরাধে ভুক্তভোগী ব্যক্তির চরিত্রগত সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়নি।

সমন্বয়হীনতা ও দুর্নীতি: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহির অভাব, সামর্থ্য ও কার্যকরভাবে কর্তব্য পালন না করা, অদক্ষতা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব, বিধিব্যবস্থার সকল স্তরে দুর্নীতি, প্রয়োজনের তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য কর্মকর্তার অপ্রতুলতার কারণে বিচার ও তদন্তে বিলম্ব হয়।

সংঘাতপূর্ণ এলাকায় নারীর উপর সহিংসতা: সংঘাতপূর্ণ এলাকায় নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। সামরিক বাহিনীর কোনো সদস্য সহিংসতা করলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় সহিংসতার ঘটনার সব সময় সঠিক বিচার হয় না। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের দ্বারা আন্তঃবিভাগীয় বিচারের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবারকে জানায় না।

[73] Adversarial

৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৬.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৬.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৬.৩.১.১.১ নারীর উপর সহিংসতা-রোধে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা এবং বাল্যবিবাহ ও ধর্ষণ আইন সংস্কার করা।

ক) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও পশ্চাদপদ আইন সমূহ সংস্কার করে নারীর পারিবারিক ও জনপরিসরে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে অভিন্ন পারিবারিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ও নাগরিকত্ব আইনে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা।[74] অভিন্ন পারিবারিক আইন সব সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে।

খ) কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, ধর্ষণ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক সুপারিশ ৩.২.১.৩ এ দেখুন।

৬.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) প্রত্যেক সেবাপ্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ (পরিবহণ-মালিক সমিতি, দোকানমালিক সমিতিসহ) তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকতর সংবেদনশীল আচরণ নিশ্চিত করতে যথাযথ আচরণ-বিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

৬.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৬.৩.১.৩.১ ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস-সেন্টার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করা।

ক) সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেলের সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের সম্পূর্ণ অংশীদারি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রটোকল সহজ বাংলায় তৈরি করা। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বিভাগীয় আদেশ জারি করে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা। রাজস্ব-বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সমর্থিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যাবলির সাথে নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধ কর্মসূচিকে একীভূত করা।

৬.৩.১.৩.২ সহিংসতা-রোধে নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

ক) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা[75] অনুযায়ী দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ও সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, কর্পোরেটসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অভিযোগ কমিটি গঠন ও সক্রিয় করা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

খ) নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা, বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বাজেটে খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা।

৬.৩.১.৩.৩ সহিংসতার শিকার নারীর প্রতি মর্যাদা পূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করা।

ক) পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক, চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবাপ্রদানকারীর জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা।

---

[74] বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০, উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫, হিন্দু উত্তরাধিকার (অক্ষমতা অপসারণ) আইন ১৯২৮, হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন ১৯২৯, খ্রীস্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২ ইত্যাদি

[75] বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য-২০০৯, ১৪ বিএলসি (হাইকোর্ট) ৬৯৪।

খ) রাষ্ট্রীয় দলিল পত্রাদিতে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শব্দচয়নে, লিখনে, বলনে, ভাষণে নারীর প্রতি তথা যে-কোনো ব্যক্তির প্রতি মর্যাদাহানিকর ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা। বিশেষত ধর্ষিতা না বলে ধর্ষণের শিকার এবং নির্যাতিতা না বলে নির্যাতনের শিকার বলা।[76]

গ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর প্রয়োগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৬.৩.১.৩.৪ সহিংসতা সংক্রান্ত সেবায় অভিগম্যতা সহজ করা।

ক) অভিযোগপ্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে সকল আদালত ও থানায় নারী, শিশু, বয়স্কসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য হেল্প ডেস্ক চালু ও সক্রিয় করা (পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন করা) ।

খ) সকল আদালত ও আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়ের জন্য ইশারা-ভাষা, অনুবাদক ও দোভাষীর তালিকা করা, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত হয়।

৬.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৬.৩.১.৪.১ সহিংসতা-সম্পর্কে তথ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ক) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য নারীর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত প্রদত্ত উচ্চ আদালতের নির্দেশনা সুনির্দিষ্ট করে সহজে বোধগম্য ও বাস্তবায়নযোগ্য করা। যেমন: দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক রায়।[77]

খ) নারীর উপর সহিংসতার তথ্য-উপাত্তের স্বচ্ছতা ও বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক অন্তত চার বছর পরপর জরিপ পরিচালনা করা।

৬.৩.১.৪.২ পরিষেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ক) দেশব্যাপী সমন্বিত একটি বিনা খরচে (টোল ফ্রি) কার্যকর হটলাইন স্থাপন, যা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সকল ধরনের নারীর উপর সহিংসতার ঘটনায় দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে এ হটলাইন পরিচালনায় যুক্ত কর্মীদের নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে মৌলিক দক্ষতা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তারা নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান করতে পারে।

খ) পুলিশ, আইনজীবী, বিচারকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবাপ্রদানকারীদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। সকল পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণগুলোর পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। সশস্ত্র বাহিনী, বার এসোসিয়েশন, বার কাউন্সিলের সদস্যদেরও এ জাতীয় প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা।

৬.৩.১.৪.৩ শিক্ষা-পাঠ্যক্রম সংস্কারের মাধ্যমে সম্মতি বিষয় ধারণা, যৌন নির্যাতন ও হয়রানি কী এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হয়রানি থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

ক) জেন্ডার, নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধ এবং প্রচলিত নেতিবাচক সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তন করার জন্য যৌন সম্পর্কে সম্মতি ও পছন্দের ধারণাসহ নারীর উপর সহিংসতা-সম্পর্কিত তথ্য মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন পাঠ্যসূচি প্রণয়ণ করা।

গ) প্রযুক্তি দ্বারা সহিংসতা-প্রতিরোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে প্রযুক্তি-বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করা।

---

[76] **'ধর্ষিতা' বা 'নির্যাতিতা' নয় ধর্ষণের শিকার বা নির্যাতনের শিকার সঠিক শব্দ চয়ন** কারণ 'ধর্ষিতা' বা 'নির্যাতিতা' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে ধর্ষণ অপরাধের ভুক্তভোগী তাঁকে পরিচিত করা হয় এই অপরাধ দিয়ে। চুরির অপরাধে যেমন যে চুরি করে তাকেই চোর বলা হয়, যার কিছু চুরি হয় তাঁকে কোনো বিশেষ নাম দেয়া হয় না। তাই ধর্ষণ যে করে তাকে ধর্ষক বা ধর্ষণকারী বলা যেতে পারে, কিন্তু যার উপর এই অপরাধ সংগঠিত হয় তাঁকে আলাদা কোনো বিশেষণে বিশেষায়িত করার কোনো যুক্তি নাই। ধর্ষণ কোনো নারীর নিজের আচরণ বা দূর্বলতা নয়, বরং এটি তার উপর সংঘটিত একটি ফৌজদারী অপরাধ। ধর্ষণের শিকার নারীকে এই বিশেষণ জীবনব্যাপী বহন করতে হয়, তাই ধর্ষিতা বা নির্যাতিতা সম্বোধন করে তাঁকে চিরতরে এই ঘৃণ্য অপরাধের সাথে যুক্ত করা মোটেও ন্যায় সংগত না। তেমনি ধর্ষণের কারণ হিসেবে ধর্ষণের শিকার নারীকে দোষারোপ করাটাও অন্যায়। (লড়াইটা ভাষারও-পোস্টার উন্মোচন উপলক্ষ্যে নারীপক্ষ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন, ৫ ডিসেম্বর ২০২০)

[77] WRIT PETITION No. 10663 of 2013, Judgment on 12.04.2018, ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ (২০২৪) ২৯ বিএলসি ২৫৬

৬.৩.১.৪.৪ মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ক) নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

খ) যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ নারীর লজ্জার বিষয় না, বরং নির্যাতনকারী ও ধর্ষকের লজ্জা, তাই নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার নারীকে দোষারোপ করার রীতির অবসানকল্পে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৬.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩ ও ২০২০), পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ (সংশোধন ২০২২) ইত্যাদি প্রচলিত আইনসমূহে নারীর সর্বোচ্চ স্বার্থ ও সম-অধিকার বিবেচনায় এবং বৈষম্য নিরসনে সংশোধন ও পরিমার্জন করা।

খ) বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধন করা।

গ) গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনায় নারীবিদ্বেষী প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা।

৬.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৬.৩.২.২.১ ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজ ও দ্রুততর করা।

ক) সেবাপ্রদানকারীর সংবেদনশীলতা, সহিংসতার শিকার ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করে মামলায় দ্রুত তদন্ত ও রায় নিশ্চিত করা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কার্যকর মোবাইল কোর্টের বিধান চালু করা।

খ) আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, গৃহকর্মী, অভিবাসী, তৈরি পোষাক কর্মী, চা-বাগান শ্রমিক, দলিত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু নারী ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে দোভাষী ও ইশারা-ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা রাখা, যাতে প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়।

৬.৩.২.২.২ সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীর জন্য সহায়তা-পরিষেবা সহজতর করা।

ক) আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থানা, হাসপাতাল ও আদালত ইত্যাদিকে নারীবান্ধব করতে ইতোমধ্যে প্রণীত প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[78]

খ) প্রতিটি জেলায় আক্রান্ত নারী সহায়তা কেন্দ্র (ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার), নারী-সহায়তা ও তদন্ত বিভাগ, কাউন্সেলিং, সাইবার অপরাধে ভুক্তভোগী সহায়তা ও সকল ভুক্তভোগীর জন্য পুনর্বাসনব্যবস্থা চালু করা।

গ) রাষ্ট্র পরিচালিত ক্ষতিপূরণ-তহবিল গঠন করা যা দিয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তি নিজের ও সন্তানের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে সহিংসতা প্রমাণ-সাপেক্ষে ভুক্তভোগীকে আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা এবং পরবর্তীতে অপরাধ প্রমাণ-সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনায় সরকারি ভর্তুকি প্রদান এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিবান্ধব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

---

[78] নারীপক্ষ বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (রীট মামলা নং ৫৫৪১/২০১৫) Judgment on 18.02.2016.

ঙ) মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষাদি, যেমন: জীবিত মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের আঘাত ও যৌন নির্যাতনের ফরেনসিক পরীক্ষা পদ্ধতিগুলো যুগোপযোগী করা। উপজেলা থেকে জাতীয় স্তরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত মেডিকোলিগ্যাল জনবল তৈরি ও পদায়ন করা। যে সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে ফরেনসিক বিভাগ রয়েছে, সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ প্রয়োজন।

চ) অনলাইনে সহিংসতা ও নারীর উপর সংঘটিত সাইবার আপরাধ মোকাবিলায় সকল বাহিনীর সাইবার-ক্রাইম ইউনিট ও বিভাগগুলোকে একীভূত করে সমন্বিত সাইবার-ক্রাইম ইউনিট গঠন করা।

৬.৩.২.২.৩ সংঘাতশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা।

ক) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের অবহেলা ও অপমান অবসানে তাঁদের প্রতি সম্মানসূচক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন পাঠ্যক্রমে তাঁদের জীবন সংগ্রাম তুলে ধরা; এলাকাভিত্তিক বীরাঙ্গনা চত্বর ও স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ বা সড়ক নামাকরণ করা।

খ) সংঘাতশ্লিষ্ট এলাকা (পাহাড়ি এলাকা, শরনার্থী শিবির) ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিত করা। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সংবেদনশীল করতে পদক্ষেপ নেওয়া এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

গ) সংঘাতশ্লিষ্ট এলাকায় নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর (সামরিক-আধা সামরিক, পুলিশ) কোনো সদস্য-কর্তৃক সংঘটিত সহিংসতায় দেশের প্রচলিত আইনে ফৌজদারি আদালতে মামলা করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া-সম্পর্কে অবশ্যই ভুক্তভোগী ও পরিবারের সদস্যদের অবহিত করা।

৬.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

ক) নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্যোগের তথ্য একত্রিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা। অর্জন ও ফলাফল হালনাগাদ করে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

খ) সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও প্রচারমাধ্যমের সমন্বিত উদ্যোগে নারী-অধিকার সংরক্ষণে আইনের ভূমিকা ও সেবাগ্রহণের সুযোগ-বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া; জনপরিসরে, গণপরিবহণে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হটলাইন নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য দেশব্যাপী নিয়মিত প্রচার করা।

৬.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৬.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) অপরাধদমনে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধবোধ তৈরি এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে আইন ও শাস্তির বিধান সংশোধন করা। আইন তৈরিতে প্রতিশোধপরায়ণ নীতি পরিহার করে আইন নিবর্তনমূলক, সংশোধনমূলক ও পুনরায় একত্রীকরণ নীতির আলোকে সংশোধন করা।

৬.৩.৩.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

ক) সকলে নারীকে মানুষ হিসেবে চিনবে, জানবে ও সম্মান করবে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা।

৬.৩.৩.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

ক) সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সূচক ও সময়ভিত্তিক অর্জন ও ফলাফল পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা।

খ) সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।

সপ্তম অধ্যায়: জনপরিসরে নারীর ভূমিকা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে)

রাজপথে নারীর সাড়া, জাগরণের নতুন ধারা

৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সনদের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যদূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে, পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে, সেগুলো হচ্ছে:

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

(খ) সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ, সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন।"

সংসদে নারীর অংশ: বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও অতীতের বৈষম্য দূর করতে নারী-রাজনীতিবিদদের জন্য বিশেষ অস্থায়ী ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পরপরই প্রাথমিকভাবে সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। যা ২০১০ সালে ৫০টিতে উন্নীত হয়। এ ৫০টি সংরক্ষিত আসনসহ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মোট ৩৫০টি আসন রয়েছে।

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ আসনে খুব কম সংখ্যক নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক দলে নারী: গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আর পি ও), ২০০৮-এ বেশ কিছু সংশোধনী নেওয়া হয়েছিল, যা রাজনীতিতে নারীদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এ সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (দুটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী ২ বছর সময়কালে) বেশ কিছু সংস্কার শুরু করেছিল, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১) অনুচ্ছেদ ৯০ (খ) অনুসারে নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতন্ত্রে নিম্নরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে, যথা—

- ৯০ (খ) (অ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা;
- ৯০ (খ) (আ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্য-পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকা এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করা।

তবে আরপিওতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক বিধান না মানলে কোনো দণ্ড বা জরিমানার ব্যবস্থা না থাকায় এ বিধান মানা হয় না।

স্থানীয় সরকারে নারী: জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু আইনি বিধান ও নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী, প্রথমে মনোনীত ও তারপরে সংরক্ষিত উপজেলা সদস্য ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর ফলে অনেক বেশি সংখ্যক নারী নির্বাচিত করা সম্ভব হয়েছে, যা এ বিধান ছাড়া সম্ভব হতো না। এ ছাড়া এর ফলে পুরুষদের সাথে ভোটের জন্য প্রতিযোগিতা ব্যতীত নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণের মান ও প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে; রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি নারীদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তাদের নিজস্ব অধিকারে ক্রমশ স্বাধীনভাবে সামনে এগিয়ে আসছে।[79] সমাজকর্ম, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক পরিচিতি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পারিবারিক ঐতিহ্য—এ সকল ক্ষেত্রে নারীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়েই স্থানীয় সরকার কাঠামোতে প্রবেশ করছে।[80] এ ছাড়া নির্বাচিত পদে নারীরা নিজেদের দাবি ও প্রভাব প্রকাশ করতে পারছে, এটির স্বীকৃতিও ক্রমবর্ধমান।[81] বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের নারী-প্রতিনিধিরা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাধা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছেন।[82]

---

[79] Hossain and Akhter, 2011.
[80] Nazneen et al., 2014.
[81] Pandey, 2013; Khan & Mohsin, 2008; Nazneen et al., 2014.
[82] Sultan et al., 2016; Pandey & Feldman, 2015; Nazneen & Tasneem, 2010.

৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে পারেন না। এ ছাড়া রাজনীতির একটি মূল বিষয় নির্বাচন, যেখানে নির্বাচনী সহিংসতা, অনিয়ম, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোট-কারচুপি ও প্রতিযোগিতার সমান সুযোগের অভাব আছে। নারী-রাজনীতিবিদরা প্রায়শই শারীরিক সহিংসতা ও মানসিক নির্যাতনের হুমকির সম্মুখীন হন, বিশেষত অনলাইনে হয়রানির শিকার হন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা বিদ্যমান রীতি অনুসারে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে পারেন না। পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতির কারণে রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই দলের প্রতি বিশ্বস্ততাকে মেধার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়, নারীদের কম সম্পৃক্ত করে, ফলে দুর্নীতি ও প্রতিনিধিত্বের অভাবের কারণে নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহ হারিয়ে যায়।

সংসদে নারী: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন অনেকটাই ‘অলংকার’ ও জাতির ‘অহংকার’; এমন দুটি ধারণা, যা নারী সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও সংসদে তাদের অবদানকে প্রতিফলিত করে।[83] অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত আসনে নারীদের সংসদে অংশগ্রহণ একটি সাজানো অংশগ্রহণ হিসেবে দেখা হয় অথচ প্রত্যাশা করা হয় যে, সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ শুধু নারীর অধিকার, হিস্‌সা ও প্রাপ্তি বিষয়ে কথা বলবেন।

সংসদের সংরক্ষিত আসনে নারীদের আনুপাতিক নির্বাচনের যে ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তা নারীদের অধিকার-দাবিকে উৎসাহিত করে না। এসব সদস্যের নিজস্ব কোনো নির্বাচনী এলাকা নেই, ফলে তাঁরা দলগুলোর প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। দেখা যায় যে, তাঁরা নারীর স্বার্থরক্ষার চেয়ে মূলত নিজ দলের অন্ধ সমর্থক হিসেবে কাজ করেন।

নারী-সংসদ সদস্যগণ সাধারণত তিন রকমের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি থেকে আসেন: রাজনৈতিক দলের নেতার সাথে জন্মগত বা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত, একজন মৃত সংসদ সদস্যদের স্ত্রী/কন্যা অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে দীর্ঘ সময় যুক্ত থেকে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন।[84]

রাজনৈতিক দলে নারী: এ ছাড়া রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব, স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক রাজনীতি নতুন নেতৃত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, যা নারীদের ক্ষেত্রে প্রকট। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নারী-শাখাগুলো মূল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না।

স্থানীয় সরকার: প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীরা দায়িত্ব পালনকালে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন করবেন এবং পরবর্তীতে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবেন। তবে প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতির কারণে, যা নারীদের—এমনকি যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরও অবমূল্যায়ন করায় এটি বাস্তবে ঘটেনি।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:—অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব; পারিবারিক বাধা, যেমন: নারীর গৃহস্থালি কাজ ও পরিবারের প্রত্যাশা; সামাজিক বাধা, যেমন: নারীর চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত, তার কাছে প্রত্যাশিত সামাজিক ভূমিকা; অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার মতো উপার্জন বা সম্পত্তি নারীদের নেই বা কম রয়েছে।

সম্প্রতি যেসব বিষয় নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকারকাঠামোতে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ।

প্রচলিত বৈষম্য: সকল স্তর ও সকল পর্যায়ে নারী-রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা দেখা যায়। তাদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে সমালোচনাসহ তাদের চরিত্র নিয়ে নোংরা মন্তব্য প্রচার করা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করে। রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারলেও তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে রেহাই নেই। সাংস্কৃতিকভাবেও নারীরা পুরুষের থেকে ভিন্নভাবে নেতৃত্ব চর্চা করেন।

শুধু সংখ্যায় অংশগ্রহণ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না। তারা সেইভাবে তাদের প্রভাব খাটাতে পারেননি বা উল্লেখযোগ্য নারীবান্ধব উদ্যোগ নিতে পারেননি। যদিও সংসদে ও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল, তবে তারা সত্যিকার অর্থে নারীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি, কারণ তারা নারী-ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না এবং নারী-সমাজের কাছে জবাবদিহির কোনো প্রক্রিয়া বা কাঠামো ছিল না।

---

[83] Ahmed, 2017.

[84] Chowdhury, 2002.

ফুটনোট ৭৯-৮৪ পর্যন্ত সকল তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৭.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৭.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৭.৩.১.১.১ সংসদে সমানসংখ্যক নারী-প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসা।

(ক) **সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি:** নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংসদের (নিম্নকক্ষ) আসন-সংখ্যা ১০০ বাড়িয়ে মোট সংখ্যা ৪০০ করার বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংরক্ষিত নারী-আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-তে বা ২৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নারীদের জন্য নির্ধারিত ১০০ আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিধান হবে।

নারী কমিশনের এ ব্যাপারে বিকল্প প্রস্তাব: মোট জনসংখ্যা বিবেচনায় সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬০০-তে বৃদ্ধি করা, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য একটি সরাসরি নির্বাচিত সংরক্ষিত আসন থাকবে (উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ার পদে এটি ইতিমধ্যেই প্রচলিত)।[85]

(খ) **জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ নির্বাচন:** নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১০০ আসন-বিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করার প্রস্তাব রেখেছে। এ উচ্চকক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ৫০শতাংশ আসন বণ্টন করা হবে। নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

নারী কমিশনের এ ব্যাপারে সম্পুরক প্রস্তাব: আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে প্রার্থী মনোনয়ন দেবে, তা পুরুষ-নারী পর্যায়ক্রমে জিপার (zipper) পদ্ধতিতে দেওয়া হবে। এতে করে প্রত্যেক দল থেকে সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষ মনোনীত হবে।

(গ) জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে নারী কমিশনের সম্পূরক প্রস্তাব হলো নারী-সংগঠনের প্রতিনিধিদের জন্য কমপক্ষে ৫টি আসন বরাদ্দ করা।

৭.৩.১.১.২ ভোটারদের রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর বিষয়ে মতামত দেওয়া এবং অনাস্থা-প্রকাশের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(ঘ) জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতি অনাস্থা-প্রকাশে ব্যালটে 'না' ভোটের বিধান যুক্ত করা। যার জন্য ব্যালটে নির্দিষ্ট ছক বরাদ্দ করা। এ সুপারিশ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও করেছেন।

৭.৩.১.১.৩ রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা।

(ঙ) গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে-কোনো রাষ্ট্রীয় পদে জনপ্রতিনিধি হিসেবে (উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদ) কেউ পরপর দুই মেয়াদের বেশি থাকতে না পারার বিধান রাখা। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ প্রধান পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ থাকতে পারবে না।

(চ) রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ৩৩শতাংশ পদে নারীদের রাখার যে বিধান আরপিও-তে রয়েছে, তা পালিত হচ্ছে কি না, পরিবীক্ষণ করা এবং নিশ্চিত করা। এটি নিশ্চিত না হলে সে দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।

(ছ) রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা (২ বছরের বেশি কেউ কোনো প্রধান পদে না থাকা, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কমিটিতে সদস্য নির্বাচন, আরপিও-র নিয়ম মেনে চলা) । দলের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন করার যোগ্যতা হিসেবে এটিকে নির্বাচন কমিশন বিবেচনা করবে।

---

[85] নারীদেরকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের জন্য তাদের যোগ্যতা তৈরি করতে হবে। সমান সুযোগ পাওয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে অন্য নারীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হতে হবে। অতএব, প্রতিটি সংসদীয় আসনে দুটি আসন থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে—একটি সাধারণ প্রার্থীর জন্য, যিনি নারী বা পুরুষ হতে পারেন; অন্য আসনটি কেবল নারী-প্রার্থীদের জন্য। সাধারণ সংসদ সদস্য ও নারী সংসদ সদস্য উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব একই হবে। যেহেতু তাদের কার্যাবলি আইনসভাসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাই স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কোনো দ্বন্দ্ব বা মিল থাকার ঝুঁকি থাকবে না।

৭.৩.১.১.৪ স্থানীয় সরকার-পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

(জ) স্থানীয় সরকার নির্বাচন (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর ও সিটি কর্পোরেশন-পর্যায়ে) নির্দলীয় ভিত্তিতে হতে হবে, যাতে তা জাতীয় নির্বাচনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এটি আরও বৃহত্তর পরিসরে নারীদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম করবে।

(ঝ) ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে জন্য একটি সমন্বিত ও একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন, যা এ সংস্থাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে। এ সমস্ত সংস্থায় নারী-নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের বেশ কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: শহরস্তরের সমন্বয়-কমিটি[86] যেখানে নারী ও দরিদ্র নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা রয়েছে। স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এমন বিধান রাখা। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেটে নারীর অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যমান বিধানগুলো স্থানীয় সরকার-সংস্থার সর্বস্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

৭.৩.১.১.৫ পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা করা।

(ঞ) পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা স্থানীয় সরকার-কাঠামোর সাথে একীভূত করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

(ট) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী নারীদের জন্য পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে স্থানীয় আদিবাসী নারী-প্রতিনিধিদের সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যথাযথভাবে উল্লেখ করা।

(ঠ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদে নারীদের আসন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

(ড) সংসদে সংরক্ষিত নারী-আসন বহাল রাখা এবং তন্মধ্যে পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা।

(ঢ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে নারী-কারবারি অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৭.৩.১.২.১ রাজনীতিতে নারীদের সামাজিক ও দুর্নীতি বিষয়ক বাধার ক্ষেত্রে নীতি-প্রণয়ন করা।

(ক) নারীর প্রতি 'অসম্মানজনক উক্তি, বৈষম্যমূলক আচরণ' ও 'যৌন হয়রানি ও হেনস্তা'-রোধে রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি তৈরি করতে হবে এবং এটার লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে। একইভাবে সংসদের জন্যও এ ধরনের আচরণবিধি তৈরি করতে হবে।

(খ) যেহেতু রাজনীতিতে দুর্নীতি নারীর অংশগ্রহণে একটি বড়ো বাধা, তাই দলীয় কার্যক্রমে ও নির্বাচনে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নীতি জোরদার করতে হবে।

৭.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৭.৩.১.৩.১ রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

(ক) এক নেতা দলীয় কোনো পদে দুবারের বেশি থাকতে পারবে না এই মর্মে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ[87] এ বাধ্যবাধকতা আরোপের মাধ্যমে দলে নেতৃত্বের বিকাশ নিশ্চিত করার পথ তৈরি করা।

(খ) নারীর অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর বিধান বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রবিধান অনুসরণ না করার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এ শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন: এ বিধান অনুসরণ না হলে দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না; অথবা দলকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে আর্থিক জরিমানা দিতে হবে।

[86] Town Level Coordination Committee (TLCC)

[87] The Representation of the People Order (RPO)

৭.৩.১.৩.২ স্থানীয় সরকার-কাঠামো শক্তিশালী করা।

(গ) একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন, যা সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে গঠিত হবে। এটি জাতীয় সরকার ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীনভাবে কাজ করবে। তাতে নারীর স্বার্থ আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করা সহজ হবে।

(ঘ) নির্বাচিত সকল স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, যা চেয়ারপার্সনকে সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করবে এবং সদস্য ও চেয়ারপার্সনের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দূর করবে। এতে নির্বাচিত নারী ও পুরুষ সদস্যরা তাঁদের দায়-দায়িত্ব আরও ভালোভাবে পালন করতে পারবেন এবং ভোটারদের কাছে বেশি দায়বদ্ধ হবেন। নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দক্ষতা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

৭.৩.১.৩.৩ স্থানীয় সরকার-পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

(ঙ) বর্তমান আইনে ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন ও একটি সংরক্ষিত নারী-আসন থাকবে। এ ব্যবস্থা আগামী তিনটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রযোজ্য হবে। স্থানীয় সরকার কমিশনের একটি প্রস্তাব হচ্ছে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো, সে ক্ষেত্রে নারী-আসন সংখ্যা সাধারণ আসন সংখ্যার সমান হবে।[88]

(চ) অন্যান্য স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠানেও পরপর তিনটি নির্বাচন এ পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ পদ নারী-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(ছ) স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে উপজেলার মতো দুজন সহ-সভাপ্রধানের বিধান থাকবে।

(জ) বর্তমান বিধান চালু থাকলে স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের জন্য নারী-কমিশনার/সদস্যদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৭.৩.১.৩.৪ স্থানীয় সরকার-সংস্থা ও কমিটিগুলোতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

(ঞ) পৌরসভা-শহর/ইউনিয়ন/সিটি কর্পোরেশন স্তরের সমন্বয়-কমিটি এবং ওয়ার্ড স্তরের সমন্বয়-কমিটির জন্য আইনে এক-তৃতীয়াংশ নারী এবং এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তির বিধান একীভূত করা।

(ট) ওয়ার্ড ও ইউপি-পৌরসভা-সিটি কর্পোরেশন সকল পর্যায়ে বাজেট-প্রণয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ; অংশগ্রহণকারীদের এক-তৃতীয়াংশ নারী থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৭.৩.১.৪.১ সংসদে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

(ক) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনয়নসংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচনে প্রার্থিতা, জয় ইত্যাদি সব তথ্য লিঙ্গ-বিভাজিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করবে।

(খ) সংসদ নির্বাচনে নারী-প্রার্থীদেরকে সক্ষমতা-উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তার[89] মাধ্যমে সহায়তা করবে যথাক্রমে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন, যা নির্বাচন সংস্কার কমিশনও সুপারিশ করেছেন।[90]

---

[88] স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হলো: এক-তৃতীয়াংশ পদ ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। তবে এতে এলাকার নারী বা পুরুষের নেতৃত্ব তৈরি কঠিন হবে

[89] See example of Emily’s List used by the Democratic Party in the US.

[90] নির্বাচন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন নির্বাচনে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কমিশন নারী-প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি চালু করা। এ ছাড়াও, নারী-ভোটারদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নারী-প্রার্থীদের ও ভোটারদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে সহায়ক হবে।

(গ) অনগ্রসর, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য এবং পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকারের ব্যাপারে প্রচারণা চালানোয় সহায়তা দেওয়া।

(ঘ) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী-ভোটার ও প্রার্থীর প্রতি হুমকি ও সহিংসতার হুমকি প্রতিরোধ করা এবং এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। রাষ্ট্র-কর্তৃক সকল রাজনৈতিক প্রার্থী, বিশেষ করে নারী-প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যা নির্বাচন সংস্কার কমিশনও সুপারিশ করেছে।[91]

৭.৩.১.৪.২ স্থানীয় সরকারে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

(ঙ) জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের আগে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন আয়োজন করা, যাতে স্থানীয় নির্বাচনে জাতীয় ফলাফলের কোনো প্রভাব না পড়ে। যেমন করে তা পুরুষ-প্রার্থীদের প্রভাবিত করবে, নারী-প্রার্থীদের তা আরও বেশি প্রভাবিত করবে।

(চ) স্থানীয় সরকারে নারী-ভোটার ও প্রার্থীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। রাষ্ট্র-কর্তৃক সকল রাজনৈতিক প্রার্থী, বিশেষ করে নারী-প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যা নির্বাচন সংস্কার কমিশনও সুপারিশ করেছে।[92]

(ছ) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী-প্রার্থীদের সক্ষমতা-উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সহায়তা করবে যথাক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ক জাতীয় ইন্সটিটিউট ও নির্বাচন কমিশন।

(জ) দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী ভোটারদের জন্য এবং যে সকল নারী ভোট দেওয়ার জন্য সহিংসতার হুমকিতে থাকে, তাদের জন্য ডাক-মাধ্যমে ভোটপ্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৭.৩.২.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৭.৩.২.১.১ নারী-সংসদ সদস্যদের স্বর/প্রতিনিধিত্বকে ও নির্বাচনী এলাকা নারী/-সমাজের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করা।

(ক) নারীর উন্নয়ন ও অধিকারের প্রশ্নে আন্তঃদলীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে একটি সর্বদলীয় নারী-সংসদ সদস্যদের নেটওয়ার্ক বা মোর্চা প্রতিষ্ঠা করা। নেপালে এটির উদাহরণ আছে।

(খ) সংসদ-কর্তৃক সংসদে নারীর স্বরকে/প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করা, নির্বাচিত নারী-প্রতিনিধিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং নারী-সংসদ সদস্যদের নারী-সমাজের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি ফোরাম তৈরি করা, যেখানে নারী-সংসদ সদস্য ও নারী-অধিকার সংগঠন, বিভিন্ন নারী-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময়ের ব্যবস্থা হবে।

৭.৩.২.১.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও চর্চা।

(গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অরাজনৈতিক ছাত্র সংসদ উৎসাহিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, যাতে নেতৃত্বের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চর্চা করা হয়।

---

[91] নির্বাচন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: কমিশন নির্বাচন চলাকালীন ও নির্বাচনী প্রচারণার সময় নারীদের নিরাপত্তা জোরদার করার সুপারিশ করেছে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

[92] নির্বাচন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: কমিশন নির্বাচন চলাকালীন ও নির্বাচনী প্রচারণার সময় নারীদের নিরাপত্তা জোরদার করার সুপারিশ করেছে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৭.৩.২.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

(ক) রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যমকে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করবে নির্বাচন কমিশন। নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজ ও নারী-সংগঠনসমূহের সাথে নিয়মিত সংলাপ আয়োজন করা এবং যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(খ) অধিক সংখ্যক নারীকে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন-কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ প্রদান করা।

(গ) বৈষম্যমূলক আচরণ ও যৌন হেনস্তা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশন একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী সেল স্থাপন করবে, তা পরিবীক্ষণ করবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে।

(ঘ) নারীদের (ও পুরষদের) ওয়ার্ড-সভা ও বাজেট-সভাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন-বাজেটের মধ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্ধ রাখা।

৭.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

ক) স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নারীরা নির্ভয়ে ও বৈষম্যহীনভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নারীর স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় হবে।

অষ্টম অধ্যায়: জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ

সকল বাঁধা ভাঙবো, সম অধিকার আনবো

৮.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রশাসনিক বিষয়, যা নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত দশকগুলোয় বিশ্বব্যাপী জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তবে এখনো তা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতিনির্ধারণী পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের অংশগ্রহণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীরা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্বপালন করছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তাবাহিনীতেও অবদান রাখছেন, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অংশগ্রহণ প্রশাসন থেকে আইন প্রণয়ন, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন, আইনপ্রয়োগ, উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কূটনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত; যেমন—তাঁরা সচিব, রাষ্ট্রদূত, উপাচার্য , জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ-কর্মকর্তা, ইত্যাদি পদে আসীন হয়েছেন। দেশে সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো চাকরিক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়োগকর্তা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও সমমর্যাদার ৮৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ছিলেন ১০ জন[93] এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনে গ্রেড ১ স্তরে ৫৮৫ জনের মধ্যে ৭৫ জন নারী কর্মরত ছিলেন[94]। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে কর্মকর্তা পর্যায়ে (১ম- ৯ম গ্রেড মোট ৪২৭৮ জনের মধ্যে ৯১২ জন) প্রায় ২১ শতাংশ নারী ছিলেন।

বিগত কয়েক দশকে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের সাথে জনপ্রশাসনে যোগদানের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য কোটা-প্রস্তাবনা চালু হয়েছিল, যা ২০১৮ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (কর্মকর্তা পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং কর্মচারী পর্যায়ে ১৫ শতাংশ)। দেশে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে এ সরকারি নীতিমালা কার্যকর করায় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ে। প্রশাসনে বর্তমানে সচিব/সিনিয়র পদে মোট কর্মকর্তা ৭৭ জন, যার মধ্যে ১৩ জন রয়েছেন নারী।[95] এছাড়া, মোট ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসক পদে নারী ১৮ জন। দেশের নিম্ন আদালতে মোট ২১৭৯ জন বিচারকের মধ্যে ৬২৫ নারী-বিচারক এবং উচ্চ আদালতে প্রায় ১০০ বিচারপতির মধ্যে বর্তমানে ১০ জন নারী-বিচারপতি রয়েছেন।[96]

৮.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও এখনো তা পুরুষদের তুলনায় কম, বিশেষত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নেতৃত্ব পর্যায়ে। ২০২৩ সালে মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগীয় ও জেলাপ্রশাসন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪,৪৩,৫১৮ জন কর্মীর মধ্যে ৪,০৯,০৬৮ (২৮ শতাংশ) জন নারী। বিভাগীয় বা জেলা-কার্যালয়ে ১০-১২ গ্রেডের পদে নারীদের অংশগ্রহণ ২০২৩ সালে ছিল মাত্র ৭.৬৭ শতাংশ। একইভাবে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে ১৭-২০ গ্রেডের পদে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৬ শতাংশ-এর নিচে। মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে ১৩-১৬ গ্রেডের পদে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৩.৩৮ শতাংশ এবং ১৭-২০ গ্রেডের পদে মাত্র ১২.৭ শতাংশ। অথচ এসব পদে সাধারণত উচ্চ বা প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও করপোরেশনগুলোর ক্ষেত্রে এ গ্রেডগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ আরও কম ছিল। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগকৃত ও অন্যান্য পদগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ সব কার্যালয়ে কম দেখা গেছে, শুধু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছাড়া। অনেক সময়ই এর কারণ নারীদের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া। একই কারণে বেসরকারি খাতের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণও কম। নীতিগত প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতির পরেও, জেন্ডারভিত্তিক বাধা, বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া, ক্যারিয়ার বাছাই ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

---

[93] Rana, 2025.

[94] MoPA, 2023.

[95] See footnote 94.

[96] ডালিম, ২০২৫.

সামাজিক রীতি ও ধ্যান-ধারণা: প্রাথমিকভাবে নারীদের গার্হস্থ্য ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করতে হয়, যা তাদের কর্মজীবনে অংশ গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে। কর্মজীবনে স্বাস্থ্যসেবিকা, চিকিৎসক ও শিক্ষক প্রভৃতি সেবামুলক কাজ নারীরা ভালো পারবেন বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই এসব ক্ষেত্রে নারীরা নিজেরা বেশি যান এবং তাদের যেতে উৎসাহিত করা হয়। যার ফলে এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা প্রায় পুরুষের সমান। কিন্তু কারিগরি, নির্মাণ, প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পুরুষেরা বেশি দক্ষ—এ ধারণার ফলে সেখানে নারীর অংশগ্রহণ কম। এমনকি কর্মক্ষেত্রে বেশির ভাগ নেতৃত্ব, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক কাজকে পুরুষদের জন্য উপযুক্ত ধরে নিয়ে নারীদেরকে সে সব পদে প্রায়শঃই বিবেচনা করা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম হলেও তা এখনো কম।

সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে সীমিত প্রতিনিধিত্ব: নীতি নির্ধারণী কমিটিগুলোতে নারীদের উপস্থিতি সীমিত, কারণ জনপ্রশাসনে দেরিতে আসায় নারীরা পদমর্যাদা ও জ্যেষ্ঠতায় পিছিয়ে আছেন। এ ছাড়া নারী-নেতৃত্বকে অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, ফলে তাদের কার্যকারিতা ও কর্তৃত্ব বাধাগ্রস্ত হয়।

কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও বৈষম্য: কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় নারীরা মৌখিক বা যৌন হয়রানির সম্মুখীন হন। হয়রানি প্রতিরোধে বিদ্যমান নীতিমালা ও ব্যবস্থার অভাব এবং সচেতনতার ঘাটতি থাকায় অনেক নারী অভিযোগ করতে ভয় পান। "বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮"-এ সরকারি কর্মচারীদের চাকরি, আচরণ, শৃঙ্খলা ও অন্যান্য সেবা-সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তবে, এ আইনে নারীর অধিকার, নারীপুরুষ সমতা বা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট বিধান নেই; যদিও "সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯" কর্মচারীদের নৈতিক আচরণ সম্পর্কে ও নারী-সহকর্মীদের প্রতি আচরণের নির্দেশনা প্রদান করে, কিন্তু যৌন হয়রানি প্রতিরোধের বিষয়ে এতে সরাসরি উল্লেখ নেই।

জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা ও অবকাঠামোর অভাব: অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাব রয়েছে, যেমন: নমনীয় কর্মঘণ্টা, পিতৃত্বকালীন ছুটি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ। বেশির ভাগ অফিসে নারীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র বা মাতৃদুগ্ধপান করানোর জায়গা না থাকায় নারীরা অফিস ও পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা করতে হিমশিম খান। এসব কারণে তারা অনেক সময় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, এতে নারীদের পেশাগত উন্নয়নেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিরাপদ পরিবহণ ও আবাসন সুবিধার অভাবে অনেক নারী দূরবর্তী স্থানে কর্মস্থলে যেতে আগ্রহী হন না।

পদায়নে বৈষম্য: অনেক ক্ষেত্রে নারীরা দায়িত্বশীল বা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদের কাজ সামলাতে পারবেন না ধরে নিয়ে সে সব পদে তাদের পদায়ন করা হয় না। ফলে পুরুষ-সহকর্মীদের তুলনায় তাদের পেশাগত অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। চাকরিতে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পাওয়ার জন্য নারীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়। প্রমাণ করতে হয় যে, তারা পুরুষদের সমান দক্ষ।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা: পুরুষ-প্রধান অফিস সংস্কৃতির কারণে নারীরা নেটওয়ার্কিংয়ে পিছিয়ে পড়েন, নারীরা মতামত প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেন এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হন। অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় নারীপুরুষ সমতা তদারকির জন্য বিশেষ ইউনিট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। কোনো শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নারীর অগ্রগতি শ্লথ হয়ে পড়ে।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অভাব: মাঠপর্যায়ে কাজ করা চাকরিজীবী নারীরা অনেক সময় নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে থাকেন, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রকৌশল ও প্রশাসনিক কাজে। যেমন—সড়ক ও জনপথ বিভাগে কর্মরত একজন নারী-কর্মকর্তা কাজ-তদারকির সময় স্থানীয় গুন্ডা বা ডাকাতদলের সম্মুখীন হতে পারেন, যা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি; আবার ঠিকাদাররা টেন্ডার পাওয়া নিয়ে অনেক ধরনের আক্রমণাত্মক আচরণ করে থাকে, যা সামলাতে গিয়ে উপজেলা বা জেলার প্রকৌশল কর্মকর্তা নারী হলে ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারেন।

আউটসোর্সিংয়ে নারীর জন্য ব্যবস্থা না থাকা: সরকারি পদের নিম্নস্তরে—বিশেষ করে ফিক্সড বা আউটসোর্সিং পদগুলোতে—৫,১০৩টি পদের মধ্যে নারী-কর্মীদের সংখ্যা মাত্র ৮১৪ জন (প্রায় ১৬ শতাংশ)। অথচ প্রায়শই এসব কাজে উচ্চ অথবা বিশেষায়িত শিক্ষার প্রয়োজন কম। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোর অধিকাংশ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এ আউটসোর্সিং নীতিমালায় নারীর নিয়োগের জন্য কোন ইতিবাচক নির্দেশনা না-থাকায় নারীর নিয়োগ কম হয়েছে।

৮.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৮.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

বাংলাদেশে জেন্ডার-সংবেদনশীল জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য আইনি, নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মসূচিভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো:

৮.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) সরকারি, বেসরকারি ও সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ২ সপ্তাহ পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

৮.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৮.৩.১.২.১ বিধিমালা সংশোধন

ক) **'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯' এবং 'শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা ২০১৮' পর্যালোচনা ও সংশোধন** :২০০৯ সালে উচ্চ আদালতের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গ্রহণযোগ্য আচরণ ও জবাবদিহির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) সংশোধিত সরকারি কর্মচারী আচরণবিধিতে নারী-সহকর্মীদের প্রতি পেশাদার ও সম্মানজনক আচরণের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা, যাতে কোনো আচরণ হয়রানি, নির্যাতন বা নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে, তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অনুরূপভাবে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮'-তে, **যেন** ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকার ব্যবস্থা ও অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করা হয় এবং সম্ভাব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে এবং এখানে দণ্ডের ভিত্তির ক্ষেত্রে কর্মস্থলে যৌন হয়রানি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ) বেসরকারি খাত ও কর্পোরেট সকল প্রতিষ্ঠানে ছয়মাস প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি চালুর জন্য অধ্যাদেশ জারি করা।

৮.৩.১.২.২ আউটসোর্স নীতিমালা পর্যালোচনা ও নারী-কর্মী নিয়োগের জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া।

ক) অর্থ মন্ত্রণালয়-প্রণীত আউটসোর্স বিষয়ক নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন করা, যাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।[97] যদিও এ নিয়োগগুলো সেবাচুক্তির আওতায়, তবুও এতে প্রদেয় সেবার ধরন উল্লেখ করার পাশাপাশি, যেসব কর্মীর ক্ষেত্রে মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে, কী মানবসম্পদ লাগবে এবং তাতে নারীর জন্য কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ব্যবস্থা, কর্মপরিবেশ, মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণের প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.৩.১.২.৩ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি মোকাবিলা করা।

ক) মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানকে একটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং নারী-কর্মকর্তাকে প্রধান করে অভিযোগ কমিটি গঠন ও কার্যকর করার নির্দেশনা দান করা।

---

[97] নীতিমালাটি এই বছর পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে বলে অর্থ বিভাগের সাথে বৈঠকে জানা যায়।

৮.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৮.৩.১.৩.১ জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন তদারকি ব্যবস্থা।

ক) জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন তদারকির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

খ) জনপ্রশাসনে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, সরকারি ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল পর্যায়ে কর্মীদের পুরুষ নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ,ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি তদারকি ও পর্যবেক্ষণ সেল স্থাপন করা।

গ) কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৮.৩.১.৪.১ নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি,স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থলে উপযুক্ত সুবিধা; যেমন–কাজের স্থান, টয়লেট, আবাসন, শিশু-দিবাযত্ন ব্যাবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, পরিবহণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলকে নির্দেশ দেওয়া।

৮.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৮.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) ‘বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’, সরকারি কর্মচারী ছুটি ও অন্যান্য আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে এবং ২০০৯ সালের হাইকোর্টের **নির্দেশ ও** আন্তর্জাতিক নীতিমালার **আলোকে** নারী-পুরুষ সমতা, বৈষম্য নিরসনযৌন , হয়রানি প্রতিরোধ, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারা পরিবর্তন বা অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।

খ) জনপ্রশাসনের সকল আইন ও নীতি সংস্কারের সময় বিদ্যমান জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারীপুরুষ সমতার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

গ) বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন: মৃত সন্তান প্রসব, সন্তানের মৃত্যু অথবা দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে সন্তান হলে, নারীদের জন্য দুইবার মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান শিথিল করার (৪ বার পর্যন্ত) ব্যবস্থা রাখা। এ ছাড়া সন্তান দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান রাখা।

৮.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ[98] গ্রহণ করা। সরকারি ও বেসরকারি সকল বোর্ড ও কমিশনে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন ও জারি করা।

খ) বিসিএস সহ সকল সরকারি চাকরিতে নারী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতিতে নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

[98] Affirmative Action Policy

৮.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৮.৩.২.৩.১ জনপ্রশাসনে নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধি করা।

ক) সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, সরকারি ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রেড অনুসারে সকল পর্যায়ে কর্মীদের পুরুষ-নারী বিভাজনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা। যেখানে নারীদের উপস্থিতি কম, সেখানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।

খ) অগ্রাধিকারভিত্তিতে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহে শূন্যস্থানসমূহ পূরণ করা ও এ-ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা। আগে ঘটে যাওয়া বৈষম্যঅসমতা/ সংশোধন করে নারীর অগ্রগতির জন্য অস্থায়ী সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় কেবল নারীদের নিয়োগ দেওয়া।

গ) নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত সকল তথ্যের লিঙ্গ-বিভাজিত বিন্যাসকরণ; অন্তত ০৩ বছরের তুলনামূলক বিবরণীসহ নিয়মিত তথ্য প্রকাশ বহাল রাখা এবং ওয়েবসাইটে ও বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা।

ঘ) **যেসব খাত/প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নয়, সেখানে বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া।**

ঙ) সচিব, জেলাপ্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রভৃতি সকল উচ্চপর্যায়ে প্রশাসন, মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য অধিক হারে নারী-কর্মকর্তার পদায়ন করা।

৮.৩.২.৩.২ জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনসংক্রান্ত নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন তদারকি ব্যবস্থা করা।

ক) সরকারি চাকরিতে নারীদের টিকে থাকা নিশ্চিত করা। কোভিড ১৯-এর অভিজ্ঞতার আলোকে বাড়ি থেকে কাজ ও নমনীয় কর্মসময় সুবিধা চাকুরি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) সরকারি নীতিমালা অনুসারে স্বামী ও স্ত্রীর কাছাকাছি জায়গায় পদায়নের বিদ্যমান নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গ) মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যৌন হয়রানি-রোধে অভিযোগ কমিটির কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা করা।

৮.৩.২.৩.৩ জনপ্রশাসনের সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

ক) সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং ল্যাটারেল এন্ট্রির বিধান রাখা। চাকরির বিধানাবলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) জনপ্রশাসনের উচ্চপর্যায় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কমিটিগুলোতে অন্তত ৩০শতাংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৮.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৮.৩.২.৪.১ জনপ্রশাসনে কর্মক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রকাশ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি করা।

ক) কর্মক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহী করার জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

খ) চাকরির বিজ্ঞাপনে “নারীদেরকে আবেদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে” বাক্যটি যুক্ত করা।

গ) কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত সকল নারীর কাজের অনুকূল পরিবেশ, যথা: শিশু-দিবাযত্ন ব্যবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, আলাদা টয়লেট, আবাসিক ব্যবস্থা ও নিরাপদ পরিবহণ-সুবিধার বাস্তবায়ন তদারকি করা।

৮.৩.২.৪.২ নারী-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব বিকাশ।

ক) সকল সরকারি প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন (প্রযুক্তি ব্যবহার, শিখন পদ্ধতি) করা এবং অন্তত প্রতি ০৩ বছরে সকলের একবার ঝালাই পাঠ করা।

খ) নতুন নিয়োজিত সকল কর্মীর জন্য বিভিন্ন শাখায় কাজ করার সুযোগ মেন্টরশিপ ,কর্মসূচি চালু করা, যাতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিতে পারেন।

গ) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে পেশাগত আচরণ ও উপস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) নারীদের জন্য নেতৃত্ব-প্রশিক্ষণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক ভূমিকার জন্য প্রবেশ, মধ্য ও সিনিয়র পর্যায়ের নারীদের জন্য বিশেষায়িত নেতৃত্ব-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঙ) নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম (interagency network): বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের নারী-কর্মকর্তাদের জন্য এমন একটি ফোরাম তৈরি করা, যেখানে তারা অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন এবং নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক নীতির পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারেন। প্রত্যেক বিভাগ ও সংস্থায় বা পেশার নারীদের জন্য নেটওয়ার্ক করতে উৎসাহ দেওয়া, যাতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষা লাভ করা যায়।

৮.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

ক) জনপ্রশাসনে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ হবে সমান, দক্ষ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

নবম অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি

শিক্ষায় মুক্তি, শিক্ষাই নারীর শক্তি

৯.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বৈষম্যমূলক প্রথা ও কাঠামোগত বাধাগুলো মোকাবিলায় এবং সামাজিক মর্যাদা ও নারী-পুরুষ সমতা-প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা নারীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সম্ভব করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে গতানুগতিক ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষায় ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জাতিগত পরিচয়, ভৌগলিক অবস্থান ও শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বিগত সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন-নীতিমালা গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ফলে নারী শিক্ষায় অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে স্কুলসমূহে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার নারী ৯৭.৮১ শতাংশ ও পুরুষ ৯৭.৫২ শতাংশ এবং শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১৩.১৯ শতাংশ ও ১৪.৮৮ শতাংশ।[99] এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ নারী-শিক্ষক নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে নারীদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী-শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী-শিক্ষার্থীদের হার ৫০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডারসমতা অর্জন করেছে। মাধ্যমিকে ভর্তির হার নারী ৮৬.২৭ শতাংশ ও পুরুষ ৬৫.১৯ শতাংশ। এ ছাড়া 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২' অনুযায়ী নারী ও পুরুষের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৩.০ শতাংশ ও ৭৮.২ শতাংশ।[100] এ ছাড়া, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে নারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ও বিভাগীয় সদরে ৮টি নারী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ এ উন্নীত করার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

নারীশিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনো সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ হয়নি এবং বিভিন্ন প্রান্তিক নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ সহজ ও সুলভ হয়নি। *গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট* (২০২৩) অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে স্নাতক ডিগ্রিধারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[101] উচ্চ শিক্ষায় নারী-শিক্ষার্থী ভর্তির হার ১৬.৫১ শতাংশ ও পুরুষ-শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২৪.৭৮ শতাংশ।[102] অপরদিকে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ৭৯.৪ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে নারী রয়েছে মাত্র ২০.৬ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে নারীদের পাশের হার ভালো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী-শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম।[103] এছাড়া 'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২' অনুযায়ী মাধ্যমিকে ৩৩.২৫ শতাংশ পুরুষ-শিক্ষার্থী ঝরে-পড়া হারের বিপরীতে নারী-শিক্ষার্থী ঝরে-পড়ার হার ৪০.৭৮ শতাংশ।[104] একই প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার পুরুষ ২০.১ শতাংশ ও নারী ১৭.২ শতাংশ। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি ও মাধ্যমিকে ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারী।

বিভিন্ন নীতিমালা ও উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষায় নারীদের এ পিছিয়ে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের কারণে শিক্ষা থেকে মেয়েশিশুর ঝরে পড়ার হার সব থেকে বেশি, তবে বাল্যবিবাহ একক কোনো কারণ নয়। এর সাথে সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নেই। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর নিরাপত্তার অভাব রয়েছে এবং নারীর উপর যৌন হয়রানি ও যৌন

[99] BANBEIS, 2023.
[100] ibid.
[101] World Economic Forum, 2023.
[102] BANBEIS, 2023
[103] Siddiqa & Braga, 2019.
[104] BANBEIS, 2023.
ফুটনোট ১০৩-১০৮ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

সহিংসতা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে অনেক মা-বাবা মেয়েশিশুদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। যদিও বা এটি কোনোভাবেই নারী ও মেয়েশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। এ ছাড়া, পড়াশোনা শেষে কর্মক্ষেত্রের সুযোগের অভাব ও সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র-সম্পর্কে ধারণা না থাকায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার পেছনে মা-বাবা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস এলাকার নিকটস্থ পর্যাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় অনেকেই মেয়েশিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হয় না এবং সমাধান হিসেবে বিয়ে দিয়ে দেয়।

রাস্তা-ঘাট ও জনসমাগমস্থলে নারী ও মেয়েশিশুদের চলাফেরার নিরাপত্তার অভাব একটি গুরুতর সমস্যা। জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের (২০১৯) একটি গবেষণা অনুযায়ী, ৯৮ শতাংশ নারী ও মেয়েশিশু জনপরিসরে যৌন হেনস্তা ও উত্যক্তকরণের শিকার হয়েছে। আবার ইউএনডিপি-র ২০২২-এর একটি অনলাইন জরিপে পাওয়া গিয়েছে, ৮৭ শতাংশ নারী জনপরিসরে যৌন হেনস্তা ও উত্যক্তকরণের শিকার হয় এবং এর মাঝে ৩৬ শতাংশ গণপরিবহনে নিয়মিত যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার ছেলে ও পুরুষেরা রাস্তায় আড্ডা দেয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া আসার পথে নারী ও কন্যাশিশুদের উত্যক্ত ও হেনস্তা করে থাকে, যা শিক্ষা থেকে নারীদের ঝরে পড়তে ভূমিকা পালন করে।

দারিদ্র্য ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় নারীর শিক্ষার পেছনে পরিবারের অর্থ ব্যয় করার অনিচ্ছা ঝরে পড়ার আরেকটি কারণ। ধরে নেওয়া হয়, নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ নেই এবং সে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ব্যয় বহন করতে সক্ষম নয়। আবার মেয়েসন্তান উপার্জন করে পরিবারের খরচ বহন করবে—এটা প্রত্যাশিত নয়; ধরে নেওয়া হয়, এ দায়িত্ব পুত্র সন্তানদের।

শিক্ষায় সুযোগ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান সেভাবে উন্নত হয়নি। বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ করে তুলতে পারছে না। পাশাপাশি শ্রমবাজারের চাহিদা, উপার্জন ও উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও জ্ঞান তৈরি করতে পারছে না।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলসংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষায় নারীদের উৎসাহিত করা হয় না। ধরে নেওয়া হয়, নারীরা এসব বিষয় পারবে না। আবার এ বিষয়ক বিদ্যমান শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ কম এবং যেসব নারী আছে, তাদের উদাহরণ সামনে নিয়ে আসা হয় না। এ ছাড়াও বিজ্ঞানশিক্ষা থেকে কী ধরনের উপার্জনক্ষম কাজে নারী যুক্ত হতে পারবে, সে সম্পর্কেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা হয় না।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান ওয়াশব্লকগুলো ব্যবহার যোগ্য নয় । পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নারী ও শিশুদের জন্য ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো একেবারে অপ্রতুল। আবার যাদের বসবাসের এলাকার কাছাকাছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, তাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

নারী-শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং তাদের নিরাপত্তা—যথা: যৌন হেনস্তা, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রক্ষা—এ সকল বিষয়ের উপর বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে নারীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষার আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ উপবৃত্তি দেওয়া হয়, তা দিয়ে এ খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাবৃত্তি ও অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ ও সমাপন এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও পরিবেশ ও অবকাঠামো নারীবান্ধব নয়। আবার কারিগরি ও মাদ্রাসা-শিক্ষায় নারী-শিক্ষকের সংখ্যা কম। কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে নারী-শিক্ষক কম থাকায় নারীদেরকে এসব বিষয়ে পড়াশোনা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়।

পার্বত্য এলাকার **আদিবাসি শিশু** ও চা-বাগানের শ্রমিকদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই। ফলে বিদ্যালয়ের শুরুতেই তারা একটি প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে যায় এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। **৫টি** নৃগোষ্ঠীর **ভাষায় পাঠ্যবই থাকলেও বেশির ভাগ জায়গায় পড়ানোর জন্য কোনো শিক্ষক নেই**। আবার বিভিন্ন **আদিবাসি**/নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য-সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা ও ধারণা না থাকায় তারা মূলধারার বিদ্যালয়ে যুক্ত হয়ে খাপ খাওয়াতে পারে না। বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ভৌগলিকভাবে দুর্গম এলাকা (যেমন—হাওর, চর, বন্যাপ্রবণ), পার্বত্য এলাকা ও চা-বাগানের নারীদের চলাফেরার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহণব্যবস্থা নেই এবং এসব এলাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই।

মানসম্মত ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় উক্ত এলাকা থেকে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের[105] শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়ায় কৃতকার্য হয় না। দেশের শহরাঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অথচ পাহাড়ি বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে কিছু দিন পরেই তাঁরা বদলি নিয়ে চলে যান অথবা নিয়োগপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন না। ফলে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট থেকেই যায়। নারীর কর্মক্ষেত্রে শিশু-দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান খুবই জরুরি।

৯.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৯.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৯.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৯.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৯.৩.১.২.১ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমসংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

ক) শ্রমবাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং জীবনমুখী আধুনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাব্যবস্থার মান আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন।

খ) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের ‘কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২’ বাস্তবায়ন করা।

গ) কোভিড-১৯ ও নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে যারা বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে, বিশেষ বিবেচনায় তাদের উপবৃত্তি বহাল রাখা এবং যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। ঝরে পড়া শ্রমজীবী শিশুদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’ বাস্তবায়নকল্পে ‘জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০’-তে বর্ণিত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নতি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৯.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৯.৩.১.৩.১ পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ও পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর জন্য নিরাপদ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তি।

ক) সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা ও লিঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শিক্ষা-পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা।

খ) মুক্তিযুদ্ধসহ দেশ ও সমাজ গঠনে নারীদের অবদান, স্বীকৃতি এবং নারীদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বীরাঙ্গানাসহ বিভিন্ন মহিয়সী নারীর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যনিরসন ও সমতাপ্রতিষ্ঠার বিষয়সমূহ ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন।

[105] Non-Government Teachers Registration and Certification Authority (NTRCA)

গ) শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইন ও সাইবার নিরাপত্তা, অনলাইন ও সাইবার পরিসরে সহিংসতা, অনলাইন মাধ্যম ও প্রযুক্তির দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, বিভিন্ন অপ্রচলিত পেশায় (যেমন—প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, ক্রীড়া ইত্যাদি) নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান, নারী নেতৃত্বের গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশসুরক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) সামাজিক সহনশীলতা এবং সকলের অধিকারের প্রতি সম্মান তৈরির জন্য আদিবাসি ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলো ইতিবাচকভাবে শেখানো নিশ্চিত করা।

ঙ) বয়সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বিত যৌন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা। সমন্বিত যৌন শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি ও জরায়ু ক্যান্সার ইত্যাদি বিষয় মেয়ে ও ছেলে-শিক্ষার্থী, উভয়ের সাথেই আলাদা করে আলোচনা করা। যৌন শিক্ষার বিষয়ে মেয়ে-শিক্ষার্থীদের নারী-শিক্ষক এবং ছেলে-শিক্ষার্থীদের পুরুষ-শিক্ষক কর্তৃক পাঠদানের ব্যবস্থা করা। এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাছাইকৃত কমপক্ষে ৪ জন শিক্ষককে যৌন শিক্ষা প্রদান-সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, পুরুষ ও নারী শিক্ষকদের আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষক-অভিভাবক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা।

চ) শিক্ষা-পাঠ্যক্রম সংস্কারের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন ও হয়রানি কী এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হয়রানি থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া (৬.৩.১.৪.৩ তে বিস্তারিত দেখুন)।

৯.৩.১.৩.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-কাঠামোতে নারী-পুরুষের সমতা।

ক) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলো দলীয় রাজনীতিমুক্ত করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে জনসম্পৃক্ততা, বিশেষ করে ৫০শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ) স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা; কমিশনের সদস্য হিসেবে নারী-শিক্ষাবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ও নারী-সংগঠক অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি, বেসরকারি, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৯.৩.১.৩.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তা।

ক) কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং অভিযোগ প্রতিকার-প্রক্রিয়া চালু রাখা। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে গঠিত অভিযোগ কমিটিকে কার্যকর করা।

খ) মেয়েশিশুর বিদ্যালয়ে এবং আসা-যাওয়ার পথে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা এবং এ জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার, এলাকাবাসীদের দায়িত্ব দেওয়া; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করা।

গ) ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ সেল / কমিটি গঠন করা।

৯.৩.১.৩.৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নারীবান্ধব করা।

ক) শিক্ষার্থীদের মাসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরি এবং মাসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পানিসহ পরিষ্কার শৌচাগার ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের চাহিদা পূরণ করা। এ সংক্রান্ত মানদণ্ড অনুসরণ করে যেখানে প্রয়োজন ও আবশ্যক, সে সকল প্রতিষ্ঠানের ফ্যাসিলিটিজ কক্ষ ও ওয়াশব্লক উন্নত করা।

খ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী করা।

৯.৩.১.৩.৫ নারী-শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে বিশেষ পদক্ষেপ।

ক) জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে পরিবীক্ষণ বা তদারকি জোরদার করা।

খ) কিশোরী-শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা কার্যক্রম (নাচ, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, গার্ল গাইডস, রেঞ্জার, স্কাউট ইত্যাদি) চালু রাখা ও আত্মরক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ রাখা।

গ) নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য অপ্রচলিত, উপার্জনক্ষম, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত ও কর্মসংস্থানযোগ্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এ সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা।

ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি, শিখন, কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদের এবং বালিকা বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৯.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৯.৩.১.৪.১ আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।

ক) বৃত্তি ও উপবৃত্তি-কার্যক্রম চালু রাখা ও জীবনযাপনের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী অর্থবছর থেকে উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

খ) আর্থিকভাবে দুর্বল নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির জন্য আর্থিক সহায়তা করা এবং এ জন্য প্রশাসনিক দপ্তরে অর্থ বরাদ্দ রাখা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এ বিষয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকদের তথ্য দান অপরিহার্য করা। প্রান্তিক ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে পৃথক ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা।

গ) দারিদ্র্যপীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার দেওয়া কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।

৯.৩.১.৪.২ দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও জীবনমুখী শিক্ষা জোরদারকরণ।

ক) প্রাথমিকের পর ঝরে পড়া নারীদের কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের প্রযুক্তিগত কাজে যুক্ত করা; পাশাপাশি ভাসমান মেয়েশিশু ও কর্মজীবী মেয়েশিশু, যাদের শিক্ষায় ছেদ পড়েছে, তাদের চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষায় প্রবেশের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রাখা, নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য অপ্রচলিত, উপার্জনক্ষম, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত ও কর্মসংস্থানযোগ্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এ সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা।

গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আওতায় কর্মজীবীদের শিল্পের চাহিদা ও আধুনিকায়নে শ্রমবাজারে যে প্রভাব পড়ছে ও শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছে, তা মোকাবিলা করতে আপ স্কিলিং কাজ-সম্পর্কে ধারণা দেয়া ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) নারী-গৃহশ্রমিকদের জন্য বয়স ও কর্ম-উপযোগী যথাযথ শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হবে।

ঙ) পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি (আরপিএল[106]) পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ ও কর্মীবান্ধব করা।

চ) অভিবাসন-পূর্ব সময় থেকেই প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি এর ব্যাপক প্রচারণা চালানো।

ছ) অন্যান্য দেশের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে এবং পাশাপাশি দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনায় রেখে পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি এর শিক্ষা সূচি তৈরি করা।

জ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-পরিকল্পনায় শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখা।

৯.৩.১.৪.৩ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচি।

ক) বাল্যবিয়ের কারণে ঝরে পড়া কিশোরী-শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিবার ও সমাজ (ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ক্ষমতাশীল, তরুণ অধিকারকর্মী ও উদ্যোক্তা) কর্তৃক সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এ কার্যক্রমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ, নারীপাচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, সড়ক-নিরাপত্তা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ ধরনের জনসচেতনতা কার্যক্রমগুলোকে শক্তিশালী করা।

৯.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৯.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) ‘শিক্ষা আইন ২০২০’-এর খসড়া চূড়ান্ত ও অনুমোদন করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

৯.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৯.৩.২.২.১ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে গুরুত্ব দেওয়া।

ক) মানসিক স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা এবং ক্রমান্বয়ে একটি প্রফেশনাল কাউন্সেলর পদ তৈরি করা ও নিয়োগ দেওয়া।

খ) শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে মাসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করে স্কুল হেলথ ক্লিনিক কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

৯.৩.২.২.২ প্রান্তিক নারী ও মেয়েশিশুদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ।

ক) দুর্যোগকালে, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূরবর্তী ও ডিজিটাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য যথাযথ ও পর্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ডিজিটাল কাঠামো তৈরি ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।

খ) পাহাড় ও সমতলের দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদে যাতায়াতের জন্য নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা—যেমন: নৌকা, নৌযান ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা, চিকিৎসাব্যবস্থা রাখা। দুর্যোগকালে প্রয়োজনে সরকারিভাবে আবাসনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের আবাসন সুবিধা ও জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান।

[106] Recognition of prior learning (RPL)

ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ভৌগলিকভাবে দুর্গম এলাকা (যেমন—হাওর, চর, বন্যাপ্রবণ), পার্বত্য এলাকা এবং চা-বাগানের নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া প্রতিরোধে এ সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। উদাহরণ: মনোঘর আবাসিক স্কুল, রাঙামাটি।

ঙ) শিক্ষাদান ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করা। এ ক্ষেত্রে মনোঘর বিদ্যালয়[107] ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবা-উদ্যোগকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.৩.২.২.৩ শিক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

ক) শিক্ষাব্যবস্থায় নারী-পুরুষের একিভূত শিক্ষায়[108] অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। তৃতীয় শ্রেণি থেকেই পাঠ্যপুস্তকে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদাসম্পন্ন করে উপস্থাপন করা।

খ) বিভিন্ন ভাষাভাষী—যেমন: পার্বত্য এলাকা ও চা-বাগান এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি; সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী প্রথমে অনুমোদিত ভাষায় এবং পর্যায়ক্রমে সকল ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা এবং উক্ত ভাষাসমূহে পাঠদান নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) **জাতীয় পর্যায়ের জরিপে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সকল শিশুদের বিস্তারিত তথ্য পেতে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।**

ঘ) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য, বিশেষত নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বিশেষায়িত কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।

৯.৩.২.২.৪ প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়ন।

ক) পার্বত্য এলাকা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী-শিক্ষকের নিয়োগ প্রদান। শিক্ষকনিয়োগে দুর্নীতি ও প্রান্তিক অঞ্চল থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শহর-এলাকায় বদলি রোধে আইনের বাস্তবায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা; নিয়োগ ও কোনো এলাকায় পোস্টিং-পরবর্তী বদলির জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, যথাযথ আবাসন-সুবিধা প্রদান করা।

৯.৩.২.২.৫ বিজ্ঞান শিক্ষায় নারী-শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা ও উচ্চ শিক্ষায় নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ক) উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও উৎসাহিত করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতসংক্রান্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় নারীদের জন্য আর্থিক বরাদ্দ, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে ধারণা ও বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিনিময় কর্মসূচি (এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম) চালু করা।

খ) আর্থিকভাবে দুর্বল নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষায় খন্ডকালীন কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরি করা, যা তাকে পরবর্তীতে শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ করে তুলবে।

গ) বিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিশু-দিবাযত্নের ব্যবস্থা করা।

---

[107] এসব প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির পূর্বে নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পড়াশোনার কাজে সহায়তা করা

[108] Co-Education

৯.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

ক) উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নারীর যথাযথ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, যথাযথ বরাদ্দ ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

খ) শ্রমবাজারের চাহিদা, বর্তমান অবস্থা ও শ্রমশক্তি প্রক্ষেপণ বিষয়ে গবেষণা করা এবং প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান সম্পর্কে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা। যেহেতু আমাদের দেশে অনেক শিক্ষার্থীই দ্রুত কর্মসংস্থানে প্রবেশ করে, তাই ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের প্রচলন করা।

গ) যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম, সেখানে শিক্ষা চলমান রাখতে স্কুল ও কলেজে ‘মাল্টিগ্রেড’ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।[109]

৯.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৯.৩.৩.১ প্রতিষ্ঠান- সংক্রান্ত

ক) সকল বিষয়ে এ যাবৎ কালের সফল কর্মসূচি ও উদ্যোগের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

৯.৩.৩.২ কর্মসূচি- সংক্রান্ত

ক) নারী পুরুষ নির্বিশেষে গুণগত শিক্ষায় সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে।

খ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ শিক্ষায় ক্রমান্বয়ে একীভূতকরণ।

[109] ‘মাল্টিগ্রেড’ শিখনপদ্ধতিতে একজন শিক্ষককে একটি সময়সূচির মধ্যে একাধিক পাঠ্যক্রমের গ্রেড জুড়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের দায়িত্ব নিতে হয়।

দশম অধ্যায়: সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্বাস্থ্য

শরীর আমার, সিদ্ধান্ত আমার

১০.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

একজন মানুষের সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য তার জীবনচক্রজুড়ে বিবেচ্য হলেও নারীস্বাস্থ্য- সাধারণত তার যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। নারী নিজ ঘর থেকে শুরু করে এলাকা, গোষ্ঠী, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি তার প্রতি আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য-প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়।[110]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত যৌন সহিংসতা নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে গভীর প্রভাব ফেলে, যা সংঘাত-জনিত যৌন সহিংসতার পর নারীর জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে।[111] এরপর সরকার ও এনজিওগুলো প্রজনন স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয়। বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের কায়রো সম্মেলনে [112]যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়, যেখানে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করে।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বহু চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এ উন্নয়নকে অনেক গবেষক 'উন্নয়ন-প্যারাডক্স' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[113] ১৯৭৫ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের কিছু লিঙ্গ-বিভাজিত অগ্রগতি নিচে উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ১: ১৯৭৫ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য

সূচক	পুরুষ		নারী	
	১৯৭৫	বর্তমান	১৯৭৫	বর্তমান
মৃত্যুহার	২৬৪/১০০০ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	১৪৭/১০০০ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ	৩০৮/১০০০ প্রাপ্তবয়স্ক নারী	১২১/১০০০ প্রাপ্তবয়স্ক নারী
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	৫১ বছর	৭২ বছর	৪৯ বছর	৭৬ বছর
নবজাতক মৃত্যুহার	১৬০/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে	২৬/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে	১৩৮/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে	২৩/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে

শুধ নারীদের পরিসংখ্যান		
	১৯৭৫	বর্তমান
প্রসূতি মৃত্যুহার	৬২০/১০০,০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে [114]	১৯৬/১০০,০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে
মোট জন্মশীলতার হার[115]	৬.৩	১.৯৫
জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার	৮ শতাংশ	৬২ শতাংশ

সূত্রঃ World Bank 2022[116] and BBS 2024[117]

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য-কর্মসূচি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জাতীয় কর্মসূচিতে যথাযথ পদক্ষেপ-গ্রহণের ফলে সহস্রাব্দের উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা (২০০০-২০১৫)-তে উল্লেখজনক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলো টেকসই উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রার কাঠামোর মধ্যে একীভূত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, লিঙ্গ, বসবাসের স্থান নির্বিশেষে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ৮০ শতাংশ-এ অর্জনের বিষয়ে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[118]

---

110 Heise et al., 2019.
111 Conflict-Related Sexual Violence (CRSV).
112 International Conference on Population and Development (ICPD)
113 Chowdhury et al., 2013.
114 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDP (MMEIG)
115 Bangladesh Maternal Mortality Survey 2016.
116 World Bank Open Data.
117 Bangladesh Sample Vital Statistics 2022.
ফুটনোট ১১৪, ১১৭-১২১ পর্যন্ত সকল তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
118 Adams et al., 2018; Boerma, et al., 2014; Rahman et al., 2018.

১০.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে অনেক আইন, নীতি ও কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তথাপি গৃহীত পদক্ষেপে বয়স ও ইস্যুভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা রয়ে গিয়েছে।

নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে অন্যান্য কৌশলের মধ্যে সমন্বিত করে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৯৯৪-এর অঙ্গীকারগুলো অনেকটাই বিস্মৃত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)ও ICPD কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় নেই।

২০২১ সালের জাতীয় ঋতুকালীন স্বাস্থ্য কৌশল থাকলেও বাস্তবায়ন হয়নি। সমাজে প্রচলিত প্রথা, কুসংস্কার ও মাসিক-সম্পর্কে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা। সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্যের অভাব, সচেতনতার ঘাটতি, পানি এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবও সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ২০১৭-২০৩০-এ কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, তাদের পুষ্টি, তাদের উপর সহিংসতা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিলেও কার্যকর বাস্তবায়ন নেই। কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিজ শরীর, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা তাদের জন্য সহজলভ্য নয়। অবিবাহিত তরুণতরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের বিষয়টি সমাজে নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত যা তাদের যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য এবং এ সম্পর্কিত সেবা প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করে।

মেয়েদের বিয়ের বয়স আইনত ১৮ বছর হলেও বাংলাদেশে এখনো ৫১শতাংশ মেয়ের বিয়ে তার আগেই হয়।[119] ফলে কৈশোরকালীন, অনাকাঙ্ক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ হয়। মোট গর্ভধারণের ৪৮শতাংশ অনাকাঙ্ক্ষিত।[120], মাসিক নিয়মিতকরণ-সেবা অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অনিরাপদ গর্ভপাতের শিকার হয়ে অনেক নারী স্বাস্থ্য ও মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন। মাসিক নিয়মিতকরণের অনুমোদিত ওষুধ সহজপ্রাপ্য হলেও ওষুধের সঠিক ব্যবহারবিধি সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনার অভাবে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় না।

বর্তমানে দেশে সন্তান প্রসবের ৪০ শতাংশই সি-সেকশনের মাধ্যমে হচ্ছে যার অনেকগুলোই অপ্রয়োজনীয়।[121] অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান কমাতে উচ্চ আদালতের দেওয়া ২০২৩ সালের নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। বাড়িতে স্বাভাবিক সন্তানপ্রসবের (নরমাল ডেলিভারি) মধ্যে ৫০ শতাংশই অদক্ষ প্রশিক্ষণহীন ধাত্রীর সহায়তায় হয়েছে।[122] বাড়িতে নিরাপদে স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তার জন্য সাম্প্রতিক ক্যাডার প্রোগ্রামভুক্ত ডিপ্লোমা সম্পন্ন করা মিডওয়াইফদের   সংখ্যা অপর্যাপ্ত। বাড়িতে নিরাপদ প্রসব-সেবার সাথে জড়িত প্রশিক্ষিত প্রসব-সহায়তাকারী[123] ও কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এটেন্ডেন্ট[124], প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে বাতিল হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যু পর্যালোচনা কার্যক্রমটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে মৃতের পরিবারের সদস্যসহ কমিটির মাধ্যমে পরিচালনার কথা থাকলেও এটি কার্যকর নয়।[125] সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানে না, এবং এটি স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায়ও অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

[119] UNICEF, 2020.

[120] BAPSA, 2017.

[121] BBS, 2024.

[122] Fatima et al., 2024.

ফুটনোট ১২২-১২৬ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[123] Traditional Birth Attendant (TBA).

[124] Community Skilled Birth Attendant (CSBA).

[125] এ কমিটিতে নারী বা মৃতের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আবার তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না এবং নারীর উপর সহিংসতা ও নারী-পুরুষের বৈষম্যসহ অন্যান্য সামাজিক ও পারিবারিক ধ্রুবক বাদ দিয়ে শুধু চিকিৎসাজনিত কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রতিবন্ধী নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা কম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব নয় এবং সেবাদানকারীদের দক্ষতাও সীমিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষ ঝুঁকি ও প্রান্তিকতা স্বীকার করা হয়নি। এ বিষয়ে কোনো বিশেষ পদক্ষেপের উল্লেখ নেই। জাতীয় স্বাস্থ্য-বাজেটেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ নেই। কেয়ারগিভারদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা নেই।

জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে নারীর প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন । অসংক্রামক রোগে নারীদের ঝুঁকি-গুরুত্ব পায় না। অথচ পুরুষের (১৭ শতাংশ) তুলনায় নারীদের (২৩ শতাংশ) উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি।[126] ডায়াবেটিসে ১৭ শতাংশ নারী ঝুঁকিতে থাকে। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে ৩০-৭০ বছর বয়সী নারীদের মৃত্যুহার ২০০০ সালে ছিল ১৮.৪ এবং ২০১৯-এ ১৬.২। নারীদের মধ্যে স্তন ও জরায়ুমুখ ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি।[127] এ বিষয়ে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী ও সেবাপ্রদানকারীরা যথেষ্ট সচেতন নয়। ফলে এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ ও বিতরণ নেই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়ন কৌশল ২০১২-২০৩২-এ নারীদের বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে এজন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ রাখা হয়নি

অপুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, বিশেষ করে শিশু ও নারীদের মধ্যে। পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের ২৮ শতাংশ খর্বকায়তায় ভুগছে। দরিদ্র পরিবার, বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং শিশুজন্মের মধ্যে কম সময়ের ব্যবধান হলে খর্বকায়তার ঝুঁকি বেশি থাকে। প্রসূতিকালে পুষ্টিহীনতা, অতিরিক্ত রক্তস্বল্পতা ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবে জন্মের পর শিশুরা অপুষ্টিজনিত অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

পার্বত্য এলাকার বিস্তৃতির তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্র কম। অনেকেই সেবাকেন্দ্র থেকে দূরে বাস করেন। দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থার ফলে আদিবাসী নারীরা, বিশেষত প্রসূতিরা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারেন না। যারা আসে তাদের মাতৃভাষায় সেবানকারী না থাকায় তারা ভাষাগত বাধার মুখে পড়ে। এর ফলে অনেকে সেবা নিতে আগ্রহ হারায়। এতে আদিবাসী নারীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

নারীর উপর সহিংসতার তথ্য-উপাত্তে প্রবীণ নারীরা উপেক্ষিত থাকে, কারণ তারা সমাজে দৃশ্যমান নয়। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এ তাদের উপর বিশেষ সুরক্ষার বিধান থাকলেও একটি গবেষণায় দেখা গেছে গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ ষাটোর্ধ নারী, বিশেষ করে বিধবারা সহিংসতার শিকার হন। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-তে নারী-পুরুষের সমতা ও সেবার নিশ্চয়তা থাকলেও তা বাস্তবে কার্যকর নয়।

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮, নীতিমালা ২০১৯ এবং জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০ রয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় একজন নারী-সদস্যসহ একটি মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি থাকবে। কৌশলে উল্লেখ আছে, পুরুষদের (১৫.৭ শতাংশ) তুলনায় নারীদের (২১.৫ শতাংশ) মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি। তবে নারী কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে এবং কীভাবে সেবা পেতে পারে, সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত কারণে নারী ও কিশোরীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা প্রায়শই অবহেলিত থাকে। যেমন: কাঠের চুলায় রান্নাজনিত বায়ুদূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় কাজ, লবণাক্ততার কারণে উচ্চ রক্তচাপ ও বন্ধ্যাত্ব, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সহিংসতা, খরাপ্রবণ-এলাকায় সুপেয় পানির জন্য দীর্ঘ পথ হাটা ইত্যাদি সমস্যায় তারা জর্জরিত। এ সম্পর্কে তথ্য সীমিত, তাই গবেষণা করে তথ্য সংগ্রহ ও প্রমাণভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩টি অধিদপ্তর—স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার-পরিকল্পনা এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি। আবার ২টি বিভাগ - স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ। এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিশৃঙ্খলা, পুনরাবৃত্তি ও অদক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে, যা নারীদের কার্যকর সেবাপ্রদানকে বাধাগ্রস্থ করছে।

---

[126] NIPORT & ICF, 2023.
[127] Globocan, 2022.
ফুটনোট ১৩০-১৩১ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

অকার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থাপনা[128] এবং পরিবার-পরিকল্পনা পণ্যের (যেমন: ইনজেকশন, আইইউডি) ঘাটতির কারণে সেবা প্রায়ই ব্যাহত হয়। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগে স্বাস্থ্যসমস্যার লিঙ্গ-বিভাজিত ও সমন্বিত তথ্যের অভাবে নারীরা এসব অসুখে কী পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছেন এবংকেমন ভুগছেন, এ সম্পর্কে সঠিক জানা ও বোঝা যায়না

স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের অধীনে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্র ও হাসপাতালের অনুমোদন, স্বীকৃতি ও লাইসেন্স প্রদানের শর্তসহ একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর খসড়া তৈরি হলেও এখনো কার্যকর নয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং সেবার ব্যয় নির্ধারিত না থাকায় রোগীরা, বিশেষ করে নারীরা শোষণের শিকার হয়। সি-সেকশন ও মাসিক নিয়মিতকরণ বেশির ভাগই বেসরকারি ক্লিনিকে হয়, যেখানে স্বাভাবিক প্রসবের পরিবর্তে নারীদের সি-সেকশন করাতে বাধ্য করা হয়। এতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

নারী চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, মিডওয়াইফ ও ল্যাব টেকনিশিয়ানর সংখ্যা অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ নারীরা নারী সেবাদানকারীর কাছ থেকে সেবা নিতে চায়। কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারণত পুরুষ সেবাপ্রদানকারী[129] থাকেন। এদের মাত্র তিন মাসের প্রশিক্ষণ থাকে, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় তাদের দক্ষতা সীমিত।

স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রগুলোতে সেবাপ্রদানকারীরা প্রায়ই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অসম্মানজনক আচরণ করে ও গোপনীয়তা বজায় রাখে না। সেবা-কেন্দ্রের অবকাঠামো নারীবান্ধব নয়; পর্যাপ্ত টয়লেট ও অপেক্ষা করার স্থান নেই।

২০০১ সালের জাতীয় প্রসূতি-স্বাস্থ্য কৌশলপত্রে - নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি[130] অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যখাত কর্মসূচির মাতৃস্বাস্থ্য অংশে নারীবান্ধব কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়, যা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে নারীপক্ষ ও অবসট্রেটিক্যাল এন্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ।[131] ২২টি হাসপাতালে কার্যকর এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ সূচক দিয়ে পরিবীক্ষণ করা হতো, কিন্তু করোনা মহামারির সময় এটি সংকুচিত হয়ে যায়।

বেসরকারি উন্নয়নসংস্থাগুলো পরিবার-পরিকল্পনা ও সংক্রামক রোগ- ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাপূরণে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়েছে। তবে তহবিলসংকটে অনেক সংস্থা কর্মসূচি সঙ্কুচিত বা বন্ধ করেছে। সরকারি কার্যক্রম এ শূন্যতা পূরণ না করলে একটি বড় শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

হাইকোর্ট রায়ে কিছু ক্ষেত্রে অনাত্মীয়দের মধ্যে অঙ্গদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৯ সালে সরকারকে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে আরও মানুষ অঙ্গপ্রদানে আগ্রহী হয় এবং দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে নারীর প্রাধান্য নিশ্চিত হয়।

১০.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১০.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১০.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) স্বাস্থ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত করতে সংবিধান সংশোধন করা (এ প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ।

খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গ) অনাত্মীয় ব্যক্তি অঙ্গদাতা হতে পারবেন, এ বিষয়ে ২০১৯ সালের আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনা অনুযায়ী আইন সংশোধন করা।[132]

[128] supply chain management
[129] Community Health Care Provider (CHCP)
[130] Women Friendly Hospital Initiative (WFHI)
[131] Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB)
[132] The Business Standard. (2019, December 5). সম্পূর্ণ সূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য

১০.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে ২০২৩ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা[133] অনুসারে নীতিমালা প্রণয়ন, এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে তা মেনে চলা পরিবীক্ষণ করা।

খ) কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত করে বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ২০১৭-২০৩০ পর্যালোচনা করা।

গ) নারী-চিকিৎসকসহ যে সকল চিকিৎসক দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ন্যুনতম ২ বছর সেবা প্রদান করবে, তাদের উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ঘ) যাবতীয় নির্দেশিকা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে নীতি পরিবর্তন করা।

ঙ) ১৯৮২ সালে প্রণীত জাতীয় ঔষধ নীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা।

১০.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১০.৩.১.৩.১ হাসপাতাল-ব্যবস্থাপনা কাঠামো নারীবান্ধব করা।

ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক হাসপাতাল-ব্যবস্থাপনা কমিটি সচল ও সক্রিয় করা।

খ) বিশেষ পারদর্শী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য-কর্মসূচি পরিকল্পনা করা এবং তাদের অংশগ্রহণসহ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ) নারীদের সার্বক্ষণিক সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বেসরকারি ও সরকারি সেবাদান সমন্বয় করা; অংশীজন নির্বাচন প্রক্রিয়া জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ রাখা।

১০.৩.১.৩.২ হাসপাতাল অবকাঠামো উন্নয়ন।

ক) নারী-রোগীর জন্য সকল হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা।

খ) দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য-ক্লিনিক স্থাপন করা, অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং সেবার মান উন্নত করা।

গ) যেসব বিশেষ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল, অথচ অকেজো, সেগুলোকে সচল করা।

১০.৩.১.৩.৩ আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ক) প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী, বিশেষত আদিবাসী নারী ও মেয়েদের জন্য মাতৃ ও প্রজনন-স্বাস্থ্যসহ পর্যাপ্ত ও সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; আদিবাসী অঞ্চলের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভাষাগত বাধা দূর করতে দোভাষী নিয়োগ বা স্থানীয় নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দোভাষী হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণোদনাসহ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১০.৩.১.৩.৪ নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল সেবাব্যবস্থা।

ক) চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি-রোধে শূন্য সহনশীলতা-নীতি গ্রহণ করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।

খ) যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীর ওপর দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং “Medical report and Examination form for female survivors” ফর্মে ১৬(গ) কলাম বাদ দিয়ে সংশোধিত ফর্ম সকল মেডিকো-লিগ্যাল অফিসারের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

---

[133] গর্ভবতী নারীদের অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ঃ https://blast.org.bd/2023/10/17/6101/

১০.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১০.৩.১.৪.১ নারীর স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি।

ক) বাল্যবিবাহ, বয়ঃসন্ধিকালে সন্তান জন্ম, প্রজননক্ষমতা ও লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতার মতো সমস্যায় জনসচেতনতা ও সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের স্বাস্থ্যসংস্থা, বেসরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।

খ) নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি সহ নারীর পূর্ণ জীবনচক্রের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা-চাহিদা, ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী ও স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সামগ্রিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঘ) নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচির সাফল্য ও প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ঙ) এসডিজি ও আইসিপিডি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বহুমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচির নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সহযোগী মন্ত্রণালয় ও অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।

চ) মাসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জাতীয় ব্যবস্থাপনা বিধি ও কৌশল ২০২১ কার্যকর করা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং এ সকল প্রক্রিয়ায় নারী ও কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত রাখা।

১০.৩.১.৪.২ স্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণা ও লিঙ্গা-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ।

ক) অসংক্রামক ও সংক্রামক রোগে নারীদের আক্রান্তের কারণ, হার ও মৃত্যুহার তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে জানা ও প্রচার করা এবং তা ভিত্তি করে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ) স্বাস্থ্য ও রোগসংক্রান্ত গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গা-বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সকলের জন্য উন্মুক্ত করা। বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালগুলোর নিয়মিত লিঙ্গা-বিভাজিত তথ্য প্রদান এবং তথ্যগুলো একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণব্যবস্থা তৈরি করা।

গ) প্রবীণ নারীদের উপর লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

১০.৩.১.৪.৩ স্বাভাবিক প্রসব নিরাপদ করা এবং অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসব করাতে উৎসাহিত করা।

ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল পর্যায়ে দক্ষ মিডওয়াইফ নিয়োগ, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সেবার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং কার্যকর রেফারেল-ব্যবস্থা চালু করা।

খ) মিডওয়াইফসহ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে স্বাভাবিক প্রসবের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং জরুরি প্রসব-সেবায় উপযুক্ত রেফারেল-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ) নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসবের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা।

ঘ) সকল ধাত্রীকে গর্ভবতী নারীর যত্ন ও সময়মতো রেফারাল প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাদের জন্য সম্মানজনক পদবি নির্ধারণ করা।

ঙ) নিরবিচ্ছিন্ন সেবা চালু রাখতে ওষুধ ও উপকরণের চাহিদা সময়মতো পেশ করে তা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বুঝে পাওয়া নিশ্চিত করা; অন্যথায় এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

১০.৩.১.৪.৪ প্রান্তিক এলাকার নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি।

ক) প্রান্তিক এলাকাসহ সকল নারীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও মাসিক নিয়মিতকরণ (সার্জিক্যাল MR ও ওষুধ MRM উভয় মাধ্যমে) চিকিৎসা সেবা প্রদানে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ সেবাদানকারী তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা। সকল সেবাদানকারীর MR ও MRM সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

খ) নারী, ওষুধের দোকানদার ও সেবাদানকারীদের মাঝে MRM-এর যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলি বিতরণ করা এবং সচেতনতা তৈরি।

গ) MRM ওষুধের ঘাটতি এড়াতে পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সময়মতো ফার্মেসিতে কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহ থাকা।

১০.৩.১.৪.৫ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির পরিকল্পনা সংশোধন।

ক) নারীদের স্বাস্থ্যসেবা-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৫ম স্বাস্থ্যখাত কর্মসূচির পরিকল্পনা সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করা, এ সংশোধন-প্রক্রিয়ায় নারী-অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রাখা।

খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপিইউ)-এর "Health Sector response to gender Based Violence: protocol for Health care providers"-শীর্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১০.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১০.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১০.৩.২.১.১ নারীর স্বাস্থ্য-বিষয়ক সকল আইন, কৌশল ও কাঠামো-পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা, আইন সংস্কার করা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষ চাহিদাসমূহ উল্লেখ করে আইন সংশোধন করা।

খ) বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকাঠামোয় নারীর জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পর্যালোচনা, সংশোধন ও অনুমোদন করে তার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১০.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক ১৯৯৪ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারক ও কর্মসূচি পরিচালকদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সচেতনকরণ এবং নীতিমালা প্রণয়নে নারী ও তরুণ প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

খ) নারীদের চাহিদা ও প্রয়োজন শনাক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র ২০১২-২০৩২ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা এবং এ প্রক্রিয়ায় নারী-সদস্য রাখা।

গ) প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্য-চাহিদার স্বীকৃতি ও অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ সংশোধন করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা করা; এবং ডিমেনশিয়া, বয়স্কদের জন্য বিশেষ সেবা, প্যালিয়েটিভ কেয়ারসহ উন্নত স্বাস্থ্যসেবা-কর্মসূচি চালু করা।

ঘ) মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ কার্যকর করা; নারীর মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা-ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন শনাক্ত করে মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা।

১০.৩.২.৩ *প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত*

১০.৩.২.৩.১ স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঝরে-পড়া রোধ করা।

ক) স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীর (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য) সংখ্যা বাড়ানো এবং নারী টেকনোলজিস্ট ও প্যারামেডিকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, চাকরির নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

খ) নারী-চিকিৎসকদের ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং তা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০.৩.২.৩.২ মাতৃমৃত্যু-প্রতিরোধে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা।

ক) অন্তঃসত্ত্বা নারীদের দায়িত্ব কেবল পরিবারের নয়, পুরো সমাজের এবং স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থারও। দেশব্যাপী প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে, মৃত্যুর কারণ শনাক্ত ও সেবার ঘাটতি চিহ্নিত করতে হবে।

খ) প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীসহ স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

গ) নীতিমালা অনুযায়ী, প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ কমিটিতে স্থানীয় নারী-সংগঠনের প্রতিনিধি ও মৃতের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক; কমিটির অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

১০.৩.২.৩.৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের পুনর্গঠন করা।

ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর তিনটির পৃথকীকরণ ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০.৩.২.৩.৪ নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি।

ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচির প্রটোকল পর্যালোচনা করে শিখন অন্তর্ভুক্ত করে নারীবান্ধব অবকাঠামো সহ হালনাগাদ করে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রে কার্যকর করা।[134]

১০.৩.২.৪ *কর্মসূচি-সংক্রান্ত*

ক) নারীর স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা-বৃদ্ধি কর্মসূচি চলমান রাখা।

খ) মানসিক স্বাস্থ্য-শিক্ষা স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় আনা।

১০.৩.২.৪.১ মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা।

ক) পরিবেশবান্ধব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও মানসম্পন্ন স্যানিটারি পণ্য (যেমন: ন্যাপকিন, মেন্সট্রুয়াল কাপ) সাশ্রয়ী মূল্যে সহজলভ্য করা।

খ) প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম (পার্বত্য, চর, হাওর, বন্যাপ্রবণ) এলাকায় মাসিকের বিভিন্ন দিনের চক্র বিবেচনায় পরিবেশবান্ধব পণ্যের প্যাকেজ প্রস্তুত ও বিতরণ, বিশেষত দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণে তা অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচকতা দূর করতে মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করা।

ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, আশ্রয়কেন্দ্র, রেল/বাস স্টেশনসহ জনসমাগমস্থলে ভেন্ডিং মেশিন বা অন্যান্য উপায়ে সুলভে মাসিক স্বাস্থ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

---

[134] যেমন—পর্যাপ্ত পানি-সরবরাহ থাকা, যথাযথ পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা রাখা, প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য র‍্যাম্প, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল-ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি

১০.৩.২.৪.২ স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিবন্ধী নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

ক) সেবাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণে ও মেডিকেল কলেজের পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধী-বিষয়ক অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা।

খ) স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী অবকাঠামো (ওয়াশরুম, র‍্যাম্প, নির্দেশনা) ও যোগাযোগব্যবস্থা (ইশারা-ভাষা, ব্রেইল) নিশ্চিত করা; প্রতিটি কেন্দ্রে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফোকাল পারসন নিয়োগ দেওয়া।

গ) স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত সব পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে একজন প্রতিবন্ধী নারী-প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কিশোরীদের জন্য উপযোগী মাসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা।

ঙ) প্রতিবন্ধী নারী গর্ভবতী হলে তাঁকে প্রতিবন্ধী ভাতা ও মাতৃত্বকালীন ভাতা—উভয়ই দেওয়া।

চ) প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত তথ্য-ব্যবস্থাপনা তৈরি ও লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

ছ) স্বাস্থ্য-বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।

১০.৩.২.৪.৩ প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা।

ক) প্রবীণ নারীদের উপর লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার তথ্যগুলো কর্মসূচির পরিকল্পনায় ব্যবহার করা।

খ) মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবীণদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করা (যা বর্তমানে মাত্র ৫০০ টাকা) ।

১০.৩.২.৪.৪ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নারী-স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।

ক) দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ প্রদানে প্রজননস্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্য বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) দুর্যোগে আশ্রয়স্থল নারীবান্ধব ও নিরাপদ করা, যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণ করা।

গ) দুর্যোগকালে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা খালি করার সময় গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

ঘ) লবণাক্ত পানির কারণে নারীদের জরায়ু রোগের ঝুঁকি বিবেচনায় বিশেষ স্বাস্থ্য-কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১০.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১০.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) নারী-স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হবে ও আইনকৌশল ও কাঠামো সংশোধন করা হবে। ,

১০.৩.৩.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

ক) বাংলাদেশে ডিমেনশিয়ার বর্তমান অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতা বিবেচনায় ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের জন্য আবাসিক/প্রাতিষ্ঠানিক যত্ন, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও যত্নশীল প্রস্তুতকরণ, এবং জ্ঞানভিত্তিক সেবা উদ্ভাবনে গবেষণা ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ, কমিউনিটি ও পরিবার-সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সমন্বিত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) প্রত্যেক বিভাগে নারীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে নারীর জন্য মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে।

গ) জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা চালু করে সকল নাগরিককে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

একাদশ অধ্যায়: অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার

সমান হিস্যা সমান ,অধিকার

১১.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলত কৃষিতে স্বকর্মসংস্থানের কারণে হয়েছে। ২০০০ সালে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ২৪ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশ এবং ২০২২ সালে ৪২.৮ শতাংশ-এ পৌঁছেছে।[135] বিপরীতে, পুরুষ-শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশের আশপাশে স্থির রয়েছে। কৃষিখাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি 'কৃষিতে নারীর' অংশগ্রহণ বৃদ্ধি[136] নির্দেশ করে। ২০০০ সালে যেখানে ৪৬ শতাংশ নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল, ২০২২ সালে তা বেড়ে ৭৪ শতাংশ হয়েছে।[137] যদিও জাতীয়ভাবে নারী-শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার[138] বৃদ্ধি পেয়েছে, শহরাঞ্চলে তা কমছে।

বাংলাদেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। প্রায় ৫০ শতাংশ নারী-শ্রমশক্তি স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা ২০১০ সালের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি।[139] তবে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে নারীদের জন্য অকৃষিপেশার সুযোগ তৈরি-পোশাকখাত ছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি।

বাংলাদেশে প্রায় ১১.৮ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ[140] রয়েছে, যার মধ্যে নারী-উদ্যোক্তারা ৭.৮ শতাংশের মালিক, যা প্রায় ৬০,৮৪,০০০ প্রতিষ্ঠান।[141] এ উদ্যোগগুলো কর্মসংস্থান-সৃষ্টি, উদ্ভাবন-চালনা ও জাতীয় জিডিপির ২৫ শতাংশে অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশকে নিয়োগ দেয় এবং শিল্পখাতের ৮০ শতাংশের বেশি চাকরি প্রদান করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন ব্যবসার প্রসারের ফলে নারী-উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নারী-উদ্যোক্তার সংখ্যা ২ লাখ ছাড়িয়েছে, যা ২০০২-০৩ অর্থবছরের ২১ হাজারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। বিশেষত, কোভিড-১৯ মহামারির সময় ই-কমার্স খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে।

১১.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

অর্থনৈতিক মন্দা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও আয়-বৈষম্যের বৃদ্ধি নারীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। পাশাপাশি, নারী-শ্রমশক্তির প্রকৃত অংশগ্রহণ নিরূপণে চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, বিশেষ করে তথ্যসংগ্রহের সীমাবদ্ধতার কারণে অনানুষ্ঠানিক ও গৃহস্থালি শ্রম যথাযথভাবে হিসাব না হওয়ায়। দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো নারীদের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

নারীর কৃষি খাতে অবদান ও স্বীকৃতির অভাব: বাংলাদেশে কর্মক্ষম নারীদের বড়ো অংশই কৃষিখাতে নিযুক্ত এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ (২০২২) অনুসারে, দেশের কৃষি-শ্রমশক্তির ৫৮ শতাংশ নারী এবং মোট নারী-শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। 'জাতীয় কৃষি নীতি' (২০১৮) ও 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' (২০১১) নারী-কৃষকদের সংজ্ঞায়িত না করে নারীকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে সরকারি কৃষিসেবা ও প্রণোদনা, কৃষিঋণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত। সরকারি কৃষি-তথ্যসেবার উপাত্ত অনুযায়ী, কৃষিক্ষেত্রে নারী-শ্রমের ৪৫.৭ শতাংশের ক্ষেত্রে তারা কোনো পারিশ্রমিক পান না।[142] অবশিষ্ট ৫৪.৩ শতাংশের ক্ষেত্রে তারা যে পারিশ্রমিক পান, তা বাজারমূল্যের চেয়ে কম।

মৎস্যখাতে নারীর অবদান ও সীমাবদ্ধতা: বিশ্বের জলজ চাষ-উৎপাদনে আনুমানিক ১.৭৮ কোটি কর্মসংস্থানের মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ চাকরিতে নারীরা আছে।[143] নারীরা মাছ-বাছাই, শুঁটকি-তৈরি, পোনামাছ সংগ্রহ ও জাল তৈরি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও জেলে বা মৎস্যজীবী হিসেবে স্বীকৃতি পান না। উপকূলীয় অঞ্চলে তারা দীর্ঘ সময় কোমরসমান লবণাক্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পোনা সংগ্রহ করে, এতে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিচ্ছে উপরন্তু তারা হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

---

135 BBS, 2023b
136 feminisation of agriculture
137 BBS, 2023b
138 Female Labour Force Participation Rate)FLFPR)
139 ibid
140 Small and Medium Enterprises (SMEs)
141 BBS, 2023b
142 The Daily Star, 2025
ফুটনোট ১৩৯-১৪৭ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
143 Yi, 2022

শ্রমবাজারে নারীর দুর্বল অবস্থান: শিক্ষাব্যবস্থা তরুণ নারী ও পুরুষদের কর্মসংস্থান বা জীবিকায়নের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারছে না এবং অনেকে শিক্ষার সুযোগ পান না। ফলে তরুণদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব এবং NEET (Not in Employment, Education, or Training) পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ২০২২ সালে নারীর NEET হার ছিল ২৭ শতাংশ, যা পুরুষদের (১৬ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।[144] ১৫-২৯ বছর বয়সী NEET যুবদের মধ্যে ৬৫.৫ শতাংশ নারী। অর্থনীতির পুনঃকৌশল নির্ধারণে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, যুব বেকারত্ব মোট বেকারত্বের ৭৯ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষা-অর্জনকারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ (১৩.১১ শতাংশ), যেখানে নারীদের বেকারত্বের হার ২০.৬ শতাংশ ও পুরুষদের ১০.৪৬ শতাংশ।[145] ২০২২ সালে মোট বেকারদের মধ্যে ২৮ শতাংশ ছিলেন স্নাতক ডিগ্রিধারী।

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবন্ধকতা: নারীদের ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবায় অংশগ্রহণ এখনো কম। বিশ্বব্যাংকের Findex (২০২১) অনুযায়ী ব্যাংকের মোট জমা হিসাবের ৩৭.৫ শতাংশ, মাইক্রোফাইন্যান্স[146] জমা হিসাবের ৩৩.৯ শতাংশ এবং মোবাইল আর্থিক সেবায়[147] নারীদের জমা হিসাব ৪১.৭ শতাংশ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারী-পুরুষের ব্যবধান পুরুষদের পক্ষে ৬.৯ শতাংশ বেশি।[148] মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে নারী-পুরুষের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি—৩৫.৪২। এ গবেষণাতে চিহ্নিত প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো: সামাজিক ও চলাচলের নিষেধাজ্ঞা, সম্পত্তির মালিকানা না থাকায় ঋণের জামানত দিতে অক্ষমতা, আর্থিক শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, ডিজিটাল বিভাজন—নারীদের মোবাইল অ্যাক্সেস সীমিত, নারীর আয় বা ঋণ পরিবারের পুরুষ-সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং নারীর জমির অধিকার ও প্রতিবন্ধকতা।

নারীরা পুরুষের জমির মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার: গ্রামাঞ্চলে কৃষিউৎ-পাদনের সাথে জড়িত অধিকাংশ নারীই ভূমিহীন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুযায়ী, ২০১৯ সালে প্রায় ৩২.০৪ শতাংশ নারী গৃহস্থালির সদস্যের জমির মালিকানা রয়েছে, যেখানে মুসলিম নারীদের মধ্যে মালিকানা (৩৪.২৬ শতাংশ) হিন্দু নারীদের (১১.৬৪ শতাংশ) তুলনায় বেশি। বেসরকারি গবেষণানুযায়ী, বাংলাদেশে পুরুষরা ৯৬ শতাংশ জমির মালিক; নারীদের মালিকানায় রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ জমি।[149] নারীদের ভূমি-অধিকার কম হওয়ার পেছনে পিতৃতান্ত্রিকতা, ভূমি-মালিকানা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব, ভূমিদস্যুদের কার্যকলাপ, ভূমি-প্রশাসনের দুর্নীতি, বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন ও প্রাপ্য অংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা অন্যতম কারণ।

১৯৯৭ সালে প্রণীত খাসজমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা-নীতিমালায় উল্লিখিত কর্মক্ষম সন্তান থাকার শর্তের কারণে বিধবা বা একক নারীরা খাসজমি বন্দোবস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

নারীদের সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা: সরকারি ক্রয়ে নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ সমতার জন্য অপরিহার্য। নিবন্ধিত টেন্ডারদাতাদের মধ্যে মাত্র ৩.৩৮ শতাংশ নারী-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে[150]। অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে সীমিত আর্থিক সক্ষমতা, জটিল ক্রয়-প্রক্রিয়া, সচেতনতার অভাব, প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধকতা ও সামাজিক বাধা।

নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা: নারীদের যে সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা পালন করতে হয়, তাতে তারা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সময় দিতে পারেন। জাতীয় পরিসংখ্যান (২০২৩) থেকে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা অবৈতনিক কাজের জন্য তিনগুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। সন্তান লালন-পালনের জন্য নারীদের চাকরি থেকে বিরতি নিতে হয় বা অপ্রতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত হতে হয়। এসব কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় পিছিয়ে পড়েন।

[144] BBS, 2023a
[145] Task Force Committee, 2025
[146] Micro-finance (MFI).
[147] Mobile Financial Service Provider (MFSP).
[148] Yi, 2022.
[149] Enokwenw, Garner, & Karanja, 2024.
ফুটনোট ১৪৮-১৫৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[150] বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (BUILD) এর সাথে পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত

১১.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১১.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১১.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১১.৩.১.১.১ পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করা।

ক) নারীদের সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা জরুরি।

১১.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

১১.৩.১.২.১ খাস জমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা।

ক) দেশের অধিকাংশ জেলা-উপজেলাতে খাস জমি বিতরণ বন্ধ আছে। সেখানে অনতিবিলম্বে পুনরায় খাস জমি বিতরণ-কার্যক্রম শুরু করার নির্বাহী আদেশ প্রদান করা।

খ) খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (১৯৯৭) জমির অগ্রাধিকার তালিকায় বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীর আবেদনের ক্ষেত্রে সক্ষম পুত্রসন্তান থাকার বিধান উপরিউক্ত নির্বাহী আদেশে বাতিল করা।

১১.৩.১.২.২ মৎস্যজীবী হিসেবে নারীদের স্বীকৃতি ও জলমহল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংস্কার করা।

ক) জলমহল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংস্কার করে নারীসহ সকল মৎস্যজীবীর সমিতির মাধ্যমে জলমহল বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে হবে। যারা মৎস্য-আহরণের ওপর নির্ভরশীল—প্রকৃতই খাল, বিল, নদী, হাওর, জলাধারে মৎস্য-আহরণসহ মৎস্যচাষ ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত—তাদের সকলকে শনাক্ত করে তালিকা তৈরির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সাথে এসব পেশাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-নীতির আওতায় এনে সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১.৩.১.২.৩ আনুষ্ঠানিক খাতে নারীদের জন্য অনুকূল কর্মসংস্থান নীতি।

ক) কর্মস্থলের নিয়ম ও শ্রম আইন সংশোধন করে নারী-কর্মীরা যাতে প্রয়োজনে সন্তান লালন-পালন করতে কর্মক্ষেত্রে বিরতি নিতে পারে এবং এর ফলে তাদের পদোন্নতি বিপর্যস্ত না হয়, সে ব্যবস্থা নেওয়া। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নমনীয় কর্মঘণ্টা চালু করা, যাতে তারা পেশাগত কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। কোভিড-১৯-এ দেখা গেছে যে, বাড়ি থেকে কাজ করার মাধ্যমে খরচ কমানো, নমনীয়তা বাড়ানো ও কর্মীসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

খ) সমস্ত বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, যাতে মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশিত যৌন হয়রানি মুক্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ ও ভাষা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় এবং এর ব্যতিক্রমী আচরণের ক্ষেত্রে অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

১১.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

ক) আদিবাসী নারীসহ সকল নারীকৃষকের কৃষিজমি ব্যবহারের অধিকারকে সরকারি সেবা ও কৃষকের সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও এডিবির শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পে এর উদাহরণ আছে।

১১.৩.১.৩.১ নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সহায়তায় ব্যবসায়িক সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী করা।

ক) ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, অর্থায়নের সাথে সংযোগস্থাপন এবং নীতিগত পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার চালাতে পারে। ট্রেড লাইসেন্স পেতে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সংগঠনগুলো তা সহজ করার উদ্যোগ নিতে পারে, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার সহজ করতে পারে এবং ব্যবসা আনুষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা করতে পারে।

খ) NASCIB, SME ফাউন্ডেশনের মতো সহায়ক সংস্থাগুলো সরকারি সেবা, বিধিমালা ও নিষেধ, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত তথ্যের একটি তথ্যভান্ডার তৈরি ও পরিচালনা করতে পারে এবং নারীদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে।

গ) নারী ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সদস্যপদ, প্রতিনিধিত্ব ও সেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সেবা ও সুবিধার বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ জন্য জেলা পর্যায়ে ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি।

১১.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১১.৩.১.৪.১ নারীর অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।

ক) ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস[151] প্রদানকারী, ফিনটেক কোম্পানি ও ক্ষুদ্রঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে নারীদের জন্য উপযোগী আর্থিক পণ্য ও সেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে, নীতিমালা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

খ) ঋণের শর্তাবলি সহজ ও নারীবান্ধব করতে হবে। বর্তমানে জামানত, ভূমি বা সম্পত্তির মালিকানা ও স্বামীর স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা নারীদের জন্য বড়ো প্রতিবন্ধকতা। ঋণের ক্ষেত্রে এমন শর্ত নির্ধারণ করা উচিত, যা ব্যাংকের নিরাপত্তা-চাহিদা পূরণ করে এবং একইসঙ্গে যোগ্য নারী-উদ্যোক্তারা তাদের দক্ষতা ও ব্যবসার সম্ভাবনা প্রমাণ করে সহজে ঋণ পেতে পারেন।

গ) নারীদের ঋণ পেতে পুরুষ-জামিনদাতার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা। নারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদিত হতে হবে। যদি কোনো নারী-আবেদনকারীকে ঋণ না দেওয়া হয়, তবে ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই লিখিতভাবে ঋণ-প্রত্যাখ্যানের কারণ জানাতে হবে। প্রয়োজনে তিনি আপিল করতে পারবেন এবং আদালতে যেতে পারবেন।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকে নারীদের জন্য ঋণবরাদ্দ-সংক্রান্ত সার্কুলারগুলোর যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। যেই সকল ব্যাংক নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করছে, তাদের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা দেওয়া উচিত এবং যারা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঙ) ব্যাংকিং পরিবেশ নারী বান্ধব করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী সমস্ত ব্যাংক শাখায় ‘উইমেনস ডেস্ক’ চালু করতে হবে।

চ) নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ-পণ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কেবল প্রচলিত ও কম লাভজনক ব্যবসার (যেমন: বুটিক, খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকরণ) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকেন। ব্যাংকগুলোকে আধুনিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা নারী-উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনাকে সীমিত না করে যথাযথ দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

১১.৩.১.৪.২ বনজ সম্পদের ওপর নারীর অধিকার।

ক) সামাজিক বনায়ন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এর অর্থনৈতিক সুফল ভোগ নিশ্চিত করতে হবে।

[151] Mobile Financial Service (MFS)

১১.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১১.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১১.৩.২.১.১ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক) নিবন্ধিত হতে হলে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার বোর্ড, সরকারি সংস্থা ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলোকে নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা। এর উদাহরণ নরওয়েতে আছে।[152]

খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারীদের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১১.৩.২.১.২ ই-কমার্সের জন্য একটি আইনগত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো[153] তৈরি করা।

ক) ই-কমার্সের ক্ষেত্রে নারীদের সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণকাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে ভোক্তা ও সরবরাহকারী উভয়ের অধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়।

খ) ট্রেড লাইসেন্স আইন সংশোধন করে অনলাইন ব্যবসাকে স্বীকৃতি প্রদান, লাইসেন্স পাওয়া ও নবায়নের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অনলাইনে নবায়ন ব্যবস্থা নেওয়া।

১১.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১১.৩.২.২.১ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতি

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলারে (২০১৯) নারী-উদ্যোক্তাদের বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প[154] খাতে নারীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প একসাথে না রেখে কুটির ও মাইক্রো-শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আলাদা করা। কুটির ও মাইক্রো-শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করলে অনেক নারীর জন্য সাশ্রয়ী সুদে ঋণ সেবা পাওয়া সহজ হবে, যা তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ করার জন্য সহায়ক হবে।

গ) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (২০২১) নারীর প্রয়োজন ও প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। নারীদের জন্য অর্থপূর্ণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনের জন্য একটি পৃথক নীতি প্রণয়ন করা।

ঘ) নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য কর-রেয়াতসহ আর্থিক প্রণোদনা চালু করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) ছোটো নারী-উদ্যোক্তাদের আর্থিক লেন-দেনের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এসক্রো অ্যাকাউন্ট[155] ব্যবস্থার নিশ্চিত করা।

চ) স্টার্টআপ ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা একত্রে কাজ করতে পারে এবং তাদের ব্যবসা সুরক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পায়।

ছ) যেহেতু অনলাইন মাধ্যমের ব্যবসা বা ই-কমার্স ব্যবসা যাচাই ও মূল্যায়ন করা কঠিন, তথ্য-প্রযুক্তি সম্বলিত পরিষেবায়[156] নিবন্ধন আইসিটি ব্যবসাকে একটি স্বীকৃত খাত হিসেবে ব্যবসা নিবন্ধন করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

---

[152] https://svw.no/en/insights/gender-balance-in-norwegian-board-rooms - Norway previously had this provision for government organisations and public companies. As of 2024 it has been expanded to private companies as well.

[153] Regulatory Framework

[154] Cottage, Micro, Small, and Medium Enterprise (CMSME)

[155] Escrow Account: একটি এসক্রো অ্যাকাউন্ট হল এমন একটি চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ লেনদেন সম্পন্ন করার সময় একটি বিশ্বস্ত তৃতীয় পক্ষের তহবিল ট্রাস্টে টাকা রাখে এবং তৃতীয় পক্ষ টাকা বিতরণ করে।

[156] Information Technology Enabled Services (ITES)

১১.৩.২.২.২ নারী-উদ্যোক্তা সংজ্ঞায় একক সংজ্ঞামান গ্রহণের প্রস্তাব/।

ক) বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ করে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করলে তা নারীদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ স্বীকৃতি, নীতি, আর্থিক অভিগম্যতা ও সহায়তা-কর্মসূচিগুলোয় প্রবেশে সহায়ক হবে। এ আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য ব্যবসায়ী সমিতিগুলো বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ও টেস্টিং ইনস্টিটিউশন[157] এর সঙ্গে কাজ করে একটি নারী-উদ্যোক্তা সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে, যা নারীদের ব্যবসাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত ও স্বীকৃত করতে সহায়ক হবে।

১১.৩.২.২.৩ কর ও মূল্যসংযোজন কর সহজীকরণ।

ক) কর-নির্ধারণ ও জমাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ, মূল্যসংযোজন কর এর তথ্য জমার সময়সীমা বৃদ্ধি এবং প্রদত্ত ছাড়ের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১১.৩.২.২.৪ নারীর সেবামূলক কাজের আর্থিক মূল্যায়ন করা।

ক) নারীদের সেবা মূলক কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য, 'স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্টস'[158] এর মাধ্যমে এর আর্থিক মূল্যায়ন করা উচিত, যা তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে।

১১.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১১.৩.২.৩.১ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক) বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই-এর মতো ব্যবসায়ীদের সংগঠনসমূহে কমিটি গঠনের সময় নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) নারী-উদ্যোক্তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অফ গভর্নরসে নারী-সংগঠন ও ব্যবসায়ী-সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ব্যাক্তি মালিকানা খাতের বোর্ড ও পরিচালক পদে নারীদের দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ী-সংগঠন থেকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১.৩.২.৩.২ সরকারি ক্রয়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

ক) সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে (দরখাস্ত ফর্মে প্রতিষ্ঠানের মালিকের লিঙ্গ উল্লেখ করে) তা উন্মুক্ত তথ্যভান্ডারে রাখা। লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ-ব্যবস্থা চালু করা এবং একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-কাঠামো প্রয়োজন।

খ) নারীদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা এবং এর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন করা।

১১.৩.২.৩.৩ নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় প্রবেশ সহজ করা।

ক) ডিজিটাল ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করা।

খ) বাড়িভিত্তিক ই-কমার্স ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সময় বাণিজ্যিক এলাকা শনাক্ত করার শর্ত বাতিল করা উচিত, বিশেষ করে যেসব ব্যবসা পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়।

---

[157] Bangladesh Standard and Testing Institute (BSTI)

[158] A satellite account is an extension of a central national or regional account, designed to provide detailed information on a specific area or aspect of the economy or society.

গ) ই-কমার্স ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর[159] ও ট্রেড লাইসেন্স উভয়ই ব্যবসা পরিচালনা ও ঋণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজন।

ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই সবুজ ও নীল সম্পদখাতে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক সহায়তা-কর্মসূচি ও ইনকিউবেশন পরিষেবা প্রদান করা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম-সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করা।

১১.৩.২.৩.৪ নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তা নিশ্চিত করা।

ক) সকল বৈষম্য দূর করে কুটির, মাইক্রো, ছোটো ও মাঝারি নারী-উদ্যোক্তাদের (ব্যবসায়ী/শিল্পপতি) জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং ৫ বছরের মধ্যে ২৫ শতাংশ ব্যাংক ঋণ নারীদের কাছে যাওয়া নিশ্চিত করা।

খ) নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্টআপ এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা, যাতে নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী হন।

গ) পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ: ভারত সরকার নারীদের জন্য নিবন্ধন খরচ কমানোর পর নারীদের নামে সম্পত্তি নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.৩.২.৩.৫ যুবনারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করা।-

ক) তরুণদের, বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা থেকে জীবিকার্জনের সফল সংযুক্তি নিশ্চিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গবেষণা সেল স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সেলগুলো ভবিষ্যতের শিল্প ও অর্থনীতির (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) মানবসম্পদ ও দক্ষতার চাহিদা যাচাই করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে তাগাদা দেবে।

খ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থী, বিশেষ করে তরুণ নারী ও পুরুষদের জন্য ক্যারিয়ার বিকল্প, চাকরির সুযোগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা তাদের শিক্ষাগত ও পেশাগত পথ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

গ) নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সম্প্রসারণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা জরুরি, যা উচ্চ আয়ের ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। (অধ্যায় ৯ দেখুন)

ঘ) আগামী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে নারীদের বেকারত্বের সম্ভাবনা হ্রাস ও নতুন চাকরিক্ষেত্রে সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি-দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তির জন্য নিয়োগকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয়েরই ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১.৩.২.৩.৬ নারীদের জন্য ক্যারিয়ার-পথ ও অগ্রগতির সুযোগ নির্ধারণ করা।

ক) প্রতিটি খাতে কাজের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ক্যারিয়ার-পথ ও অগ্রগতির স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এতে ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ ও নারী-কর্মীরা নিজেদের ক্যারিয়ার গঠনের সম্ভাব্য পথগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সে পথগুলোতে এগিয়ে যেতে কী প্রয়োজন, তা বুঝতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

খ নারী ও পুরুষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান-সংযোগকারী এজেন্সি স্থাপন করা।

১১.৩.২.৩.৭ গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোঝা কমানো, স্বীকৃতি দান ও পুনর্বণ্টন করা।

ক) গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোঝা কমাতে এবং তা নারী-পুরুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। গৃহস্থালি কাজে সময় ও শ্রম কমানোর জন্য শ্রমসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রসার করা।

[159] Digital Business Identification Number (DBID)

১১.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১১.৩.২.৪.১ সকল স্তরে ও সকল শ্রেণির শিশুর জন্য এলাকাভিত্তিক শিশুদিবাযত্ন-কেন্দ্র স্থাপন করা।

ক) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার বা বেসরকারি প্রদানকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণির পরিবারের জন্য কর্মস্থল ও কমিউনিটি-ভিত্তিক মানসম্পন্ন শিশুযত্ন-সেবা নিশ্চিত করা, যার মান, DIFE ও DWA পরিবীক্ষণ করবে।

১১.৩.২.৪.২ নারী-উদ্যোক্তাদের সরকারি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা।

ক) কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীদেরকে সমসুযোগ ও অংশীদারি দেওয়ার লক্ষ্যে BSCIC শিল্পনগরী, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ইপিজেডসমূহে নারীদের জন্যে স্থান বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

খ) বাণিজ্যমেলা, ব্যবসায়িক ডেলিগেশন ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।

১১.৩.২.৪.৩ নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

ক) জেলা চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য বাণিজ্যসংগঠনকে নারী-উদ্যোক্তাদের সদস্যপদ দিতে উৎসাহিত করা। তাদের সহায়তার জন্য বিশেষ সেল গঠন করা ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিতে উৎসাহিত করা।

১১.৩.২.৪.৪ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে সহায়তা করা।

ক) নারী-কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের জন্য প্রতিটি স্থানীয় বাজারে নারীদের জন্য উপযোগী একটি নিরাপদ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন বা স্থান বরাদ্দ করতে হবে। সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি এবং পৃথক পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরি।

১১.৩.২.৪.৫ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-কমার্স ব্যবহারে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিতকরণ।

ক) ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে নারীবান্ধব প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা জরুরি।

খ) নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুবিধাজনক ই-কমার্স পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ই-কমার্সের সফলতার জন্য সবার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য তাদের সতর্কীকরণ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১১.৩.২.৪.৬ নারীদের কৃষিখাতে অন্তর্ভুক্তি সহজ করা।

ক) ভৌগোলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নারীদের কৃষিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতি অনুযায়ী নারীদের কৃষিতে অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণসহিষ্ণু এবং শুষ্ক অঞ্চলে খরাপ্রতিরোধী ফসলের চাষে উৎসাহিত করতে হবে। এ ছাড়া, নারীদের জলবায়ু-স্মার্ট কৃষিপ্রযুক্তি, টেকসই বীজ, সেচব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

১১.৩.২.৪.৭ বনজ সম্পদের ওপর নারীর অধিকার।

ক) সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এর অর্থনৈতিক সুফল ভোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১১.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১১.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) সকল ধর্ম, সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা, যা ধর্ম, সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য একই নীতি ও শর্ত নির্ধারণ করবে, যা নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার অধিকারে সুরক্ষা প্রদান করবে এবং নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সমাজে সম্মান বৃদ্ধি করবে।

খ) অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পদে নারীর সমান অধিকার ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়: শ্রম ও কর্মসংস্থান

নিজের হাতে কাজ করি, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি

১২.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২০২৩ সালের প্রথম তিনমাসের হিসাব অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭.৬৩ কোটি, যার মধ্যে ২.৫৪ কোটি ছিল নারী-শ্রমিক। এ সংখ্যা নারী-শ্রমশক্তির ৩৪.৫ শতাংশ অংশগ্রহণের হারকে প্রতিনিধিত্ব করে। কর্মরত নারীদের প্রায় ৭৪.১ শতাংশ কৃষিখাতে নিযুক্ত, ৮.৭ শতাংশ শিল্পখাতে (উৎপাদন, নির্মাণ ও গ্যাস, পানি, পয়:নিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ) এবং প্রায় ১৭.২ শতাংশ সেবাখাতে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ২০১৬-১৭ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৪২.৭ শতাংশ হয়েছে, তবুও নারী-কর্মসংস্থানের একটি বড়ো অংশ প্রায় ৯৬.৬ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে ২০১৭ সালে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ নারী-কর্মী ছিল, কিন্তু ২০২২ সালে এ সংখ্যা কমে ১ কোটি ৭৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।[160] এ হ্রাস আংশিকভাবে তৈরি-পোশাকখাতে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি গ্রহণের কারণে হয়েছে, যার ফলে শহরাঞ্চলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-আয়কারী তৈরি-পোশাক ও প্রবাসী শ্রমিক—এ দুই খাতে নারী-শ্রমিকদের অবদান অসামান্য। দেশের প্রশাসন ও প্রতিরক্ষাখাতেও নারী সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে, যা দেশের মর্যাদা ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেশের প্রবৃদ্ধিতে নারীর এ অংশগ্রহণের পুরুষের সমান স্বীকৃতি ও সম্মান নেই।

১২.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

আধুনিক সমাজব্যবস্থায়ও নারীর কাজকে যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে না চাওয়ার বাধাগুলো সমাজ ও কখনো কখনো রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট। এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা হলে তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে। নারীর প্রতি বৈষম্য, হয়রানি, অবহেলা, কুসংস্কারগুলো দূর করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিকভাবে নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সকল পর্যায়ের সংস্কার অপরিহার্য।

পেশা নির্বিশেষে নারীরা যখন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হন, সেসব পেশায় নারীরা প্রতিনিয়ত হয়রানি, বৈষম্য, কম মজুরি, সহিংসতা, যৌন হয়রানি, সঠিক প্রশিক্ষণ না-পাওয়াসহ নানা ধরনের নিগ্রহ ও বঞ্চনার শিকার হন। এ সকল বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নারীরা কাজে আসতে পারছেন না অথবা উৎসাহিত হচ্ছেন না।

মজুরি-বৈষম্য: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের সম কাজে সম মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না বা থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একজন নারী-শ্রমিকের যোগ্যতা পুরুষ শ্রমিকের সমান থাকলেও নারীকে সুপারভাইজার/তদারকি অথবা আরও উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় না। নারীর যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করে তাকে নিম্ন পদে ও কম বেতনে নিয়োগ দেওয়া হয়। নারীর যোগ্যতার অবমূল্যায়ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বেশি। নারী-শ্রমিকদের অনেক কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা গৌণ কাজ হিসেবে দেখা হয়, যার ফলে তাদের মজুরি কম নির্ধারিত হয়। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের মজুরির পার্থক্য নির্ধারণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। শিল্পখাতে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরী[161], কৃষিখাতের শ্রমিকদের মজুরি-বৈষম্য প্রকট, চা-শ্রমিকদের মজুরি প্রায় বন্ধকি-শ্রমিকের মতো। কম বা অসম মজুরির এ চিত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটির অপ্রতুলতা: সরকারি চাকরিজীবী নারীদের জন্য ছয় মাসের প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি বিদ্যমান থাকলেও বেসরকারি খাতে তা চার মাস এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী-শ্রমিকদের জন্য এ সুবিধা প্রায় অনুপস্থিত। বেসরকারি ও কারখানা-শ্রমিকরা প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি পান না অথবা আংশিক পান। অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রম আইনের বিধান অনুসরণ না করায় নারী-শ্রমিকরা পর্যাপ্ত প্রসূতি ও প্রসবজনিত সুবিধা পান না। পিতৃত্বকালীন ছুটির ধারণা নেই বললেই চলে।

শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য: সরকারি প্রতিষ্ঠানে কিছু শিশু-দিবাযত্ন সুবিধা থাকলেও বেসরকারি খাতে এটি খুবই সীমিত। আইনে থাকলেও শুধু বৃহৎ সংস্থাগুলো ছাড়া অধিকাংশ ছোটো ও মাঝারি কারখানায় কর্মজীবী নারী-পুরুষের জন্য কোনো শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই স্তন্য পান করানোর সুবিধা নেই। সমাজের সকল স্তরের (উচ্চ ও নিম্ন আয়ের) অনেক নারী-কর্মী ও শ্রমিক শিশুদের দেখভাল করার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে দেন, যা নারীর আর্থিক স্বাবলম্বন ও নারীর ভাবনাকে সংকুচিত করে।

---

[160] Hasan & Das, 2025. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

[161] Starving Wage or Poverty Wage

কর্মক্ষেত্র জেন্ডার-সংবেদনশীল না হওয়ায় নারীরা সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে মাসিক ব্যবস্থাপনায়, মাতৃকল্যাণ সুবিধায় ও অধিকার আদায়ে নারীরা ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণ এবং যৌথ দরকষাকষি-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বঞ্চিত হন।

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও নারীর চলাচলে নিরাপত্তাহীনতা: কর্মস্থলে সহিংসতা, যৌন হয়রানির ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে। উচ্চ-আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি নেই।[162] সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় সহিংসতা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। অনেক নারী অভিযোগ জানাতে ভয় পান, কারণ তদন্তপ্রক্রিয়ায় প্রায়শই নারীদের হয়রানি করা হয় এবং চাকরি হারানোর ভয় থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কমিটি থাকলেও তা কার্যকর নয়।

যাতায়াতের জন্য নারীবান্ধব যানবাহন না থাকায় বিশেষ করে রাত্রিকালে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় থাকে। একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৭৯ শতাংশ নারী গণপরিবহণে যৌন হেনস্তার শিকার হন, প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে প্রতিদিন ১ জন যৌন হেনস্তার সম্মুখীন হন।[163] অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী-শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ; অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী-শ্রমিকরা প্রায়শই সহিংসতা ও যৌন হয়রানির শিকার হন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ: আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশের নারী-শ্রমিকদের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, কারণ এটি শ্রমবাজারে স্বয়ংক্রিয়তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা[164], রোবটিক্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করছে। এতে বাংলাদেশের নারী-শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং পিছিয়ে পড়ছেন। নারীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব চতুর্থ শিল্প বিপ্লব[165] এ সফল হতে ডিজিটাল লিটারেসি, প্রোগ্রামিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স ইত্যাদি দক্ষতা প্রয়োজন। অনেক নারী-শ্রমিক এসব দক্ষতার অভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না। পোশাকশিল্পের মতো শ্রমনির্ভর খাত, যেখানে নারীদের উপস্থিতি বেশি, সেখানে স্বয়ংক্রিয়তা ও রোবটিক্সের কারণে চাকরির সুযোগ কমছে। কম দক্ষ শ্রমিকদের কাজ রোবট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, যা নারীদের চাকরি হারানোর অন্যতম কারণ। একই সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাও উল্লেখ্যযোগ্য। নারীরা এখনো পরিবারের ভেতরে ও বাইরে বৈষম্যের শিকার হন, যা তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ কম পাওয়া এবং কর্মস্থলে ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত কাজে কম নিয়োজিত থাকা তাদের পিছিয়ে রাখছে। অনেক প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মস্থলে নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়নি, যা তাদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে।

যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি না থাকা: বাংলাদেশে যৌনকর্মীদের আইনগত স্বীকৃতি নেই, তবে যৌন পেশা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট আইনও নেই। আইন না থাকায় যৌনকর্মীরা পুলিশের হয়রানি ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন। আর্থিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে তারা আরও ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি না থাকায় তারা আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা পান না।

নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে কম অংশগ্রহণ: কর্মক্ষেত্র ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে নারী-কর্মী তথা নারী-শ্রমিকের পদগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অলংকারিক। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সংগঠনগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ কম, ফলে তারা নিজেদের অধিকার বিষয়ে দাবি তুলতে পারেন না এবং আদায়ে পিছিয়ে থাকেন।

চা-শ্রমিক: দেশে চা-শিল্পের বয়স ২০০ বছরের বেশি এবং চায়ের মূল্য ও মূল্যায়ন শতভাগ বাড়লেও চা-শ্রমিকদের জীবনমানের কোনো উন্নতি হয়নি। একজন চা-শ্রমিকের মজুরি এতই কম যে, তার একদিনের মজুরিতে পরিবারের সকলের একবেলা খাবারের জন্য যথেষ্ট না। কাজের জায়গায় কোনো টয়লেট-সুবিধা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, চাকুরি থেকে অবসরের পরে বাসস্থান বা ভূমির অধিকার নেই। বহু চা-শ্রমিক সন্তানজন্মের সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর শিকার হন অথবা মৃত সন্তান জন্ম দেন। প্রজন্ম ধরে চা-বাগানে কাজ করানোর স্বার্থে বাগানমালিকরা শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা না রেখে তাদেরকে নেশায় (মদ) বুঁদ করে রাখে। এতে নারী ও শিশুরা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তাদেরকে প্রজন্ম-পরম্পরায় চা-শ্রমিকের শোষণ ও বঞ্চনার জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

[162] Hossain & Siddiqui, 2009. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[163] Rabbi, 2024. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[164] Artificial Intelligence (AI)
[165] 4th Industrial Revolution (4IR)

১২.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১২.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১২.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩[166] সংশোধন করে সকল খাতে ছয় মাস বা ২৪ সপ্তাহ বাধ্যতামূলক পূর্ণ বেতনে প্রসূতি, প্রসবজনিত ও দত্তকজনিত ছুটি নিশ্চিত করা। শ্রম আইনে 'প্রসূতি কল্যাণ' শব্দ পরিবর্তন করে 'প্রসুতি অধিকার' করা এবং গর্ভধারণ থেকে প্রসবোত্তর ছুটিতে থাকাকালীন সময় চাকরিচ্যুতি নিষিদ্ধ করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অর্ন্তভুক্ত করা।

খ) সংশোধিত আইনে পিতৃত্বজনিত ছুটি অন্তর্ভুক্ত করা, যা দুই সপ্তাহের কম নয়। শিশু দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ছুটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রসূতি, প্রসবজনিত ও দত্তক গ্রহণের ছুটি ও সুবিধার জন্য আইনে সংযোজন করা।

ঘ) ট্রেড ইউনিইয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণে আইনে শতকরা হার নির্ধারণ করা।

ঙ) শ্রম আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্তকরণ।

চ) বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধন করে কার্যকরভাবে শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।

ছ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় আনা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯[167] অনুস্বাক্ষর করে আইন প্রণয়ন করা।

জ) শ্রম আইনে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।

ঝ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কাজকে স্বীকৃতি প্রদান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষিখাতে কাজ করা নারীকে কৃষক এবং মাছধরার কাজে নিয়োজিত নারীকে জেলে হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

ঞ) সরকারি খাস জমিতে চা-শ্রমিকের আবাসন সুবিধার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া।

ট) কর্মস্থলে লিঙ্গবৈষম্য ও যৌন হয়রানি-প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৯০[168] অনুস্বাক্ষর করা এবং সুপারিশ ২০৬[169] অনুসরণ করা।

১২.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের জন্য সরকারি হাসপাতালে প্রসূতি ও প্রসবজনিত সুবিধা নিশ্চিত করা। শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিবীক্ষণের জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা। শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার আইনের আলোকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, তার প্রয়োগ এবং তদারকি করা।

খ) শ্রম নীতি, ২০১২-[170] পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

গ) সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (মহামারি, বন্যা) ও শিল্পায়নে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্তকরণে নারীদের সুরক্ষার জন্য অগ্রাধিকার নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।

---

[166] https://mole.gov.bd/site/view/legislative_information/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE

[167] https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

[168] https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

[169] https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206

[170] https://mole.portal.gov.bd/site/elibrary/13cb6351-21cd-4abc-9077-f313f8668235

১২.৩.১.৩ *প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত*

ক) সকল কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে পরিবীক্ষণ কোষ গঠন। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় সরকারি ও বেসরকারি খাতে সরকারি ভর্তুকি ও বীমার ব্যবস্থা করা।[171]

খ) পুরুষ-শ্রমিক ও কর্মীগণ তাদের শিশুদের দিবাযত্ন-কেন্দ্রে রাখতে পারবেন, তা স্পষ্ট করে আইনে বলা এবং প্রয়োগ করা।

গ) শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ৩৪৫-এ সম কাজের জন্য সম মজুরি প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে এ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি নিশ্চিত করা।

ঘ) আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার নীতিমালা প্রণয়ন করা। নারীদের শ্রমঘন এলাকায় যাতায়াতের জন্য পৃথক বাস সার্ভিসের নীতিমালা গ্রহণ করা।

চ) যৌনকর্মীদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছ জবাবদিহিতা আওতায় আনা।

১২.৩.১.৪ *কর্মসূচি-সংক্রান্ত*

ক) প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা।

খ) কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।

গ) প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য বিশেষ কার্ড সরবরাহ করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

ঘ) নারীদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।

ঙ) যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, তাদের সন্তানদের শিক্ষা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, আর্থিক পরিষেবা, আইনি পরিষেবা নিশ্চিতকরণে দৃশ্যমান ফলাফলভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

চ) সহিংসতা নিরসনে প্রচারাভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

১২.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১২.৩.২.১ *আইন ও আইনগত কাঠামো*

ক) বাংলাদেশ শ্রম আইনে দত্তক নেওয়ার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা। যাতে করে সন্তান দত্তক নেয়া পিতামাতারা প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটির সুবিধা ভোগ করতে পারেন তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।

খ) কর্মস্থলে নারী-পুরুষ বৈষম্য ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর ও সুপারিশ ২০৬ অনুসরণ করে আলাদা আইন প্রণয়নসহ বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। যেহেতু শ্রম আইনে নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক কোনো অধ্যায় নেই, তাই শ্রম আইনে এ বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা; নারীর উপর সহিংসতা, বৈষম্য, অশালীন আচরণ, শ্লীলতাহানি, যৌন হয়রানি সংজ্ঞায়িত করা এবং প্রতিকার নিশ্চিত করা।

গ) যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গণপরিবহণ আইনে সহিংসতা ও যৌন হয়রানি নিরসনে সুনির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার প্রয়োগ তদারকি করা।

---

[171] https://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2025/01/NSSS-Action-Plan-Progress-Report-2024.pdf (page 42)

১২.৩২ নীতি.২.সংক্রান্ত

ক) প্রতিটি খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা, যাতে মজুরিবৈষম্য কমে। মজুরি-নির্ধারণে নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয় মজুরিকাঠামো নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নুন্যতম মজুরি বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে প্রতি বছর পুনর্মূল্যায়ন করা এবং মানসম্মত বাঁচার মত মজুরির জন্য নীতি প্রণয়ন করা।

খ) চিংড়ির ঘের ও কারখানায় শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ধরে পানি ও ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, যা নারীদের প্রজননসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে ফেলে। তাই এ বিষয়ে কর্মঘণ্টা, বিরতি, উপকরণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা।

গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য কর্ম-এলাকা ও আবাস এলাকায় শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্রের জন্য নীতিমালা, তার বাস্তবায়ন ও কঠোর তদারকি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবীদের শিশুর স্বাস্থ্যসুরক্ষা-নিশ্চিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সেবাপ্রদানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা। সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা। শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র সামাজিক ব্যবসায় রূপ দেওয়া; এতে করে সমাজের সকল পর্যায়ের নারীরা তাদের শিশুকে নিরাপদে রেখে শ্রম-কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারবেন।

ঘ) চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা। চা-বাগানগুলোতে টয়লেট, সুপেয় পানি, নারী-শ্রমিকদের মাসিককালে মাসিক ব্যবস্থাপনার উপকরণ প্রদান ও সমতলে কাজ করতে দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা, চা-শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

১২.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত-

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে শিশুদের স্তন্যপানের বিশেষ স্থান রাখতে হবে।

খ) ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের অধিকার-সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং মজুরিসহ অন্যান্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে।

গ) শ্রম-পরিদর্শন জোরদার করা। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে[172] আরও সক্রিয় করে শ্রমিকদের মজুরি, কর্মপরিবেশ, সুবিধা ভোগ করতে পারছে কি না ও বৈষম্য থাকলে, তার কারণ চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিকার করা।

ঘ) যৌনকর্মীদের শ্রম-অধিকার, নিরাপদ আবাসস্থল, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, শিশুদের অভিভাবকত্ব ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

১২.৩সংক্রান্ত-৪ কর্মসূচি.২.

ক) শোভন কাজের প্রচার: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'শোভন কাজ'-ধারণা অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, নারী-শ্রমিকদের অধিকার, নারীর অংশগ্রহণ, সম মজুরির জন্য কর্মসূচি আয়োজন করা।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমঘন এলাকায় নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-অধিকার উন্নয়নে কার্যকর পাবলিক প্রাইভেট কর্মসূচি চালু করা, যেখানে শ্রমিকগণ তাদের সুবিধামতো সময়ে গিয়ে সেবা নিতে পারবেন। নারীদের মাসিক ব্যবস্থাপনায় সবেতনে ছুটি উল্লেখকরণ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান।

গ) যৌন হয়রানি বিষয়ে গোপন অভিযোগ জানানো এবং প্রতিকার পাওয়ার জন্য হেল্পলাইন কার্যক্রম জোরদার করা। শ্রমঘন এলাকায় নারী-নির্যাতন রোধে বহুমুখী কর্মসূচির আদলে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা।

ঘ) নারীদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, কোডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[172] https://dife.gov.bd/site/page/b2ef53e5-3049-4913-bc29-5ddcc015b712/-

ঙ) নারীদের জন্য কর্মস্থলে প্রযুক্তিগত সুযোগ ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং কর্মপরিবেশ উন্নত করা। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।

চ) নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা। নারীদের শুধু পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভরশীল না রেখে অন্য রপ্তানিখাতে, প্রযুক্তি, ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, অ্যাগ্রোটেক ও অন্যান্য আধুনিক শিল্পখাতে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

ছ) সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একসঙ্গে কাজ করে নারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে উপযোগী দক্ষতা প্রদান করতে হবে। কর্মসংস্থানের নতুন মডেল তৈরি করতে হবে, যেখানে নারীরা নতুন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

১২.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১২.৩.৩.১ নীতিসংক্রান্ত

ক) নারী এবং পুরুষের সম্মানজনক কাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ) মহামারি ও আপদকালে শ্রমিক যেন তার পরিবার নিয়ে ক্ষুধার্ত না থাকতে হয়, তার জন্য আপদকালীন তহবিল সর্বদা প্রস্তুত রাখা। কেন্দ্রীয় তহবিলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশনা দিয়ে রাখা।

খ) বেকারত্ব ও কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ও বীমা-নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা।

১২.৩.৩.২ কর্মসূচিসংক্রান্ত-

ক) আপস্কিলিং, বড়ো ও প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট মেশিন চালানো এবং সেবাখাতে নারীরা যাতে কাজ করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা।

খ) স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও অঙ্ক বিষয়ে অধ্যায়নে উৎসাহিত করা এবং দৃশ্যমান ফলাফলভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। ***(এ প্রতিবেদনের নবম অধ্যায়ে দেখুন)***

ত্রয়োদশ অধ্যায়: নারী-শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন

নারী আভিবাসী শ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার

১৩.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বিশ্বায়নের এ যুগে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা, বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে বহুগুণ। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল সতেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে পঁচিশ কোটি ছাড়িয়েছে। মূলত ১৯৯১ সাল থেকে নারী-অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণভাবে দৃশ্যমান হতে শুরু করে। বাংলাদেশের নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ২০০৪ সালে মোট অভিবাসনের মাত্র ১ শতাংশ ছিল, যা ২০১০ সালে ৬.৪২ শতাংশ-এ পৌঁছায়।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো[173]-এর তথ্য অনুসারে, ২০০৪ থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিভিন্ন দেশে মোট ১২,৩৪,৩১০ জন নারী-শ্রমিক প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, জাপান, হংকং, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, মরিসাসসহ অন্যান্য দেশে নারী-শ্রমিক প্রেরণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে সৌদি আরব, জর্ডান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের উপর বাংলাদেশি নারী-অভিবাসীদের নির্ভরশীলতা বেশি রয়েছে।[174] যদিও আন্তর্জাতিকভাবে নারীদের অভিবাসনের গড় হার প্রায় ৪৯ শতাংশ, তবে ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কায় এটি ৭০-৯০ শতাংশ। আমাদের দেশে এ সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, নারীদের এ অংশগ্রহণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।[175]

বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের চারটি দক্ষতার স্তর বিদ্যমান, যেমন: পেশাদার, দক্ষ, আধা-দক্ষ ও কম দক্ষ। বাংলাদেশি কর্মীদের বেশির ভাগই আধা-দক্ষ ও কম দক্ষ স্তরে অন্তর্ভুক্ত। ২০২৩ সালে মোট অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে শুধু ৪ শতাংশ ছিলেন পেশাদার, ২৫ শতাংশ ছিলেন দক্ষ, ২১ শতাংশ ছিলেন আধা-দক্ষ এবং ৫০ শতাংশ ছিলেন কম দক্ষ।[176]

বাংলাদেশি নারী-অভিবাসী কর্মীরা পরিবারের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। গবেষণা অনুযায়ী, নারী-শ্রমিকরা তাদের আয়ের ৭০-৮০ শতাংশ দেশে পাঠান, যা পুরুষদের তুলনায় বেশি।[177] এই অর্থ শুধু অভিবাসী পরিবারের জীবনমানই উন্নত করছে না, বরং সামাজিক পরিবর্তন, নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর স্বাবলম্বী হয়ে উঠাতে ভূমিকা রাখছে। নারী-অভিবাসীদের সামাজিক মূলধন, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, সংযোগ ও নেটওয়ার্ক দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার প্রসারে সহায়ক। নতুন আয়ের সুযোগ একজন অভিবাসী নারীর সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় এবং তার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।[178]

বাংলাদেশে শ্রমিক-সুরক্ষায় একাধিক আইন, নীতি ও পরিকল্পনা রয়েছে, যা দেশি ও বিদেশি শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা বিধান করে। এতে নিয়োগকারী এজেন্সি ও গৃহকর্মী নারীদের নিয়োগকৃত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণবিধি ও শ্রমিকদের দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।[179]

১৩.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ:

আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রক্রিয়া বৈচিত্র্যময়, জটিল ও পরস্পর সংযুক্ত। আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকরা অভিবাসন-প্রক্রিয়া শুরু থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

নারী-অভিবাসনে বৈষম্য: পুরুষদের তুলনায় নারী-অভিবাসী শ্রমিকরা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, কম মজুরি ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের অধিকাংশই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারীরা গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করায় নিয়োগকর্তার সাথে তাদের শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে বিধায় শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা বেশি।

---

[173] Bureau of Manpower, Employment, and Training (BMET)
[174] Islam, 2010. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[175] Islam, 2008. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[176] https://drive.google.com/file/d/1arg2JtpYaoI00Bf2hiBsIElErXnOyTma/view?fbclid=IwY2xjawG71fhleHRuA2FlbQIxMQABHeSED7Qpa_JngiOeG80Q5hyOzSf6xj4Z1bMCPVtkuHsNcajqF2xQZszmxQ_aem_PB3YbeVlochncqu15EKz5g
[177] Shamim & Holliday, 2018. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[178] ibid
[179] ibid

অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ও কর্মপরিবেশ: নারী-অভিবাসী গৃহকর্মীগণের দৈনিক ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ভারী পরিশ্রম করা সাধারণ ব্যাপার।[180] বাহরাইন, কুয়েত, লেবানন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নিয়ে করা গবেষণায় দেখা যায় যে, গড়ে নারী-অভিবাসী গৃহকর্মীরা প্রতি সপ্তাহে ১০০ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন, যা প্রচলিত ৪০/৪৮ ঘণ্টার মানদণ্ডের দ্বিগুণেরও বেশি।[181] ভারী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা-সরঞ্জামের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

নির্যাতনের শিকার: অভিবাসী নারী-শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে মৌখিক, শারীরিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন। সম্প্রতি *ঢাকা ট্রিবিউন*-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মোট ২,৩১৫ জন নারী-অভিবাসী শ্রমিক সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন এবং তাদের বেশির ভাগই তাদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা কোনো-না-কোনো ধরনের যৌন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন—ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[182]

ভাষা-সমস্যা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা: ভাষা জানা না থাকার কারণে বাংলাদেশি শ্রমিকরা সঠিকভাবে প্রকাশ ও যোগাযোগ করতে পারেন না, যা তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যঘাত ঘটায়। তা ছাড়া, ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোটাও একটা সমস্যা। যেহেতু নারীরা বেশির ভাগ গৃহকর্মে নিয়োজিত, সেহেতু তাদের উপর শোষণের মাত্রা বেশি।

স্বাস্থ্যসমস্যা: ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪,৫০,০০০-এর বেশি বাংলাদেশি নারী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন করেছেন। এদের প্রায় ৯৫ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গৃহকর্মে নিযুক্ত।[183] অধিকাংশ শ্রমগ্রহণকারী দেশে নারী-গৃহকর্মীদের শ্রম আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়। এ নারী-অভিবাসী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও শোষণের সাথে শারীরিক, মানসিক, যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের নারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকার অভিবাসন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা নিরাপত্তাহীনতা ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (৬.২ শতাংশ) শিকার হচ্ছেন, যার মধ্যে ৪৫.১৬ শতাংশ নারী কোনো আইনি পদক্ষেপ নেননি। প্রায় ৯০ শতাংশ নারী জানেনেই না যে, নারী-শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কোনো সংস্থা নিয়োজিত আছে।[184]

অভিবাসী নারী-শ্রমিকের মৃত্যু: ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, মোট হত্যার ঘটনায় সৌদি আরবের অবস্থান শীর্ষে, যা ৩৩ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে লেবানন (২৫ শতাংশ) ও কুয়েত (১৭ শতাংশ)। এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণত নিয়োগকর্তারা জড়িত থাকে। প্রতিবেদনে ৯৮ জন নারী-অভিবাসীর মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা মোট মৃত্যুর ১৪ শতাংশ। গন্তব্য দেশগুলো থেকে পাওয়া প্রাপ্ত চিকিৎসা সনদ অনুযায়ী, ৬৮ শতাংশ মৃত্যুকে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের কারণে অনেক সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে, যাকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে দেখানো যায়।[185]

১৩.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ:

১৩.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৩.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৩.৩.১.১.১ আইনে অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ক) অভিবাসী নারী-শ্রমিক ও প্রত্যাগত নারী-শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান অভিবাসন আইন, বিধি ও নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, সম্মান ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

খ) সৌদি আরবসহ সকল দেশে নারী-অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে নিয়োগসংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ।

[180] Siddiqui, 2008.
[181] Barkat & Ahsan, 2014; Siddiqui 2008.
[182] Dhali, 2020.
[183] OKUP, 2019.
[184] Khan & Rabbi, 2021.
[185] Siddiqui, 2023.
ফুটনোট ১৮৫-১৯০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

১৩.৩.১.২ *নীতিসংক্রান্ত*

১৩.৩.১.২.১ শ্রম ও অভিবাসন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করা।

ক) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯ (গৃহশ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ কাজ) এবং ১৯০ (কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন ও হয়রানি মুক্ত করা) সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষর করা।

খ) অভিবাসী নারী-কর্মীদের মানবাধিকার সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আন্তর্জাতিক দলিলে অনুমোদন করা, বিশেষ করে সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার-সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহে।

১৩.৩.১.২.২ প্রবাসী কল্যাণ নীতিতে শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ক) নারী-শ্রমিকগণ যেন ব্যাংকে নিজে টাকা পাঠাতে পারেন, সে সুযোগ দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের সময় দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, অধিকার ও সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) বিদেশে কাজ করার সময়ে নারী-শ্রমিকদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি নিশ্চিত করা।

ঘ) গাল্ফভুক্ত দেশে কর্মরত কোনো শ্রমিক নিয়োগকর্তার বাড়িতে না থাকা। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক-প্রেরণকারী দেশে নারী-শ্রমিকদের রাতে থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা রাখা।

ঙ) নারী-শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কাফালা সিস্টেম[186] বিলুপ্ত করা, যাতে অভিবাসী শ্রমিক কর্মের ও চলাচলের স্বাধীনতা পাবেন, যার ফলে রেমিট্যান্স বৃদ্ধিসহ মানবাধিকার রক্ষা হবে।

চ) যারা আত্মীয়-স্বজনের পাঠানো ভিসাতে বিদেশ যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ভিসা-প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ রাখা, যেটা ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিল। অবৈধভাবে কোনো এজেন্সির নাম ব্যবহার বন্ধ করা।

ছ) অভিবাসনের ক্ষেত্রে অভিবাসী নারীদের অভিবাসনের দেশে জেন্ডার-সংবেদনশীল, নিরাপদ, তথ্যভিত্তিক ও বৈষম্যহীন জেন্ডার-নীতি প্রণয়ন করার জন্য দেনদরবার করা।

জ) অভিবাসী শ্রমিককে ডাকযোগে ভোটের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

ঝ) পুনঃএকত্রীকরণ নীতির খসড়া অনুমোদন করা।

১৩.৩.১.৩ *প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত*

১৩.৩.১.৩.১ প্রবাসে ও প্রত্যাবাসনে সহায়তা দান।

ক) নারী-অভিবাসী শ্রমিক শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হলে দূতাবাস থেকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) দূতাবাসে শ্রমকর্তাদের (লেবার এট্যাশেদের) নারী-অভিবাসী কর্মীর কল্যাণে আরও তৎপর করা।

গ) অনিবন্ধিত অভিবাসীদের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থা করা।

---

[186] কাফালা পদ্ধতি, যাতে অভিবাসী শ্রমিকদের একটি দেশে বসবাসের সময়কালজুড়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তার সাথে আবদ্ধ করে।

ঘ) নারীদের উপর সহিংসতারোধে সকল দূতাবাসে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস স্থাপন এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও দূতাবাসের মাধ্যমে অভিযোগ পর্যবেক্ষণ ও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[187]

ঙ) অসদাচরণ ও নির্যাতনের ঘটনারোধে অভিযোগ দায়ের ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার জন্য এ বিষয় বিভিন্ন দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা।

চ) ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জন, দক্ষতার স্বীকৃতি, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও টেকসই উদ্যোক্তাবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত খসড়া পুনঃএকত্রীকরণ নীতি অবিলম্বে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।

ছ) নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৩.৩.১.৪.১ প্রাক অভিবাসন-প্রস্তুতিতে সহায়তা।

ক) অভিবাসন-ব্যয় কমানোর জন্য সরকার-নির্ধারিত সকল ফি ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যয়ের সুযোগ বন্ধ করা।

খ) বিদেশে গমনকারী নারী-শ্রমিকের নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খোলা নিশ্চিত করা।

গ) শ্রমিক-গ্রহণকারী দেশের সাথে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে যে সকল শর্ত নারী-শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে, সেগুলো প্রাক-অভিবাসন পর্যায়ে তাদের জানিয়ে দেওয়া।

ঘ) বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা ও কাজের উপর অভিবাসী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ফেরত আসা শ্রমিকদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে, যাতে তাদেরও কর্মসংস্থানও হয়।

ঙ) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নিজ দেশ ও গন্তব্যদেশ—দুই দেশেই ২৪/৭ হেল্পলাইন পরিষেবা কার্যকরভাবে চালু করা।

১৩.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৩.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) আইনগত ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণের মাধ্যমে পাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও যৌন হয়রানি থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১৩.৩.২.২.১ অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে চুক্তি ও নীতি।

ক) নারী-শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে যেন অধিকার-বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার না হন এবং অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে, সে বিষয়ে গন্তব্য-দেশগুলোর সাথে সরকারের চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং প্রচার করা।

খ) নারী-শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের পূর্বে তাদের বীমাব্যবস্থা নিশ্চিত করা। মৃত্যু ও আত্মহত্যাকে বীমার আওতায় রাখা।

[187] ২০২২ সালে জর্ডান দূতাবাস ওয়ান-স্টপ-শপ স্থাপন করেছিল।

১৩.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৩.৩.২.৩.১ সেবাব্যবস্থা জোরদার করা।

ক) ফেরত আসা নারী-শ্রমিকরা যাতে সহজে কাজ খুঁজে পেতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণ-প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে, সে লক্ষ্যে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড তাদের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে কর্মসংস্থান-সংযোগ সেবা চালু করা।

খ) নারীদের লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা থেকে রক্ষায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ে[188] সালিশ-ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিবাসন-সম্পর্কিত অভিযোগগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।

গ) অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা ও ডিজিটাল মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

ঘ) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি **কার্যালয়ের** অধীনে নারীদের জন্য যে সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, সেগুলোর প্রশিক্ষণের মান ও বিষয়-মূল্যায়ন করে বৈচিত্র্যময় ও বৈশ্বিক চাহিদা আছে—এমন সব পেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঙ) দূতাবাসগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য যে সকল সেবা চালু আছে, সেগুলোর মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

১৩.৩.২.৩.২ তদারকি ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

ক) অভিবাসী নারী-শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রেরণকারী দল[189] এবং গন্তব্য দেশ[190] যৌথ কারিগরী কমিটির[191] নিয়মিত সভা করা।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা মর্যাদাপূর্ণভাবে সেবাপ্রদান নিশ্চিত করা। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যদি নারী-শ্রমিকদের কোনো রকমের হয়রানি করে, সে ক্ষেত্রে তদন্ত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দ্বারা তাদের কার্যবিধি অনুযায়ী অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ) বিদেশে নারী-শ্রমিক পাঠানোর পর তাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিয়মিত খোঁজখবর রাখার জন্য তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ বিষয় অবশ্যই দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঙ) নিয়োগকারী সংস্থা ও সাব এজেন্টদের কার্যক্রম জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কঠোর পরিবীক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।

১৩.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৩.৩.২.৪.১ নিরাপদ অভিবাসনের জন্য তথ্য ও বহুমুখী সহায়তা।

ক) অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অধিকার-বিষয়ক একটি প্রাক-প্রস্থান ওরিয়েন্টেশন মডিউল তৈরি করা, যা অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশি পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব তথ্য সরবরাহ করবে।

খ) সরকারি অভিবাসন নীতিগুলো-সম্পর্কে অভিবাসী নারীদের অবহিত করা।

---

[188] District Employment and Manpower Office (DEMO)
[189] Country of Origin
[190] Country of Destination
[191] Joint Technical Committee

গ) বিদেশে নারী-শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নারী-শ্রমিকদের জন্য বহুমুখী শ্রমবাজারের বিস্তার ঘটানো। বিভিন্ন দেশে নারীদের গৃহকর্মী পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় নিয়োজিত করার জন্য গবেষণা-কার্যক্রম ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো। নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক পেশাগত বাজার গবেষণা করে নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

ঘ) 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড' দ্বারা নারী-অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তার জন্য অর্থ সহায়তা নিশ্চিত করা।

১৩.৩.২.৪.২ ফিরে আসা শ্রমিকদের মর্যাদা, সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়ক মনোসামাজিক সেবা প্রদান।

ক) বিদেশফেরত নারী-শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

খ) বিদেশ থেকে ফিরে আসা ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা এ ক্ষেত্রে শোষণ বা সহিংসতার শিকার, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকা, পাচার হওয়া ও যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া।

গ) বিদেশফেরত নারীদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় দিবস উদযাপনে নারী-অভিবাসীদের অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা।

ঘ) প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, সাথে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৩.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৩.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৩.৩.৩.১.১ শ্রম আইনে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা।

ক) শ্রম আইন সংস্কার করে একক শ্রমিককে ফেডারেশনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিয়ে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত হবে।

১৩.৩.৩.২ নীতিসংক্রান্ত

১৩.৩.৩.২.১ শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান রক্ষা।

ক) শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ নিয়মিত তদারকি করা।

খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদে নারী-অভিবাসী কর্মীদের জন্য সাধারণ সুপারিশ ২৬, অনুচ্ছেদ ৫[192] এর বাস্তবায়ন করা।

গ) দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বাংলাদেশের নারী-শ্রমিকদের বিদেশে সমিতি করার সুযোগ রাখা, যাতে তারা তাদের সমস্যা, সমাধানের উপায় ও ন্যায্য দাবি উপস্থাপন করার সুযোগ পায়।

[192] নারীদের উপর অভিবাসনের সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিশ্লেষণ করতে হলে, নারী অভিবাসনকে লিঙ্গ বৈষম্য, প্রচলিত জেন্ডার রোল, জেন্ডারড শ্রম বাজার, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার সার্বজনীন বিস্তৃতি এবং বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য ও শ্রম অভিবাসনে নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করতে হবে।

১৩.৩.৩.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৩.৩.৩.৩.১ দূতাবাসের ভূমিকা শক্তিশালী করা।

ক) বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে নারী-গৃহশ্রমিকদের জন্য মাসে একটি নির্ধারিত দিন রাখা, যাতে তারা অনলাইনে উপস্থিত হয়ে সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করতে পারে, যেমনটা ফিলিপাইন দূতাবাস প্রতি মাসে করে।

খ) শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো শ্রমিক এককভাবে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে না। শ্রম আইনের সংস্কার করে শ্রমিককে ফেডারেশনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেওয়া, যাতে করে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো সরকার ও প্রযোজ্য সংগঠনগুলোর সাথে একক ও সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে পারে।

গ) সকল খাতে ভালো মজুরিসহ অধিক সংখ্যক নারী-অভিবাসনের ব্যবস্থা নেওয়া, যেখানে তাদের কর্মপরিবেশ ও মর্যাদা বর্তমানের চেয়ে অনেক উন্নত হবে। তারা আন্তর্জাতিক শ্রম ও অভিবাসন আইনের সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

ঘ) নারী অভিবাসীদের জন্য বহুমাত্রিক, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত হবে।

১৩.৩.৩.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৩.৩.৩.৪.১ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন।

ক) নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ অভিবাসনের জন্য প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়া।

খ) নিয়োগকারী সংস্থা ও সরকারের সাথে এক জোটে কাজ করার মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসনের পথকে সুগম রাখা।

গ) অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় বেসরকারি সংগঠনগুলো, নিয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা শক্তিশালী করা ।

চতুর্দশ অধ্যায়: দারিদ্র্য-হ্রাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা

খাদ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্য হোক মৌলিক অধিকার ,বাসস্থান ,বস্ত্র ,

১৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-হ্রাসে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার জাতীয় পর্যায়ে ছিল ১৮.৭ শতাংশ, গ্রামীণ এলাকায় ২০.৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৪.৭ শতাংশ।[193] নিম্ন দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী এ হার জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৫.৬ শতাংশ, গ্রামীণ এলাকায় ৬.৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৩.৮ শতাংশ। শহুরে দারিদ্র্যের হার কম হলেও দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার একটি কারণ হলো দ্রুত নগরায়ন। ২০২২ সালে শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৫.২ কোটিতে পৌঁছেছে, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৪ কোটি।[194] বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবও অর্থনীতি ও দারিদ্র্যের উপর প্রভাব ফেলছে।

কোভিড-১৯ ও একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দারিদ্র্য-হ্রাসের গতি মন্থর হয়েছে এবং অনেক বেশি মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পড়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০২৪ সালের বন্যা প্রমাণ করেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ২০২৪ সালে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ ছিল উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি; নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার ১১.৩৮ শতাংশ-এ পৌঁছায়, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। নভেম্বর, ২০২৪-এ খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১৩.৮০ শতাংশ, যা দরিদ্রদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ফেলে তাদের জীবনযাত্রাকে কষ্টকর করে তুলেছে।[195] সংকটের প্রভাব কমাতে এবং পরিবারগুলোকে অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করতে সামাজিক সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য-হ্রাসে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: সামাজিক সুরক্ষা বিদ্যমান থাকলেও তা অনেকটা এড হক/ অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। ২০১৫ সালে অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল[196] একটি জীবনচক্রভিত্তিক (শৈশব, কর্মজীবন, মাতৃত্ব, বার্ধক্য) সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। এতে প্রতিবন্ধিতা, নগর-দারিদ্র্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নারীদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০১৮-তে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাও প্রণীত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচিতে দরিদ্র ও নারীদের শোভন কর্মসংস্থান, দক্ষতা-উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, আর্থিক সেবা এবং জীবিকার সুরক্ষা ও অভিযোজনের সুযোগ দিয়ে তাদের দারিদ্র্য-হ্রাস, ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন করা এবং বৈষম্য কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচিতে রয়েছে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্ত/পরিত্যক্ত নারীদের ও মাতৃত্বকালীন ভাতা; শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি; খাদ্য নিরাপত্তা; দুর্যোগ-সহায়তা;দরিদ্রদের কর্মসংস্থান; জলবায়ু-অভিযোজন; মানব-উন্নয়ন; দক্ষতা ও জীবিকায়ন কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষাখাতে মোট ১,২৬,০৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যা মোট বাজেটের ১৬.৪৮ শতাংশ ও জিডিপির ২.৫০ শতাংশ।[197] এখানে ১৪০টি কর্মসূচির আওতায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ উপকারভোগী রয়েছে। নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি থেকে ৪১ লক্ষ জন উপকারভোগী সহায়তা পান। তবে আরও বেশ কিছু কর্মসূচিতে লিঙ্গ-বিভাজিত উপাত্তের অভাবে নারীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে, ৩৪ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এবং ১৯ শতাংশ সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সুবিধা গ্রহণ করেন।[198] অর্থ বিভাগের কাছে ২৬টি সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থায়[199] অভিগম্যতা আছে, তাই সরকারের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ ছাড় হয়।

[193] BBS, 2023a.
[194] BBS, 2022.
[195] WFP, 2025.
[196] National Social Security Strategy (NSSS).
[197] Finance Division, 2024.
ফুটনোট ১৯৮-২০২ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[198] BBS, 2023a. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[199] Management Information System (MIS)

১৪.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষিখাতের ও শিল্পখাতের জিডিপি-প্রবৃদ্ধি ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কমে গেছে[200], এতে কর্মসংস্থান সংকোচনের ঝুঁকি ও বেকারত্বের সম্ভাবনা বেড়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগ শ্রমবাজারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে নারীরা বিশেষত তৈরি-পোশাকশিল্পে এ মন্দার প্রধান শিকার হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।[201] মুদ্রাস্ফীতির কারণে পারিবারিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য ব্যয় কঠিন হয়ে উঠেছে। সামাজিক সুরক্ষা-কৌশল থাকলেও কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক ত্রুটি রয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা ভাতার পরিমাণ কম: সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির আওতায় ব্যাক্তিকে যে পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয়, তা নগণ্য। মুদ্রাস্ফীতির ফলে এ ভাতার ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়ে সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে অতিরিক্ত তহবিল প্রয়োজন, যা মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থসংকটের কারণে বরাদ্দ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

সামাজিক সুরক্ষা-বরাদ্দের ত্রুটিপূর্ণ হিসাব: সরকারি কর্মচারীদের অবসরভাতা, ভর্তুকি ও কিছু অবকাঠামোগত ব্যয়কে সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে হিসাব করা এবং কিছু অপ্রাসঙ্গিক কর্মসূচি তালিকায় থাকায় সামাজিক সুরক্ষা-বাজেটকে বড়ো দেখা যায়, যাতে প্রকৃত সামাজিক সুরক্ষাব্যয় ও বরাদ্দ হিসাব বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

সামাজিক সুরক্ষা-সুবিধাভোগী বাছাইতে ত্রুটি: উপকারভোগী নির্বাচনে বাদ দেয়া ও অন্তর্ভুক্তি উভয় প্রকার ত্রুটি রয়েছে। একদিকে, যারা সামাজিক সুরক্ষার প্রকৃত হকদার, তারা বাদ পড়ছেন; অন্য দিকে, যারা এর যোগ্য নন, তারা সহায়তা পাচ্ছেন। বিভিন্ন ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক মানুষ, বিধবা ও অসহায় নারী, এতিম শিশু, প্রান্তিক জনগণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রদত্ত ভাতা সকল যোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপ্রতুল। কিন্তু অন্য দিকে যারা দারিদ্র্যসীমার উপরে আছেন, তারা তালিকাভুক্ত হয়ে সুবিধা পাচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সদস্যরা উপকারভোগীর তালিকা-প্রণয়নে প্রায়ই ভোটারদের রাজনৈতিক সমর্থন বিবেচনা করেন, ফলে পক্ষপাতিত্ব ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় অনেক প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। সঠিক লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের অভাব কর্মসূচির সুবিধাভোগী বাছাই ও প্রভাব মূল্যায়নে সমস্যা তৈরি করছে এবং কর্মসূচির তহবিলের অপব্যবহার ঘটাচ্ছে।

শহর-গ্রাম বিভাজন: সামাজিক সুরক্ষাসেবা-সহায়তার ক্ষেত্রে শহর-গ্রাম বিভাজন স্পষ্ট এবং শহরে নিম্ন আয়ের এলাকার বাসিন্দারা পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা পান না। সামাজিক সুরক্ষাসেবা প্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ শহরের বাসিন্দা।[202] দ্রুত নগরায়ন শহরের নারীদের মধ্যে বহুমুখী অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করছে। তাদের অস্থায়ী বাসস্থান, অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের কারণে বিভিন্নমুখী সামাজিক সুরক্ষা বেশি প্রয়োজন।

নারীর জন্য সমস্যা: বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা-নীতিমালা ও কর্মসূচির কাঠামোগত দুর্বলতা, জেন্ডার-সংবেদনশীলতার অভাব নারীদের জন্য দেওয়া কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত, তথ্যের ঘাটতি ও চলাচলে বাধা নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা-সুবিধাতে অংশগ্রহণ সীমিত করছে। সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দক্ষতা-উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেরকে গতানুগতিক পেশায় সীমাবদ্ধ রাখছে এবং এতে কোনো রকম উত্তরন-পরিকল্পনার অভাবে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ কম। সামাজিক সুরক্ষায় নারীর উপর সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত নেই। জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়, ফলে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও কর্মসূচিতে বিনিয়োগ সীমিত। সহিংসতার শিকার নারীরা সামাজিক নিরাপত্তা বা জরুরি সহায়তা পান না, যার ফলে তারা আরও দারিদ্র্য ও সমস্যার মধ্যে পড়েন।

---

[200] The Business Standard, 2025.
[201] Mridha, 2024.
[202] Task Force Committee, 2025.
ফুটনোট ২০৫-২০৭ সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

সমন্বয়হীনতা: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয়হীনতা থাকায় একাধিক সংস্থা একই ধরনের প্রকল্প পরিচালনা করছে যাতে অর্থ-অপচয় ঘটছে।

সেবা ও বীমাব্যবস্থা না থাকা: অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত পুরুষ ও নারীরা সামাজিক সুরক্ষার আওতার বাইরে থাকায় তারা স্বাস্থ্যসেবা, অবসর-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা-কৌশলে প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এখনো খুব সীমিত। এখনো সাধারণভাবে অবদানভিত্তিক[203] সামাজিক বিমাব্যবস্থা নেই, যার ফলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেকারত্ব, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ঝুঁকির ক্ষেত্রে কোনো সুরক্ষা সহায়তা পান না।

সরকার থেকে সরাসরি ব্যক্তিতে অর্থপ্রদানের ঝুঁকি: ব্যক্তিপর্যায় পর্যন্ত ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থাটি ভালো উদ্যোগ। তবে আবেদন ও ভাতাপ্রাপ্তি অনলাইনে হওয়াতে কিছু মানুষের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক নারীর নিজস্ব মুঠোফোন না থাকায় বা তা ব্যবহার করতে না পারায় তাদের আবেদন, নিবন্ধন ও প্রাপ্তির জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হয়, যাতে অনেক সময় অন্যের কাছে অর্থ চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তদের কিছু ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা জানা গেছে। এতে নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে অনেকে শংকা প্রকাশ করেছেন।

জলবায়ুর অভিঘাত বিবেচনায় অপ্রতুলতা: বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি জলবায়ুর অভিঘাত বিবেচনায় অপ্রতুল। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনের কারণে অনেক পরিবার বাস্তুচ্যুত হন, ফলে দারিদ্র্য, খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা ও নারীর উপর সহিংসতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া দুর্যোগে ও পরবর্তী সময়ে পরিবার বা পুরুষ স্থানান্তর হলে অপর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা তাদের সংকট আরও বাড়িয়ে দেয়। এতে অনেক সময় নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন ও সহনশীলতা গঠনের কৌশল এখনো কার্যকর হয়নি।

১৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৪.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৪.৩.১.১ নীতিসংক্রান্ত

১৪.৩.১.১.১ সামাজিক সুরক্ষা-প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক কি না, তা নিশ্চিত করা।

ক) বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/ভাতাপ্রাপ্তির মানদণ্ড পর্যালোচনা করে কিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক বিধান সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া।

খ) শহরে বসবাসকারী যারা নগর-ভোটার নন, যৌনকর্মী, বেদে-সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া।

গ) বার্ধক্যভাতা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা পুনর্বিবেচনা করা, কারণ কিছু জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রা বা পেশার কারণে দ্রুত বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং অন্যদের তুলনায় বেশি অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

ঘ) পরিমার্জিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা-কৌশলে বেকারত্ব-বীমা চালু করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা ও সারাদেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিমা (EIS) সম্প্রসারণ, অফিস ও কারখানায় কাজ করা নারীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক বিমা চালু করা এবং বিধবা ও বয়স্ক নারীদেরকে সর্বজনীন অবসরভাতা-ব্যবস্থায় আনার ও প্রয়োজনে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া।

[203] contributory

১৪.৩.১.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৪.৩.১.২.১ আগামী বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

ক) ২০২৫/২৬ সালের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা-সুবিধার হিসাবের জন্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব সকল ভাতা/কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করে মাথাপিছু বরাদ্ধ একটি গ্রহণযোগ্য পরিমাণ হয়।

খ) বিশেষ করে ভর্তুকি দিয়ে খাদ্য-বিক্রয়সহ যে-কোনো সামাজিক নিরাপত্তা-সহায়তা মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ্ধতিতে সরবরাহ করা উচিত। খাদ্যসহায়তা-কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে,

i. খাদ্য-বিক্রয়ের স্থানের সংখ্যা ও কার্যদিবস বৃদ্ধি করা,

ii. বিভিন্ন কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর কাজের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খাদ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা,

iii. নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা সারির ব্যবস্থা করা,

iv. উন্মুক্ত স্থানে নয় বরং নির্ধারিত দোকানের মাধ্যমে খাদ্যসহায়তা সরবরাহ করা, এবং

v. কম দামে খাদ্য-বিক্রির পরিবর্তে নগদ ভাতা বা ভাউচার-ব্যবস্থা চালু করা, যাতে মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করতে পারে।

১৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৪.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৪.৩.২.১.১ জেন্ডার-সংবেদনশীল জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা আইন।

ক) সকল নাগরিকের জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার আইন প্রণয়ন, বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী ও প্রবীণদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশু-সহায়তা ও বয়স্ক-সেবাসহ জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা থাকবে।

১৪.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১৪.৩.২.২.১ আসন্ন পরিমার্জিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা-কৌশলে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।

ক) গৃহস্থালি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিযুক্ত নারীদের জন্য একটি বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তারা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ও প্রসূতি ও প্রসবজনিত মাতৃত্বকালীন বিমা-সুবিধা, বেকারত্ব-ভাতা ও অবসর-ভাতা সুবিধা পেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনে সরকার থেকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যাবস্থা করা।

খ) বর্তমান প্রসূতি ও গর্ভবতী নারীর জন্য প্রচলিত ভাতাকে প্রসূতি, গর্ভবতী নারী ও নবজাতকদের জন্য একটি প্রসূতি ও প্রসবজনিত সহায়তা প্যাকেজে আনার বিধান করা, যাতে সমন্বিত অর্থ সহায়তা, পুষ্টিকর খাবার ও প্রসূতিসেবা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসকারী মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোতে জলবায়ু-সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জীবিকা, অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ, আগাম সতর্কতা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া।

ঘ) নীতিগত নির্দেশনার মাধ্যমে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার জনগণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা-সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য জরিপ, তথ্য ও আবশ্যক পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

১৪.৩.২.২.২ সামাজিক সুরক্ষা উপকারভোগিদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা।

ক) নিম্ন আয়ের শহুরে এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। ‘বস্তি’ শব্দের ব্যবহার পরিহার করা এবং নির্দিষ্ট এলাকার নাম বা ‘নিম্ন-আয়ের শহর এলাকা’ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। স্থানীয় ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে বাসিন্দাদের উৎসাহিত করা, যাতে তারা প্রতিনিধিত্ব পায় এবং তাদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। ভাড়াটিয়াসহ নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাসকারীদের বৈধ বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, যাতে তারা নাগরিক অধিকার (যেমন: পাসপোর্ট ও সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি) পেতে পারে।

১৪.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৪.৩.২.৩.১ উপকারভোগী নির্বাচন ও ভাতাপ্রদান-প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ।

ক) সামাজিক নিরাপত্তায় সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য একিভূত নিবন্ধন-ব্যবস্থাপনায় তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থা চালু করা। অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ সম্ভাব্য উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা জনগণ বাছাইতে অন্তর্ভুক্ত হন।

খ) সামাজিক সুরক্ষার আর্থিক ও অন্যান্য তথ্য জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে সংযুক্ত করা, যাতে উপকারভোগী শনাক্তকরণ ও বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়।

গ) সরকার থেকে ব্যক্তিকে সরাসরি অর্থপ্রদানের জন্য ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি ও আরও শক্তিশালী করা। এ ব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া। যাতে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার হয়।

১৪.৩.২.৩.২ অনুমোদিত কৌশল অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং ভাতার পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা।

ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ-প্রযুক্তির একীভূতকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা-কৌশল অনুসারে পরিকল্পিত সেবার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

খ) সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির উদ্ভাবন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন-সহযোগীদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি স্থাপন।

গ) প্রতি বছর বাজেট-প্রণয়নকালে মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস ও তা মোকাবিলায় ভাতার পরিমাণ পুনর্বিন্যাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪.৩.২.৩.৩ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও অভিযোগ-প্রতিকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

ক) সামাজিক সুরক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নারীসহ স্থানীয় জনগণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ-সংগঠন ও সুবিধাভোগীদের সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) সামাজিক সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কর্মসূচি-ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্বের ভূমিকা বৃদ্ধি করা এবং নারীদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত জেন্ডার-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

গ) সেবাদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহজ অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। স্থানীয় পর্যায়ে নারী-কেন্দ্রিক হেল্পডেস্ক, মোবাইলভিত্তিক অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা ও স্থানীয় নাগরিক-সমন্বয়ে কমিটি করে একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানো।

ঘ) নিবন্ধন, অভিযোগ-নিষ্পত্তি ও তথ্যপ্রচারের জন্য সহজ ডিজিটাল ও মোবাইল প্ল্যাটফর্ম তৈরি।

১৪.৩.২.৩.৩ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি সমন্বয় ও একীভূতকরণ।

ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মসূচির মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় ব্যবস্থা জোরদার করা, যাতে সামাজিক সুরক্ষা-কার্যক্রম একটি সুসংহত কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

খ) জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫-এর সুপারিশ অনুসারে, সকল ঝুঁকিগ্রস্থ নারী কল্যাণ-কর্মসূচি একীভূত করে একটি কর্মসূচিতে পরিণত করা, যাতে একই ব্যক্তির একাধিক সুবিধা ও দ্বৈতকরণ বন্ধ হয়। দক্ষতা-উন্নয়ন, জীবিকা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করার জন্য সকল দক্ষতা-উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে বাজার-চাহিদা অনুসারে আধুনিকায়ন করা।

১৪.৩.২.৩.৪ নারীদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান।

ক) সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচিতে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে জরুরি সেবার জন্য একটি বিশেষ জরুরি সহায়তা তহবিল তৈরি করা, যা সহিংসতার শিকার নারীদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা পুনর্বাসন ও নিরাপদ আশ্রয় দিতে ব্যবহার করা হবে। এ তহবিল যেন সরকারি সেবাকেন্দ্র ও স্থানীয় নারী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সরাসরি বিতরণ করা হয়, তা নিশ্চিত করা। উন্নত ডিজিটাল ট্র্যাকিং-ব্যবস্থা চালু এবং নাগরিক তদারকির মাধ্যমে তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

খ) সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের কর্মস্থলে শিশু-দিবাযত্নের কথা বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সহায়তা ও তদারকি জোরদার করতে হবে। এটি নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে করা যেতে পারে, কারণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশে শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ২০২১ সালে 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন' প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৪.৩.২.৪.১ বিশেষ অবস্থার জন্য কার্যকর সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ক) মহামারি বা অন্য কোনো সংকটের কারণে নিম্ন-আয়ের সহায়তা শুধু নগদ অর্থ প্রদান, উপকরণ সহায়তা বা কম দামে খাদ্য-বিক্রিতে সীমাবদ্ধ না রেখে এতে জীবিকার পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবেলার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং সামগ্রিক সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা রাখা, যেমন:

i. বেকারত্ব বিমা ও অন্যান্য সুরক্ষাব্যবস্থা চালু করা;
ii. জীবিকার উন্নয়নে বাজার-চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
iii. নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা।

খ) শুধু পোশাক শ্রমিকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা বিমা সংক্রান্ত কর্মসূচি[204] অন্যান্য খাতেও সম্প্রসারিত করা। এ ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক খাত থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য চালু করা।

গ) নীল অর্থনীতি ও সামাজিক সুরক্ষার সাথে এর সংযোগ, নগর ও জলবায়ু-প্রভাবজনিত শ্রমজীবীদের আঘাত বা দুর্যোগ-প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক সুরক্ষা এবং "কেউ পিছিয়ে থাকবে না"—পদ্ধতির সমন্বয়ে ২০২৬-এর পরবর্তী সামাজিক সুরক্ষার জন্য একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করা।

১৪.৩.২.৪.২ সামাজিক সুরক্ষা-বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

ক) সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দ জীবনচক্রভিত্তিক প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যাতে সময়মতো সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। গর্ভধারণ, প্রাথমিক, শৈশব ও স্কুল বয়সের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, যাতে শিশু মানবসম্পদ হিসেবে উন্নত হয়ে কর্মক্ষম বয়সের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে এবং ভবিষ্যতে নিজেদের বার্ধক্যকালীন যত্ন নিশ্চিত করতে পারে।

[204] Employment Injury Scheme (EIS)

১৪.৩.২.৪.৩ শহরে নমনীয় সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ক) যেহেতু নগর-দারিদ্র্য বহুমাত্রিক ও গতিশীল, নগর-দরিদ্রদের জীবনচক্রভিত্তিক চাহিদাগুলো মোকাবিলায় বিভিন্ন নগর-প্রেক্ষাপটে মানানসই নমনীয় ও পদক্ষেপ গতিশীল করা। শহরের দারিদ্র্য ও অভিবাসনে মনোযোগ রেখে ভাসমান নারী, কিশোরী, যৌনকর্মী ও অন্যান্যদের উপযোগী আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়ক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।

খ) সামাজিক সুরক্ষার আওতায় দরিদ্র নারীদেরকে এলাকাভিত্তিক জনসম্পৃক্ত মানসম্মত সেবা, কম খরচে শিশু ও প্রবীণদের সেবায় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া,[205] যাতে নারীরা নিশ্চিন্তে কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারে। এতে দরিদ্র নারীদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা হবে।

১৪.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

ক) সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ধাপে ধাপে একটি সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তি[206] নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া, যা জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা ও আয়-নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এতে ধীরে ধীরে এমন একটি সামাজিক সুরক্ষা স্তরে পৌঁছানো যাতে জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা ও আয়-নিরাপত্তায় সর্বজনীন প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

খ) সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

[205] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদারকিতে বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে

[206] social protection floor

পঞ্চদশ অধ্যায়: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ণ ও প্রকাশ

গণমাধ্যম হোক নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার

১৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গণমাধ্যম সমাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত করে এবং এখানে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আচার-আচরণ ও ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করে। তাই গণমাধ্যমে নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক উপস্থাপন অথবা নারীদের হেয় করে উপস্থাপন পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতাকে উৎসাহিত করে।[207] সুতরাং গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন, নারী-পুরুষের সমতার চিত্রায়ণ এবং সর্বোপরি জেন্ডার-সংবেদনশীল উপস্থাপনা নারীর অধিকার, মর্যাদা ও জেন্ডার-সমতা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত সময়ে গণমাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা, এসিড-সহিংসতা ও নারীর উপর সহিংসতার অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে ইতিবাচক বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা, জনপরিসরে মেয়েদের নিরাপদ অংশগ্রহণ এবং পরিবারে মেয়ে ও ছেলেশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্য একটি অসাধারণ প্রয়াস ছিল ‘মীনা’ চরিত্র নির্মাণ এবং পুস্তকাকারে ও এনিমেশন সম্প্রচার। বিভিন্ন সংবাদপত্র নারী-বিষয়ক আলাদা বিভাগ ও পাতা প্রকাশ করে এবং প্রথম সারির অনেক পত্রিকা নারী-অধিকার ও সফল নারীদের নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা সমাজে তাঁদের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন টেলিভিশন বিজ্ঞাপন ও ক্যাম্পেইনে নারীদের মাসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনায় উৎসাহিত করেছে। হাতেগোনা হলেও নারী কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র, যেমন—*মেঘমল্লার, রেহানা মরিয়ম নূর* নারীদের প্রতিকূল পরিবেশের সংগ্রামের গল্প বলেছে। গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্টের ২০২২ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, গণমাধ্যমে বিষয় ও সোর্স হিসেবে নারীর উপস্থাপন ২শতাংশ কমলেও রাজনীতি, শাসনকাঠামো ও অর্থনীতি বিষয়ক বিষয়বস্তুতে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা এখনো ২৫শতাংশ-এর নিচে।[208]

গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গণমাধ্যম-পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাসে নূরজাহান বেগম (*বেগম* পত্রিকার সম্পাদক) ও শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের মতো প্রথিতযশা নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তবুও, এ পেশায় নারীর অংশগ্রহণ প্রত্যাশার তুলনায় এখনো অনেক কম, বিশেষ করে শীর্ষ পর্যায়ের পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে সীমিত। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ[209] এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ১,০০০ নারী-সাংবাদিক রয়েছেন।[210] উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মোট সদস্যের মধ্যে নারী-সদস্য ১০ শতাংশেরও কম।[211] এ ছাড়া, মাত্র একজন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি টেলিভিশন নিউজরুমে কাজ করছিলেন। যদিও দেশে সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে কোনো লিঙ্গ-বিভাজিত পরিসংখ্যান নেই, তবে উপরোক্ত গবেষণা অনুসারে সারা দেশে সাংবাদিকদের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ নারী-প্রতিবেদক ও ১৪ শতাংশ সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার রয়েছেন।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধ ও ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বেশ কয়েকজন সাহসী নারী-সাংবাদিক রয়েছেন, যাঁরা অপরাধ, মানবাধিকার ও নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে প্রতিবেদকের কাজ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও কাজ করেছেন। এ ছাড়া ক্রীড়া সাংবাদিকতা পুরুষপ্রধান ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হলেও সেখানেও এখন নারী-ক্রীড়াসাংবাদিকরা কাজ করছেন। তাঁরা ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন, সরাসরি প্রতিবেদন ও ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করেন।

এ সকল অগ্রগতির পরেও গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন বিষয়ক অনেক বৈষম্য বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে বিদ্যমান বৈষম্য এবং তা দূরীকরণে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সুপারিশসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা, নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন ত্বরান্বিত করা, গণমাধ্যমে জেন্ডার-সংবেদনশীলতার চর্চা উৎসাহিত করা এবং একটি স্বাধীন, দক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ গণমাধ্যম গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

[207] Djerf-Pierre & Edström 2020
[208] MRDI, 2022
[209] Management and Resource Development Initiative (MRDI)
[210] MRDI, 2023
[211] Ibid
সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

১৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের কম নিয়োগ: বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতায় **১০-১২ জন পুরুষ-প্রতিবেদকের বিপরীতে মাত্র ১-২ জন নারী-সাংবাদিক** রয়েছেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, যেখানে নারীরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না বলে মনে করা হয়। একইসঙ্গে, সংবাদ সংস্থাগুলো নারী-সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা দেখায়, যা নারীদের এ পেশায় টিকে থাকা কঠিন করে তোলে। ফলে অনেক নারী সাংবাদিকতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন অথবা প্রবেশ করতে পারেন না।

নারী-সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা: যেসব নারী-সাংবাদিক পেশায় যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সাধারণত নারী, শিশু বা স্বাস্থ্য-বিষয়ক সংবাদ পরিবেশন করার সুযোগ দেওয়া হয়। অর্থনীতি, রাজনীতি, অপরাধ ও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় নারীদের কাজ করার সুযোগ সীমিত। এর কারণ ধরেই নেওয়া হয় যে, নারীরা এসব চ্যালেঞ্জিং বিটে কাজ করতে পারবেন না, যা মূলত পেশাগত সক্ষমতা বিবেচনার পরিবর্তে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের প্রতিফলন। এখানেও নিরাপত্তার অজুহাত দেওয়া হয়। নারীদের সংখ্যা কম থাকায় নারী ও শিশুদের সমস্যা (যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা), নারী-পুরুষ সমতা বিষয়গুলো উপস্থাপনে গুরুত্ব পায় না এবং যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় না।

উচ্চপদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর উপস্থিতি কম: সংবাদ সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। নিউজরুমে কোন সংবাদ কীভাবে ও কোথায় প্রকাশিত হবে, সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা নগণ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা, পরিচালনা বোর্ড, সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণ এবং প্রযোজক পদগুলোতে নারীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (২০২৩)-এর গবেষণা অনুযায়ী, যখন কোনো গণমাধ্যমে নারী বা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তখন ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রে সংবাদে নারীদেরকে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সীমিত: সাধারণভাবে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ কম। যেসব পদে নারীরা কাজ করছেন, যেমন ডেস্ক জব, সংবাদ-সঞ্চালনা বা উপস্থাপনা সেখানে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। পুরুষ সাংবাদিকরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা একই সুযোগ পান না। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান।

বেসরকারি খাতে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অনুপস্থিতি: বেসরকারি খাতে সাংবাদিকদের বেতনের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের বেতন কাঠামো থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইন পত্রিকার জন্য কোনো বেতন কাঠামো নেই। বেতন কাঠামো না থাকায় যে ধরনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়, তা এ পেশায় নারীর প্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করে।

নিয়োগপত্র ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার অভাব: নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরিচ্যুতির ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেখানে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি বঞ্চিত হন।

নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের অভাব: বেসরকারি খাতের গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রম আইন যথাযথভাবে মানা হয় না, ফলে নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা প্রকাশ করলে তাদের দুর্বল মনে করা হয় এবং 'চ্যালেঞ্জিং' কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে শিশু-দিবাযত্ন কেন্দ্র, প্রসূতি ও প্রসূতীকালীন ছুটি, নারীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুমসহ প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর বয়স, চেহারা ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে তার যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা পুরুষ সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গণমাধ্যম সম্পর্কিত পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব: যথাযথ ও পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়ার কারণে নারীর উপস্থাপন, গণমাধ্যম-পেশায় নারী-পুরুষের সমতার অবস্থা, নারী-দর্শকের চাহিদা এবং পেশাগত ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জিত হয় না। ফলস্বরূপ যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ নেই।

দুর্নীতি: রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক লাভের জন্য আইন বা নীতি অনুসরণ না করেই পত্রিকার লাইসেন্স ও বিজ্ঞাপন সার্টিফিকেশন দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ মাধ্যমগুলোর কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জায়গা তৈরি হয় না। পাশাপাশি অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। ফলে মানুষের ব্যাক্তিগত গোপনীয়তা, সম্মান, মর্যাদা এ বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং যথেচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি: অনেক প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকর নীতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেই, ফলে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পান না এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার নারী-কর্মীরা প্রতিবাদ করলে তাদের পেশাগতভাবে হুমকির মুখে পড়তে হয় অথবা চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।

নারীর উপস্থাপন বিষয়ক সমস্যা: গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীর উপস্থাপনায় এখনো বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান, যা নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর নিজস্ব গল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বরং তাকে যৌনবস্তু, পুরুষের উপর নির্ভরশীল কিংবা দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করা হয়। বিজ্ঞাপন, বিনোদন বিষয়বস্তু, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ধারাবাহিক নাটকে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা উপস্থাপন করা হয় না, যা নারী-সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাকে আরও সুসংহত করে এবং বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়।

যদিও মূলধারার সংবাদমাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব কিছুটা বেড়েছে, তবুও অনলাইন সংবাদ-পোর্টাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর প্রতি অবমাননাকর বিষয়বস্তুর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দর্শকসংখ্যা ও বিজ্ঞাপন-রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক ও যৌন সহিংসতা-সম্পর্কিত সংবাদ সংবেদনশীলতা ছাড়াই উপস্থাপন করা হয়, যেখানে ভুক্তভোগী নারীর নাম, ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা হলেও অভিযুক্তের তথ্য অনেক ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়। যদিও নীতিমালা অনুসারে, সহিংসতার শিকার নারীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আছে। এ ধরনের অনুশীলন শুধু ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে না, বরং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা শক্তিশালী করে।

এ ছাড়া, নারীদের পেশাগত ও সামাজিক অবদান যথাযথভাবে প্রচার করা হয় না, বিশেষত অভিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে তাদের শ্রম ও অর্জনকে উপেক্ষা করে মনগড়া বিষয় উপস্থাপন করা হয়, যেমন অভিবাসী নারী-শ্রমিক মাত্রই বিদেশে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞাপনে নারীর চিত্রায়ণও প্রায়শই সনাতনী লিঙ্গভিত্তিক ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে তাকে কেবল সেবাদানকারী, দক্ষ রাঁধুনি বা শারীরিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে মূল্যায়িত কর্মজীবী হিসেবে দেখানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নারীরা নানাবিধ সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যার মধ্যে সাইবার হয়রানি, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্যের অপব্যবহার অন্যতম। মিডিয়া তারকা কিংবা অন্যান্য পেশার নারীদের ব্যক্তিজীবনকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা এবং তাদের সম্মানহানিকর বিষয়বস্তু তৈরি করাও একটি প্রচলিত প্রবণতা। এগুলো নারী ও বিভিন্ন পেশায় নারীর ভূমিকা নিয়ে সমাজে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। অনলাইন গণমাধ্যমে এ ধরনের সহিংসতা, হয়রানি, ও সম্মানহানিকর আচরণের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। বিদ্যমান "*সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩*", যা একটি কালো আইন হিসেবে বিবেচিত, একদিকে যেমন বিষয়গুলো মোকাবিলার জন্য কার্যকর নয়, অপরদিকে উক্ত আইনটি রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এবং মানুষের বাকস্বাধীনতা রোধ করতে বহুল ব্যবহৃত। তাই উক্ত আইনের আলোকে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া বা নেওয়ার সুপারিশ করা আইনটিকে বৈধতা দেওয়ার সামিল, যা কাম্য নয়।

১৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৫.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৫.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৫.৩.১.১.১ গণমাধ্যম-চাকরি বিধিমালায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

ক) গণমাধ্যমকর্মী আইন ২০২২[212] এর খসড়া পর্যালোচনা করে বৈষম্যমূলক বিষয়বস্তু সংস্কার করা এবং নতুন আইন বাস্তবায়ন করা, যা সরকারি ও বেসরকারি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উক্ত আইনে কর্মীর নিয়োগপত্র, কর্মী ও নিয়োগদাতার মধ্যকার সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্মঘণ্টা, ন্যূনতম মজুরি ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা (প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রসূতি ও প্রসবজনিত ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, বিশ্রাম, অসুস্থতাজনিত ছুটি, চিকিৎসা-ভাতা, কর্মী এসোসিয়েশন ইত্যাদি) সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহের উল্লেখ রয়েছে।[213] এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় ও সুরক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) গণমাধ্যমকর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মজুরি বোর্ড গঠন এবং বর্তমান অর্থনীতিতে জীবনযাপনের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা। অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো তৈরি অথবা বিদ্যমান মজুরি বোর্ডের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করা।

গ) সরকারি ও বেসরকারি সকল গণমাধ্যমকর্মী (টেলিভিশন, অনলাইন পোর্টাল, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, পত্রিকা) সকলের চাকরির সুরক্ষার জন্য তাঁদের শ্রম আইন অথবা গণমাধ্যমকর্মী আইনের আওতায় আনা।

ঘ) গণমাধ্যমের জন্য যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১৫.৩.১.১.২ অনলাইন গণমাধ্যমের সুরক্ষা ও বাকস্বাধীনতা।

ক) গণমাধ্যমের নতুন দিকগুলোকে যেমন: সাইবার বা ডিজিটাল স্পেস, একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা। বিদ্যমান 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭'-কে পর্যালোচনা ও সংস্কার করা।

খ) গণমাধ্যমে ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রচারণা রোধের ব্যবস্থা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ এবং বাকস্বাধীনতা রোধ করে এ রকম আইন, যেমন 'সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩' বাতিল করা। তবে অনলাইন গণমাধ্যমে সাইবার বুলিইং, যৌন হয়রানি ও অন্যান্য জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ ও আলাদা আইন প্রণয়ন করা।

১৫.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

ক) জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪ কে সম্প্রসার করে সকল ধরনের গণমাধ্যমকে এই নীতিমালার আওতায় আনা।

খ) এই নীতিমালা পর্যালোচনার মাধ্যমে অস্পষ্ট পরিভাষা[214] যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে তা পরিহার করা এবং এমন বিধান বাদ দিয়ে হালনাগাদ করা।

গ) এ ছাড়া উক্ত নীতিমালায় সকল লিঙ্গ, বয়স, পেশা, ধর্ম, গোষ্ঠী, শারীরিক সক্ষমতা ও পরিচয়ের নারীদের সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ উপস্থাপনের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের উল্লেখ করা।

ঘ) সকল ধরনের নীতিমালায় নারী-পুরুষ সমতা ও সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং খেয়াল রাখা, যেন যে-কোনো অংশগ্রহণ ও সম্প্রচার নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক না হয়।

---

[212] Mass Media Employees (Conditions of Service) Act, 2022.

[213] Dr. Iftekharuzzaman. (2022). সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দেখুন।

[214] যেমন—নৈতিক অবক্ষয়, সুস্থ বিনোদন, জনস্বার্থবিরোধী, অশ্লীল, ধর্মীয় অনুভূতি, রাজনৈতিক অনুভূতি, শালীনতাপূর্ণ পোশাক

ঙ) সকল লিঙ্গের সমান অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক চিত্রায়ণ নিশ্চিত করতে লাইসেন্স প্রাপ্ত গণমাধ্যম সংস্থাগুলোতে সমতা, বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।

চ) 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণ করা। এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান অধ্যায়ের সুপারিশ দ্রষ্টব্য।

১৫.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৫.৩.১.৩.১ কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ক) কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের হাইকোর্ট নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটি গঠন করা।

খ) যৌন হয়রানি ছাড়াও কর্মক্ষেত্রসংক্রান্ত অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

গ) আইন অনুযায়ী নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা—প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি নিশ্চিত করা, শিশু-দিবাযত্নের ব্যবস্থা রাখা, নারীদেরকে দক্ষতা অনুসারে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা, নিয়মিত দক্ষতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্রের সব উপাদান প্রতিষ্ঠা করা।

১৫.৩.১.৩.২ গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

ক) নারী ও অন্যান্য লিঙ্গের বিদ্বেষী উপস্থাপনা, নেতিবাচক ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে—এমন ভাষা পরিহার করার লক্ষ্যে উপস্থাপনের ভাষা ও ধরন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পর্যায় থেকে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

খ) বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থাপন সংক্রান্ত একটি মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, সে জন্য পরিবীক্ষণ করা।

গ) নারী ও শিশুসহ যৌন বা লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার যেকোনো লিঙ্গের ভুক্তভোগী এবং বিচারিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষী বা অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশের উপর প্রতিবেদন সীমিত করতে বিচার বিভাগ কর্তৃক গণমাধ্যমের জন্য একটি অনুশীলন নির্দেশিকা জারি করা।

ঘ) সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে সংবাদ বা অন্যান্য যে-কোনো উপস্থাপনায় ভাষার ব্যবহারে সতর্ক থাকা;[215] জেন্ডার স্টেরিওটাইপ আচরণ, যেমন: ঘরের কাজ নারীর অথবা নারীরা ধূমপান করে না—এ ধরনের উপস্থাপনা করা থেকে বিরত থাকা।

ঙ) যে-কোনো উপস্থাপনায় অহেতুক নারীর প্রসঙ্গ টেনে নারীবিদ্বেষী বয়ান, বক্তব্য, ধারণা বা ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা।

চ) গণমাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য অথবা কাজ পাওয়ার জন্য নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহার না করা; নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করা, কাস্টিং কাউচ পরিহার করা এবং এ জন্য শাস্তির বিধান রাখা।

১৫.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৫.৩.১.৪.১ নারী-সম্পর্কে সমাজে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে গণমাধ্যম।

ক) 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪' অনুসরণ করে সকল ধরনের গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন বন্ধ করা এবং নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক উপস্থাপন বৃদ্ধি করা।[216]

---

[215] যেমন—ধর্ষিতা না লিখে ধর্ষণের শিকার লেখা, মহিলার বদলে নারী বলা

[216] যেমন - সমাজে নারীর সফল অবদানের স্বীকৃতি এবং প্রচার, ক্রীড়া ও গণমাধ্যম পেশাসহ অন্যান্য পেশায় জড়িত নারীদের সাফল্য, অভিবাসী নারী শ্রমিকের কাজ ও অবদান সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীদের উপর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন

খ) গণমাধ্যমে ভাষার ব্যবহার ও নারীর চিত্রায়ণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নিয়মিত এ বিষয়ক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা এবং অহেতুক নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা।

গ) সমাজে নারীর প্রতি যে বৈষম্য বিরাজ করছে এবং নারী যে নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, সে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা।

ঘ) অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে তাদের কাজ, জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান ও নিজ জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।

ঙ) সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিবাচক উপস্থাপন করা।

চ) প্রতিবন্ধী নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, অবস্থান ও প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করা এবং উপস্থাপনার ভাষা যেন তাদের প্রতি সম্মানজনক ও সংবেদনশীল হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

১৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৫.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) খবরের সত্যতা যাচাই করার নিয়ম করা; মিথ্যা খবর উপস্থানের জন্য শাস্তির বিধান রাখা।

১৫.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৫.৩.২.২.১ গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

ক) ব্যবস্থাপনা ও সকল পর্যায়ের কর্মীদের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নিয়মিত যাচাই করার পদ্ধতি প্রণয়ন করা। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের চর্চাকে উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

খ) গণমাধ্যমের প্রত্যেক শাখা ও স্তরে অন্তত ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.৩.২.২.২ গণমাধ্যম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ নারীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

ক) বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য একটি অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকাঠামো তৈরি করা।

খ) সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, তথ্য অধিদপ্তর, প্রেস কাউন্সিল ইত্যাদিকে আরও জেন্ডার-সংবেদনশীল করা। কর্তৃত্ব কাঠামো (চেইন অফ কমান্ড) অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা তৈরি ও নিশ্চিত করা।

গ) নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা 'সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪' অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে—এমন প্রতিষ্ঠানের ভালো চর্চা অনুসরণ করা যেতে পারে।

ঘ) জেন্ডার-সংবেদনশীল আচরণ-বিধি প্রণয়ন করা।

ঙ) নারীর ভাষায় নারীদের গল্প উপস্থাপন, নারীকেন্দ্রিক চরিত্র উপস্থাপন এবং কাস্টিং কাউচ কমানোর লক্ষ্যে নারী-নির্মাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ জন্যে প্রণোদনা প্রদান, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন, প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা।

১৫.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

ক) তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত করা।

খ) স্বচ্ছ ও স্বাধীন প্রচারমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও প্রযুক্তি স্থাপন।

গ) নিয়মিত অডিয়েন্স/ দর্শক-পাঠক সমীক্ষা করা (প্রেস, টিভি, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, প্রেস ইন্সটিটিউট, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ) ।

ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির দক্ষ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান উপস্থাপন।

ঙ) গণমাধ্যমকে শুধু বিনোদন নয়, শিখার ও তথ্যপ্রচারণার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের— যেমন: কৃষি, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান সময়োপযোগী করে তৈরি করা।

১৫.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৫.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) প্রযুক্তিভিত্তিক গণমাধ্যম বিস্তৃতি লাভ করতেই থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে আইনের কার্যকারিতা নিয়মিত যাচাই করে সময় উপযোগী করে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৫.৩.৩.২ নীতি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

ক) গণমাধ্যমের সকল ক্ষেত্রে নারীর বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি ও ইতিবাচক চিত্রায়ন নিশ্চিত হবে।

ষোড়শ অধ্যায়: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ

সমান মর্যাদায় হোক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারীর অংশগ্রহণ

১৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলাধুলা ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ নারীর মানসিক বিকাশ, আত্মবিশ্বাস তৈরি ও নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরিতে সহায়ক এবং সমাজে নারীদের চলাচল ও জনপরিসরে তাদের উপস্থিতিকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে, জনপরিসরে নারীকে দৃশ্যমান করে এবং তরুণী ও কিশোরীরা লিঙ্গভিত্তিক বাধা অতিক্রমে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের কিছু সাফল্য ও ভালো উদ্যোগ রয়েছে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে 'একুশে পদক' প্রদান এবং নারী ক্রিকেট দলকে 'অদম্য নারী' পুরস্কার প্রদান নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল দুইবার দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) নারী চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জয় করেছে। অন্যান্য পর্যায়ের ফুটবলেও একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়েছে। নারী ফুটবল দল ও ক্রিকেট দল ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে। তা ছাড়া ২০২৫ সালে এশিয়ান কাবাডি প্রতিযোগিতায় নারী দল ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। অন্যান্য দলগত ও ব্যক্তিগত খেলা, যেমন—ক্রিকেট, আর্চারি, ভারোত্তোলন, শ্যুটিং ও অ্যাথলেটিক্সে নারীরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছে।

সংগীত, নৃত্যকলা ও নাট্যকলায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে সাহিত্য, চিত্রকলা, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা এ সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি না পেলেও দৃশ্যমান হয়েছে। গত এক দশকে নারীকে মূল ভূমিকায় রেখে *আন্ডার কন্সট্রাকশন, রেহানা মরিয়ম নূর, শিমু-মেইড ইন বাংলাদেশ*-এর মতো চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ২০২০-২০২৪ এই ৫ বছরে মোট ১১ জন নারী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৩ জন নারী একুশে পদক পেয়েছেন।

১৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পূর্বের তুলনায় কমে গিয়েছে। অনেক নাচ, গান, ছবি আঁকা শেখার প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ সভায় জানা যায়, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। যেসব সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেখানে মুসলিম ধর্মের বাচ্চাদের সংখ্যা এবং ছেলে বাচ্চাদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমেছে। বাচ্চারা যদি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে সামাজিক দক্ষতা, বৈচিত্র্যময়তা, সহানুভূতি এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না এবং সমাজের বৈষম্যের কাঠামো পরিবর্তিত হয় না।

বেতন বৈষম্য ও বেতন কাঠামোর অভাব: ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য-অর্জনের পরেও নারী-ক্রীড়াবিদরা পুরুষ-ক্রীড়াবিদদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বেতন পান এবং পুরস্কারের অর্থের পরিমাণেও বৈষম্য বিদ্যমান। ২০২৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ার নারী-ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সেই নারী-ফুটবলাররা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ৩ মাস ছিলেন বেতনহীন। তাঁদেরকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হয় নাই। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নতুন চুক্তিতে একাদশে থাকলে ১০ হাজার টাকা ম্যাচ ফি নির্ধারণ করেছে, কিন্তু সেই ফি-ও বাকি ছিল দীর্ঘদিন (যূথী, ২০২২)। আবার ক্লাব-ফুটবলে নারী-খেলোয়াড়রা অনেক কম পারিশ্রমিক পান; ক্লাব-পর্যায়ে একজন শীর্ষ পর্যায়ের পুরুষ-ফুটবলারের বার্ষিক আয় ৫০-৬০ লাখ টাকা। সেখানে নারী-ফুটবলাররা সর্বোচ্চ ৩-৪ লাখ টাকা আয় করেন। বেতন-বৈষম্যের একই চিত্র পাওয়া যায় সংস্কৃতি-অঙ্গনেও। এখানে নারী ও পুরুষ সংস্কৃতিকর্মীর মধ্যে পারিশ্রমিকের বৈষম্য বিদ্যমান এবং এখানে দরকষাকষির সুযোগ নেই।

নারী ক্রীড়াবিদদের অর্জন কে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না এবং প্রাপ্য সম্মান দেয়া হয় না। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, যখন পুরুষ ক্রীড়াদল কোন শিরোপা জয় করে তখন তাদের অনেক সম্মাননা দিয়ে, অলংকারিত যানবাহনে করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো হয়; তাদের বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু নারী ফুটবল দলের ক্ষেত্রে একই আচরণ দেখা যায় নি। অনুর্ধ্ব-১৬ দলের খেলোয়াড়দের সাধারণ লোকাল বাসে করেই বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আবার যখন শিরোপা জয় উদযাপন করা হয়েছে সেখানে গাফেলতি ও নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।[217]

[217] Zaman, 2022.

নারীদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও আর্থিক অনিশ্চয়তা: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি—উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদেরকে গুরুত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পুরুষ-ক্রীড়াবিদদের সাথে তুলনামূলক বিচারে নারী-ক্রীড়াবিদরা সুযোগ-সুবিধা ও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন না। নারীদের জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রকে পেশাদারি মঞ্চ হিসেবে এখনো ভাবা হয় না। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা পার হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করলেও পর্যাপ্ত বেতনকাঠামো ও প্রণোদনা না থাকার কারণে অনেককেই ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে দিতে হয়। যে বেতন তাঁরা পান, সেটা দিয়ে একজন ক্রীড়াবিদের পর্যাপ্ত পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না এবং তার জীবনযাপনের অন্যান্য খরচ বহন করাও সম্ভব হয় না। এমনকি চাকরিরত খেলোয়াড় ব্যতীত গর্ভাবস্থায় খেলোয়াড়রা কোনো ভাতা পান না, যা দিয়ে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির খরচ বহন করতে পারবেন।[218] আর এ কম বেতন ও প্রণোদনার পেছনের কারণ হিসেবে দেখানো হয় যে, নারীদের ম্যাচে দর্শক কম হয়, পৃষ্ঠপোষক কম পাওয়া যায়। আবার, ক্রিকেটের প্রতি বেশি মনোযোগের কারণে অন্যান্য খেলায় আর্থিক বরাদ্দ ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা যথাযথ নয়।[219] খেলোয়াড় হিসেবে যাঁরা চাকরি পান, তাঁদের বেতন ও আয় একজন ক্রীড়াবিদের প্রয়োজনীয় জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়, যা ক্রীড়াক্ষেত্রে টিকে থাকতে নিরুৎসাহিত করে।[220] জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে জেলা মহিলা ক্রীড়াসংস্থাগুলোকে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয় না। অপর্যাপ্ত বার্ষিক অনুদানের কারণে কোনো বড়ো ক্রীড়া অনুষ্ঠান করতে গেলে জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ কিংবা কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছে স্পন্সরশিপের জন্য ধরনা দিতে হয়।

নারী-সংস্কৃতিকর্মীদের জন্যও যথেষ্ট আর্থিক প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। ফলে এটিকে উপার্জনক্ষম পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং দেখা হয় শখ বা অতিরিক্ত একটি গুণ হিসেবে, যা নারীকে বিয়ের পাত্রী হিসেবে আরও বেশি যোগ্য করবে। যারা প্রতিবন্ধকতা পার করে টিকে থাকে তাদের সকলের উপার্জনও, বিশেষ করে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে, জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার যথেষ্ট প্রণোদনা না থাকার কারণে অনেক সময় নিজের খরচে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়। এটি অনেক নারীর জন্যই সম্ভব হয় না।

সাংগঠনিক কাঠামোতে পুরুষের আধিপত্য: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটিগুলোতে পুরুষ-সদস্যদের আধিপত্য রয়েছে। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক পদগুলোতে নারীদের অবস্থান নগণ্য বা নেই বললেই চলে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগ পুরুষ, দুয়েকজন নারী-সদস্য থাকেন, যাদের আলংকারিক রূপে রাখা হয়। নারী-সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা বা নারীদের বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ নেই, যা নারীদের সমান অংশগ্রহণের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা।

ক্রীড়াসংগঠনগুলোতেও একই চিত্র দেখা যায়। অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত যে সকল খেলা রয়েছে, তাদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি[221] এর নির্দেশনা মেনে চলার একটা দায়বদ্ধতা আছে। সকল খেলায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালে IOC নির্দেশনা দেয় যে, প্রতিটি খেলার ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ৩০শতাংশ নারী রাখতে হবে। যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবে মানা উচিত হলেও মানা হচ্ছে না।

রাজনৈতিক নিয়োগ ও পদায়ন: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন[222] অনুযায়ী সভাপতিসহ কমিটির বেশির ভাগ সদস্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবেন। এর বাইরে খেলোয়াড় বা ক্রীড়ার সাথে যুক্ত যাঁরা সদস্য হতে পারবেন, তাঁদের সংখ্যা নগণ্য এবং মাত্র দুজন নারী-সদস্য থাকার কথা উল্লেখ আছে। আবার এ পদগুলোতে সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক দল বা ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়া যাবে—এমন মানুষদের নেওয়া হয়। ফলে একদিকে তারা ক্রীড়ার উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করেন না, অপরদিকে তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী-খেলোয়াড় আসতে উৎসাহিত হয় না। কারণ প্রশাসনিক ব্যক্তি স্থানীয় খেলোয়াড়দের সাথে সেই সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, যেখানে খেলোয়াড় তার ভালো-মন্দ আলোচনা করতে পারবে। অপরদিকে পরিবার থেকে নারীদের ক্রীড়াতে অংশগ্রহণের বাধা দূর করার ক্ষেত্রেও প্রশাসন ভূমিকা রাখতে পারে না। একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় অথবা একজন সংগঠক যেভাবে ক্রীড়ার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাস্তবিক উদাহরণ দিতে পারেন, উপার্জনের মাধ্যম ব্যাখ্যা করতে ও ভালো উদাহরণগুলো পরিবার ও সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তা প্রশাসনের মানুষ পারে না। সে জন্যে এ পদগুলোতে প্রাক্তন খেলোয়াড়,

[218] অর্থের অভাবে যথাযথ চিকিৎসা না পেয়ে নারী ফুটবলারের মৃত্যুর উদাহরণ রয়েছে (Sardar, 2024)।

[219] আহম্মেদ, ২০২৪a.

[220] আহম্মেদ, ২০২৪b.

[221] International Olympic Committee (IOC)

[222] জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮।

সংগঠক নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি ফেডারেশনে ও এসোসিয়েশনে অখেলোয়াড় নারী ও পুরুষদের নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা ওতপ্রোতভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। ফলে একদিকে তারা খেলোয়াড়দের সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজন বুঝতে পারে না, অপরদিকে নিবেদিতপ্রাণ সংগঠকেরা বঞ্চিত হয়।

নারী-ক্রীড়া দলের সাথে নারী-ম্যানেজার ও ফিজিওথেরাপিস্টের অভাব: নারী-ক্রীড়াদলের সাথে পুরুষ-ম্যানেজার দিলে নারী-খেলোয়াড়রা তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা খুলে বলতে পারে না। ফিজিওথেরাপিস্ট পুরুষ হলে এবং কোনো নারী-ম্যানেজার না থাকলে তখন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। দলের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে সেটাও বলতে পারে না। এ ছাড়া দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফিজিওথেরাপিস্ট নেই এবং ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের জন্য দেশের বাইরে শরণাপন্ন হতে হয়।[223]

প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড় ও সংস্কৃতিকর্মীরা অবহেলিত: আর্থ-সামাজিকভাবে প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড়রা পিছিয়ে থাকে। তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল এবং যা আছে, তা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্তরা পেয়ে থাকে। প্রাক্তন সংস্কৃতিকর্মীরাও কোনো ধরনের ভাতা বা সুযোগ-সুবিধা পান না। অনেকের কাজের স্বীকৃতি নেই।

নারী ও পুরুষ ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে সক্ষমতার ঘাটতি ও ভারসাম্যের অভাব: জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে ফেডারেশন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর গঠনতন্ত্র অন্য সকল ফেডারেশনের মতো। সকল ক্রীড়া ফেডারেশন জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আন্তঃজেলা ও আন্তঃবিভাগীয় টুর্নামেন্ট অথবা বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারলেও জাতীয় পর্যায়ে তাদের আয়োজনের সক্ষমতা নেই। আবার সমন্বয়ের অভাব থাকায় জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রায়শই টুর্নামেন্টে নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড় পাঠিয়ে দেয়। ফলে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আওতায় থাকা অনেক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা এবং নিরাপত্তার অভাব: ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। নিজ গ্রাম/মহল্লা/শহরের বাইরে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গেলে নারী-ক্রীড়াবিদরা অনিরাপত্তায় ভোগেন। বিশেষ করে পার্বত্য ও অন্যান্য প্রান্তিক এলাকার নারীদের প্রতিযোগিতা বা প্রশিক্ষণের জন্য নিজ এলাকা থেকে দূরে যেতে দিতে পরিবার রাজি হয় না। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী-ক্রীড়াবিদদের জন্য নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নেই।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নেই এবং নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার এ ক্ষেত্রের কাজের ধারা অনুযায়ী কাজ শেষ করে ফিরতে প্রায়শই অনেক রাত হয়ে যায়। রাস্তাঘাট, গণপরিবহণ ও জনপরিসরে নারীর নিরাপত্তা না থাকায় এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসতে পরিবার থেকে নারীকে বাধা দেওয়া বা নিরুৎসাহিত করা হয়।

দুইটি পেশাতেই নারীকে পুরুষ আধিপত্যের ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহত্তর জনপরিসরে চলাফেরা ও মেলামেশা করতে হয়। ফলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির নারী-সম্পর্কে প্রায়শই নেতিবাচক ধারণা করা হয়। তাদের চরিত্র হনন করে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীল ভাষায় (মিমস, ট্রল) আক্রমণ এবং ধর্মীয় ও নৈতিক খবরদারি করা হয়। এ ছাড়া নারীদের অংশগ্রহণে বাধা প্রদানের জন্য দলবদ্ধ সন্ত্রাস করে শারীরিক আঘাতও করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে এলাকাভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার গণমাধ্যমে নারীদের যৌনবস্তু হিসেবে এবং নারীবিদ্বেষী উপস্থাপন নারী-ক্রীড়াবিদ ও সংস্কৃতিকর্মী-সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে।

উভয় ক্ষেত্রে নারীর অবদান ও অর্জন সম্পর্কে প্রচারণার অভাব: ক্রীড়াতে নারীর অর্জন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আলোচনা হলেও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর অর্জন ও অবদান-সম্পর্কে প্রচারণা নেই। ফলস্বরূপ নারী এ সকল ক্ষেত্রে কী কাজ করে থাকে সে বিষয়ে জনসচেতনতা নেই। এ সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব থাকায় লিঙ্গ বিভাজিত তথ্য, এলাকা বিভাজিত তথ্য, প্রয়োজন ও ঘাটতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান নেই।

উপরিউক্ত সবগুলো কারণই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য টেকসই করে।

[223] আহম্মেদ, ২০২৪a. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।

১৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৬.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৬.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৬.৩.১.১.১ ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া আইনে নারী-পুরুষের সমতা।

ক) সকল পর্যায়ের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড ও কাঠামোতে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে উল্লেখ করে 'জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮' সংশোধন করা।

খ) জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া পরিষদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থায় নারী-প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির বিধান প্রণয়ন।

গ) পার্বত্য এলাকা ও অন্যান্য প্রান্তিক (ভৌগলিকভাবে দুর্গম ও প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ) এলাকার কিশোরীদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিধান রেখে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০' সংশোধন করা।

১৬.৩.১.১.২ সাংস্কৃতিক চর্চা বৈষম্যহীন ও স্বাধীন করা।

ক) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাংস্কৃতিক চর্চায় নারীর অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নারীদের উপস্থাপন এবং নারী-শিল্পীদের উপস্থিতি যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং হয়রানি, ঘৃণ্য বক্তব্য ও সহিংসতার সম্মুখীন হলে তার প্রতিকার পাওয়ার জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কিংবা অনলাইন মাধ্যমে নারীর সুরক্ষার জন্য আইন করা। একই আইনে আদিবাসী সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি যেন নিরাপদ ও বৈষম্যহীন হয়, তা অন্তর্ভুক্ত করা। গণমাধ্যম অধ্যায়ের আইনগত সুপারিশমালায় বর্ণিত অনলাইন মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা-প্রতিরোধে বিশেষ আইনে এ সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১৬.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

১৬.৩.১.২.১ ক্রীড়াসংস্থাগুলোর কাঠামোগত পরিবর্তন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন।

ক) সকল ক্রীড়া ফেডারেশন ও সংস্থায় সদস্য হিসেবে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্তি বন্ধ করতে নীতিমালা প্রণয়ন করা।

খ) 'জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩'-এর খসড়া অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করা, যাতে ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং নীতিমালায় বর্ণিত বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে মানসম্পন্ন ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি হয়।

গ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্ট পরিচালনা ও আয়োজনের ক্ষমতা দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা, যাতে এ সংস্থার আওতায় থাকা মানসম্পন্ন খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

১৬.৩.১.২.২ সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে নীতিমালা সংশোধন।

ক) সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সকল ধর্ম, বয়স, জনগোষ্ঠী ও পরিচয়ের নারী ও মেয়েশিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিরাপদ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতা তৈরির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রযুক্তিভিত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা-বিষয়ক নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি-সম্পর্কিত অংশের ভাষা পরিমার্জন করে 'জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬' সংশোধন করা।

খ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন, যাতে কর্মক্ষেত্র নারীবান্ধব হয় এবং বিভিন্ন বৈষম্য নির্মূল করা যায়।

১৬.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৬.৩.১.৩.১ ক্রীড়াসংস্থার কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতা।

ক) সকল ক্রীড়াতে নারী ও পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যকার বেতনবৈষম্য দূর করা; বর্তমান বেতনকাঠামো পর্যালোচনা ও খেলোয়াড়দের জীবনমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করে জাতীয় বেতনকাঠামো তৈরি করা।

খ) খেলোয়াড় নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য গ্রহণ ও কমিটি তৈরি করা।

গ) পেশাদার শিল্পীদের জন্য চুক্তিপত্র আবশ্যক করা, যেখানে তাদের দায়িত্ব, কার্যপরিধি, অধিকার ও আইনি সুরক্ষা বর্ণিত থাকবে।

ঘ) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় অলিম্পিক পরিষদ ও অন্যান্য পর্যায়ের ক্রীড়া পরিষদের কাঠামোতে ৩০শতাংশ নারী-প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

ঙ) এডহক কমিটিগুলোকে ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান খেলোয়াড়রা শিখতে ও সুবিধা পেতে পারে।

চ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কমিটিতে, বিশেষ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ-পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ছ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা পর্যায়ের ফেডারেশনের সাথে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সমন্বয় বৃদ্ধি করা, যাতে মানসম্পন্ন ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসতে পারে।

১৬.৩.১.৩.২ ক্রীড়াতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।

ক) ক্রিকেট ও ফুটবলের বাইরের খেলায়, বিশেষ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের খেলায়—যেমন: আর্চারি, সাঁতার, ভারোত্তলন, টেনিস, এথলেটিক্সে নারী-খেলোয়াড় টিকিয়ে রাখা এবং উন্নয়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে খেলোয়াড়দের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

খ) সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় পর্যায়ের নারী-খেলোয়াড়দের মাসিক ভাতা প্রদান এবং তাদের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করা।

গ) ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে নারীদের বিনামূল্যে খেলার সরঞ্জাম ও পোশাক প্রদান।

ঘ) বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, স্বীকৃতি, সহায়তা—এসব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা।

১৬.৩.১.৩.৩ ক্রীড়াক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা এবং নারীবান্ধব ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি।

ক) নারীর জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে সকল পর্যায়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি অভিযোগ কমিটি গঠন এবং সেটি কার্যকর হয়েছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের টুর্নামেন্ট আয়োজনে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের মাধ্যমে নারীদের টুর্নামেন্ট বন্ধ করার প্রচেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করা।

১৬.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৬.৩.১.৪.১ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ সমতা।

ক) নারী ক্রীড়া দলের জন্য বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।

খ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া, যেমন—জুডো, কারাতে, ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা। প্রয়োজনে এলাকার ক্রীড়া ক্লাবের সাথে সমন্বয় করে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ ব্যবহার করা এবং এজন্য সাপ্তাহিক তালিকা করে নারী ও মেয়েশিশুদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি এটি মানা হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাসা) সংস্কৃতিচর্চা বাধ্যতামূলক করা; এটি পাঠ্যক্রমের অংশ হতে পারে, যা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিতে মূল্যায়িত হবে এবং এমপিও বরাদ্দ পাওয়ার শর্ত হিসেবে বিদ্যালয়সমূহে এ চর্চা নিশ্চিত করা।

ঘ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক নারী-ক্রীড়া টুর্নামেন্ট চালু রাখা এবং টুর্নামেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; এ জন্য সরকার থেকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা।

ঙ) শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একডেমি কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং এ জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।

চ) এলাকাভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা; এ সংগঠনগুলো এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, যেমন—পথনাটক, শীতকালীন নাটক, নাচের অনুষ্ঠান, বইপড়া কর্মসূচি ইত্যাদি আয়োজন করবে এবং কার্যক্রমে নারী, শিশুসহ সকলের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করবে। এতে সামাজিক সহনশীলতা তৈরি হবে। সংস্কৃতিসংক্রান্ত সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা।

ছ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নারী-নির্মাতা, নারী লেখক (সংলাপ রচয়িতা, নাটক-নাটিকা ইত্যাদি) ও নারী-শিল্পীদের প্রণোদনা ও অনুদান প্রদান।

১৬.৩.১.৪.২ ক্রীড়াক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

ক) আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক এলাকার নারীদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

খ) বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী মেয়েশিশুদের জন্য ক্রীড়া-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) বয়স্ক নারী[224], প্রতিবন্ধী মেয়েশিশু, কিশোরী ও তরুণীদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

১৬.৩.১.৪.৩ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ-সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

ক) গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ডিজিটাল ও অনলাইন) সফল নারী-ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নারীদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরা।

খ) নারীদের খেলাধুলার গুরুত্ব ও উপকারিতা-সম্পর্কে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

গ) প্রশিক্ষিত নারী-ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও সাফল্য অর্জনকারীদের জন্য সরকারি স্বীকৃতি, সার্টিফিকেশন ও নিবন্ধন প্রদান করা।

১৬.৩.১.৪.৪ আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

ক) আদিবাসী ও মূলধারার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি পরিচালনা, যেখানে একে অপরের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ নিয়ে কাজ করবে।[225]

খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি এবং আদিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

---

[224] বয়স্ক নারীদের জন্য কোন ধরণের শারীরিক ব্যায়াম, খেলাধুলা কর্মসূচি নেই; ফলে তারা সামাজিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে যায়। এটি শুধু যে নারীর চলাফেরা বন্ধ করে তা নয়, পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এর মত অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

[225] যেমন—বাঙালি চাকমা ভাষার গান গাইবে, আবার আদিবাসী একজন শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত গাইবে

১৬.৩.১.৪.৫ অন্যান্য প্রান্তিক নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি ও বিশেষ সুবিধা প্রদান।

ক) সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েশিশুদের অভিগমন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা প্রদান ও সচেতনতা তৈরি।

খ) দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও আহত নারী-সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা/ভাতা প্রদান।

গ) নারী-পরিচয়ের সকলকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রাখা ও অন্তর্ভুক্তিচর্চার বিষয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরা, যাতে সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১৬.৩.১.৪.৬ বৈষম্য ও নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ।

ক) নারীর উপর সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে সরব হওয়ার জন্য ইতিবাচক সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) প্রচার ও চর্চা।

খ) সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং তাঁদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে এমন বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে প্রচারণা এবং নারীদের ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা।

১৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৬.৩.২.১ প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত-

১৬.৩.২.১.১ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ।

ক) জেলা পর্যায়ে, বিশেষ করে পার্বত্য ও অন্যান্য প্রান্তিক এলাকায় নারীবান্ধব ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং নারী-খেলোয়াড়দের জন্য খাওয়াখরচসহ নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা;[226] এ জন্যে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

খ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েশিশু ও নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন এবং নারী-কোচ নিয়োগ বৃদ্ধি করা।

গ) নারীদের জন্য বিশেষায়িত ক্রীড়া ক্লাব তৈরি করা।

ঘ) প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী-ক্রীড়াশিক্ষক নিয়োগ।

ঙ) শিল্পকলা একাডেমি বা শিশু একাডেমি ভবনগুলো ব্যবহার করে প্রতিটি জেলায় সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্র তৈরি। যেখানে অবকাঠামো রয়েছে, সেগুলো চালু করা; যেখানে নেই, সেখানে তৈরি করা এবং পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা।

১৬.৩.২.১.২ ক্রীড়াক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা ও নারীবান্ধব ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি করা।

ক) নারী ক্রীড়া দলের সাথে নারী-ম্যানেজার দেওয়া আবশ্যক করা এবং দলের সাথে বিদেশের টুর্নামেন্টে প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড় ও সংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া।

খ) প্রতিটি নারী ক্রীড়া দলের সাথে অন্তত একজন নারী- ফিজিওথেরাপিস্ট রাখা আবশ্যক করা এবং এজন্যে খেলাধুলা বিষয়ে দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

গ) ক্রীড়ার অবকাঠামো যেমন – স্টেডিয়াম, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নারীবান্ধব করা, নারীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম ও শাওয়ার, আলাদা ড্রেসিং রুম, বিশ্রামের জায়গা ইত্যাদি।

ঘ) সকল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের নারী ও মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

[226] এ ক্ষেত্রে রাঙামাটির ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, যেখানে খাদ্যখরচসহ আবাসনের ব্যবস্থা করায় জাতীয় নারী ফুটবল দলে খেলোয়াড়রা উঠে আসতে পেরেছে।

১৬.৩.২.১.৩ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

ক) স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে সফল নারী ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সফল নারীদের সম্পর্কে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য, অবদান এবং অংশগ্রহনের ফলে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা।

১৬.৩.২.২ কর্মসূচিসংক্রান্ত-

১৬.৩.২.২.১ ক্রীড়াক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ-সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

ক) পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে মেয়েশিশুদের ক্রীড়াচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিবার, সমাজ (ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ক্ষমতাশীল, তরুণ অধিকারকর্মী ও উদ্যোক্তা) ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে নিয়ে সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

খ) সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বয়স্ক পুরুষ শিল্পীদের অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ থাকলেও বয়স্ক নারী শিল্পীদের সুযোগ সীমিত। তাই বয়স্ক নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কর্মসূচি গ্রহণ এবং অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

গ) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

ঘ) একজন একাকী (সিঙ্গেল) নারীর জীবন সংগ্রামের গল্প ইতিবাচকভাবে চিত্রায়ন করা। যেমন – *রেহানা মরিয়ম নূর* চলচ্চিত্র।

ঙ) তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া কর্মসূচি চলমান রাখা এবং পরিসর বৃদ্ধি করা।

১৬.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৬.৩.৩.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

ক) যে সমস্ত জেলা ও উপজেলায় নারীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা আছে সে সমস্ত জেলা বা উপজেলায় নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য পর্যায়ক্রমে খাদ্যসহ আবাসনের ব্যবস্থা এবং তাদের অনুশীলনের জন্য মাঠ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নারীর উজ্জ্বল অবদান ,অবাধ ও নিরাপদ অংশগ্রহণ , ও স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়: নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়

জলবায়ু ন্যায়বিচারে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক

১৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির দিক থেকে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে, তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ-সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে কাজ হচ্ছে।[227] ২০০৯ সালে গৃহীত 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা'[228] তৈরির পর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেশ কিছু নীতিমালা ও কৌশল নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা[229], জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা[230], জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা[231] সহ বেশ কয়েকটি নীতি ও কৌশল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা কেবল একটি লক্ষ্য নয়, বরং নারীরা জলবায়ু-সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি—এ উপলব্ধির ভিত্তিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়[232] ২০১৩ সালে প্রথম 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনা'[233] প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, পানিসম্পদ, জ্বালানি, স্বাস্থ্য ও জীবিকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে লিঙ্গ-সংবেদনশীল দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে দ্বিতীয় জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ ২০০০ সালের পর থেকে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়াশীল (Reactive) পদ্ধতি থেকে দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস[234] কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। বহু দাতাসংস্থা-সমর্থিত সমন্বিত দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি[235] দুটি পর্যায়ে (২০০৪-২০১০) পরিচালিত হয়, যা দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরিতে ভূমিকা রাখে। দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে দুর্যোগে নারীদের ভূমিকার বিষয়টি সংযোজন করা হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে "দুর্যোগে নারী" নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। তবে, বেশির ভাগ নীতিমালায় নারীদের শুধু দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও নব্বই দশকের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্যোগের সময় পরিবারের টিকে থাকা ও পুনরুদ্ধারে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[236] দুর্যোগব্যবস্থাপনা নীতিতে- জেন্ডার-বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে লেখা একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে যে ,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিতে-জেন্ডার বিষয়ক সমস্যা-সমাধানের জন্য অনেক বিষয় এখনো প্রয়োজন।[237]

দুর্যোগ-মোকাবিলায় নারীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের টিকে থাকার এবং জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা শুধু দুর্যোগের শিকার নন, বরং তারা সংকট-মোকাবিলা ও জীবনধারণের জন্য প্রধান অবদানকারী।

হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন (২০০৫-২০১৫)[238] গৃহীত হওয়ার সাথে বাংলাদেশের দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনায় নতুন দিক উন্মোচিত হয়। তবে, এ কাঠামোতে নারীদের বা জেন্ডারভিত্তিক বিষয়গুলো অগ্রগণ্য হয়নি। পরবর্তীতে সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৬-২০৩০)[239] -এ জেন্ডার ও দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশও SFDRR-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাগুলো সংশোধন করেছে। ২০১৯ সালে সংশোধিত দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি[240] এ জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচিত হয়।

---

[227] Eckstein, Künzel, & Schäfer, 2021. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[228] Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP).
[229] National Adaptation Plan.
[230] National Plan for Disaster Management.
[231] National Biodiversity Strategy and Action Plan.
[232] Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEFCC).
[233] Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan (BCCGAP).
[234] Disaster Risk Reduction (DRR).
[235] Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP).
[236] Nasreen, 1995. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[237] Hasan, Nasreen, & Chowdhury 2019. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য।
[238] Hyogo Framework for Action 2005-2015.
[239] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2016-2030.
[240] Standing Orders on Disaster (SOD).

১৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ১৮৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তন দুই প্রকার: ১) যা ধীরে ধীরে শুরু হওয়া পরিবর্তন এবং ২) যা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট চরম দুর্যোগ-অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উভয়ই দেশটির কষ্টার্জিত উন্নয়ন-সফলতাকে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। পূর্বাভাস আছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে কৃষির জিডিপির এক-তৃতীয়াংশ হারিয়ে যাবে, এক কোটি ত্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে পারে এবং একটি গড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বছরে প্রায় একশ কোটি ডলার ক্ষতি হতে পারে। এসব পরিবর্তনের পাশাপাশি—চরম অবস্থা ও দুর্যোগ—আকস্মিক বন্যা ও তাপপ্রবাহ ছাড়াও অনেক কম ঘটনাবহুল, ধীরগতির, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং প্রায়শই অগোচর জলবায়ুর পরিবর্তন—যেমন শহুরে তাপাধিক্য এলাকা, ঘন ঘন বন্যা, উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ এবং বাংলাদেশের জলাবদ্ধতার সম্মিলিত প্রভাব মানবকল্যাণের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের রয়েছে বহুমুখী হুমকি, যা নারীদের, মেয়েদের ও সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। নারী-পুরুষ বৈষম্য, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে মিলিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে। জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়; নারীদের ওপর অবৈতনিক যত্নের কাজের চাপ বাড়ে এবং পুরুষদের স্থানান্তরের কারণে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই, জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি ও অর্ন্তবর্তীকালীন দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত ও মোকাবিলা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

নারী ও পুরুষের উপর জলবায়ু ঝুঁকি ছয় ধরণের লিঙ্গভিত্তিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।[241] এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ক) লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা ও সাংস্কৃতিক চর্চা , যা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারী-পুরুষের শিক্ষা লাভ ও চলাফেরার স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে; খ) নারীদের শারীরিক ও প্রজনন ক্ষমতার পার্থক্য, যা জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের নিরাপত্তা ও শারীরিক ক্ষমতাকে ঝুঁকিতে ফেলে, যেমন: সাঁতার-শেখা; গ) নারী-পুরুষের শ্রমের বিভাজন ও জীবিকার ব্যবস্থা এবং নারীদের বহুমুখী কাজ, যাতে আছে খাদ্য-উৎপাদন ও বিতরণ, পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাপ্রদান ইত্যাদি; যা নারী ও পুরুষদের জীবিকা, অবস্থান ও বাসস্থানের পছন্দ ও অবস্থাকে প্রভাবিত করে; ঘ) আয় ও সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য, যা মূলধন বা সম্পত্তিতে মালিকানা এবং তার ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্য সৃষ্টি করে; ঙ) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে পক্ষপাত, যা নারীদের আগাম ও প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে; এবং চ) লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত ও সূচকের অভাব, প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার-সংবেদনশীল অভিযোজন নীতি ও কৌশল তৈরি করার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং বাধা সৃষ্টি করে।[242]

যদিও দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোতে নারী ও প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তবে এর বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়েছে। ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলেও নারীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় প্রায়ই অংশগ্রহণ করেন না। এছাড়া আদেশাবলির জেন্ডার ও সামাজিক খাতে কাজের বন্টন নির্দিষ্ট করা নেই। নিরাপদ পানি পাওয়া, বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকায় এখনো বড়ো সমস্যা। বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পুরোপুরি বোঝা, নথিভুক্ত করা বা মোকাবিলা করা হয়নি। কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, যেসব নারী লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বাস করেন এবং যাদের নিরাপদ পানির উৎসের অভাব আছে, তারা মাসিক বন্ধ রাখতে গর্ভনিরোধক ব্যবহার করছেন এবং প্রায়ই "নীল শিশু" (অর্থাৎ অক্সিজেনের অভাব নিয়ে জন্মানো শিশু) এর সংখ্যা বাড়ছে। এসব এলাকায় নারীরা সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্যে প্রতি

[241] Jabeen, 2014.
[242] Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan. ফুটনোট ২৪৬-২৫১ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য

১০ জনে ৬ জন “নীল শিশু” জন্ম দেয়। বেশ কিছু গবেষণায় পানীয় জলের লবণাক্ততার সাথে উচ্চ রক্তচাপ, (প্রাক) এক্ল্যাম্পসিয়া, হৃদরোগ, কিডনির কার্যকারিতার প্রতিবন্ধকতা, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি-রোগ, ত্বক ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা, শিশুমৃত্যু, গর্ভাশয়ের ভ্রূণের বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা ও অকাল জন্মের সম্পর্ক দেখা গেছে।[243] যদিও বড়ো সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব যাচাই[244] বাধ্যতামূলক, তবে এগুলো কখনো কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হয়। এর ফলাফল সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয় না এবং নারীদের সাথে পরামর্শ করা হয় না।

১৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৭.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৭.৩.১.১ নীতিসংক্রান্ত

ক) যেসব লবণাক্ততাপ্রবণ ও খরা আক্রান্ত-এলাকায় নারীদের পানিসংগ্রহের জন্য বহুদূর যেতে হয়, ‘পানি আইন, ২০১৩’-এর অধীনে, সেগুলোকে ‘পানি সংকটপূর্ণ’ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা উচিত, যা সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করবে।

১৭.৩.১.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৭.৩.১.২.১ নারী-পুরুষ বিষয় তদারকি বৃদ্ধি।

ক) জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কিত-লিঙ্গা-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিতরণ বৃদ্ধি করা।

খ) পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডারসম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণা-, লেখা, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও উদ্যোগের একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করা।

গ) অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে একটি-পরিবেশ জেন্ডার-সংবেদনশীল সবুজায়ন প্রহড়া কৌশল তৈরি করা এবং তার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ পুলিশ ইউনিট গঠন করা।

ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ১৪ একটি জাতীয় সমন্বয় দল গঠনের প্রস্তাব করেছে যেখানে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

১৭.৩.১.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

ক) প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা নারীদের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা। এ ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যা নারীদের কাছে সহজে তথ্য পৌঁছাতে সক্ষম, বিশেষত যারা সাধারণত জনপরিসরের তুলনায় পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেশি সময় কাটান। নারীদেরকে উদ্ধার কারণ ,কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া-নারীরা দুর্যোগের সময় বাড়িতেই থাকার সম্ভাবনা বেশি যদিও এবিষয়টি দুর্যোগের স্থায়ী আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। [245]

---

[243] A population-based study, conducted in Dacope Upazilla, showed a significant association between consumption of drinking water with high sodium levels and the risk of (pre)eclampsia and gestational hypertension among pregnant women (Khan 2014). Drinking water sources had exceptionally high sodium levels (mean 516.6 mg/L), and women who consumed tube-well water were at a higher disease risk than rainwater users. Khan 2011, Khan 2014, Scheelbeek 2016, Shammi, 2019; Rahman 2023; Costopoulos.

[244] Environmental Impact Assessment (EIA)

[245]Gender and disaster early warning systems in Bangladesh. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৩ দ্রষ্টব্য

১৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৭.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৭.৩.২.১.১ বর্তমান পরিবেশগত আইনগুলোকে জলবায়ু ও জেন্ডার-ন্যায়বিচার একীভূত করার জন্য পর্যালোচনা ও সংস্কার করা যার কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি; বন আইন, জৈব বৈচিত্র্য আইন, পানি আইন ইত্যাদি। এ ছাড়া, বিভিন্ন খাতে বিধি—যেমন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি:, অতিরিক্ত তাপদাহে ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস ও শিল্পকারখানায় করণীয় , কঠিন বর্জ্যব্যবস্থাপনা বিধি—এগুলোকেও পুনরায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। যেহেতু অনেক আইন স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয়, সে ক্ষেত্রে নারীদের স্বাস্থ্যকেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ: পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে, এগুলোকে জেন্ডারভিত্তিক প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করতে পুনঃসংস্করণ করা উচিত।

১৭.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১৭.৩.২.২.১ বিভিন্ন নীতির সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ক) বিদ্যমান পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিগুলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।

খ) জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান আছে, তবে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজন, যা পরিবেশ, জলবায়ু ও জেন্ডারের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে এতে ভূমির অধিকার, বনসম্পদ অধিকার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত করবে।

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাপদাহ বৃদ্ধি, হঠাৎ বন্যা মোকাবেলায় অভিযোজন তহবিল তৈরি-নির্দেশনা এবং অংশীজনের জন্য এ তহবিল সহজলভ্য করা।

১৭.৩.২.২.২ নারীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করে বিভিন্ন নীতি সংস্কার করা।

ক) সামাজিক বনায়ন-সম্পর্কিত নীতিমালায় নারীদের বনরক্ষা ও চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) একটি জাতীয় তাপনিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা সকলের জন্য শীতল ও সবুজ স্থান তৈরি এবং সেগুলোতে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

গ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২-এর ধারা ৪ বি-এর অধীনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা অথবা অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং ঘরের বায়ুর গুণমান উন্নত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ) নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা বৃদ্ধি করা, বিশেষত যারা অনিরাপদ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে—যেমন: প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার, ইটভাটা, জাহাজভাঙা, ব্যাটারিভাঙা ইত্যাদিতে কাজ করেন তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান এবং মজুরি বৈষম্য দূর করা।

ঙ) কৃষিজমির মালিক বা ব্যবহারকারী নারীদের জন্য ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি নীতিগত কাঠামো তৈরি করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে জলবায়ু ও সবুজায়ন বিনিয়োগে নারীর জন্য অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

চ) জলবায়ুজনিত সহিংসতা ও শিশু-কিশোরী বিবাহের ঝুঁকি-বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবিলার নীতিগুলো সংস্কার করা।

১৭.৩.২.৩ *প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত*

১৭.৩.২.৩.১ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ এবং নাগরিকদের প্রতি জবাবদিহি বৃদ্ধি।

ক) নারীদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা' অনুযায়ী প্রতিটি জলবায়ু-প্রকল্পের জন্য একটি জেন্ডার চেকলিস্ট প্রবর্তন করা।

খ) 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনার' অধীনে কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে নারী ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন—কর্মপরিকল্পনার অধীনে নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ অংশে একটি জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন ও শিক্ষা নিয়ে কর্মদল (সুচক ১.১, অধ্যায় ৪ কর্মপরিকল্পনা)-এর ব্যবস্থা আছে, যা জেন্ডার-সংবেদনশীল জলবায়ু পরিবর্তন পাঠ্যক্রম তৈরি করবে, যার মধ্যে নারীদের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন ও এ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

গ) 'পরিবেশগত প্রভাব যাচাই' সমীক্ষার সময় বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের সাথে পরামর্শের ব্যবস্থা থাকা, যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশগত প্রভাব যাচাই এর ফলাফল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা।

ঘ) নারীদের স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১৭.৩.২.৩.২ পরিবেশ ও জলবায়ু প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্তিশালী করা।

ক) জেন্ডার-বিষয়ক সূচক অন্তর্ভুক্ত করে সকল প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা।

খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে তাদের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা যায়।

১৭.৩.২.৩.৩ কৃষক নারীদের জলবায়ু-সহিষ্ণুতা ও অভিযোজনক্ষমতা সৃষ্টি।

ক) বাংলাদেশে কৃষি-শ্রমশক্তির অর্ধেকের বেশি নারী। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিখাতে সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি ও প্রযুক্তি-স্থানান্তর দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে: খরাসহিষ্ণু ফসল, সেচে পানির কার্যকারিতা, জৈব কৃষি, অ্যাগ্রো-ভোলটাইকস ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ।

খ) বিশেষভাবে জলবায়ু সহিষ্ণু ও দ্রুত ফলনশীল বীজ বা কার্যকর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য নারীদের ভর্তুকি প্রদান।

গ) কার্যকর সেচ ও কৃষি উৎপাদনে সৌরশক্তি যুক্ত করার-জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি।

ঘ) কৃষিভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য বিশেষ আর্থিক পরিকল্পনা, প্রণোদনা-সুবিধা ও অন্যান্য সম্প্রসারণ-সেবা চালু করা।

ঙ) জৈব সার-উদ্যোগ ও অ্যাগ্রোইকোলজি নিয়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য মূলধন সরবরাহ করা। কারণ অ্যাগ্রোইকোলজির নীতি রাসায়নিক সার থেকে সরে আসতে এবং দূষণ কমাতে সাহায্য করে, যা মানবস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কমায়, মাটিক্ষয় রোধ করে ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি প্রতিরোধ করে।

১৭.৩.২.৩.৪ নারীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ।

ক) নদীভাঙন ও উপকূলীয় ভূমিক্ষয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

খ) নারীদের নামে জমির রেকর্ড সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা এবং নারীদের মালিকানাধীন কৃষিখামারের জন্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা ।(একাদশ অধ্যায়ে দেখুন)

গ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য পতিত/খাস ভূমি বরাদ্দ করা এবং নারীপ্রধান পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ঘ) যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপকরণ কিংবা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমি বা অন্যান্য অধিকার-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইনগত ও নীতি-সহায়তা প্রদান।

১৭.৩.২.৩.৫ নারীদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ বা ইন্টারসেকশনাল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা বিশেষভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোকে ; গুরুত্ব দেওয়া।

ক) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠী ও তাদের চ্যালেঞ্জগুলো অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন: বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ফলে বিধবা, জেলেদের মৃত্যুর ফলে বিধবা, আদিবাসী নারী, প্রতিবন্ধী নারী, চর ও হাওরাঞ্চলের বাসিন্দা, চা-শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক ও মৎসজীবী নারী।

১৭.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৭.৩.২.৪.১ প্রযুক্তি ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার এবং প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা।

ক) সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে সবুজ জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নারীর জন্য বিশেষ বরাদ্দের তথ্য প্রচার করা এবং ঋণপ্রাপ্তি সহজতর করতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তির পণ্য কেনার জন্য প্রণোদনা, ভর্তুকি বা আর্থিক স্কিম, যেমন: অ্যাগ্রো-ভোলটাইকস ও সোলার সেচ পাম্প প্রদান করা।

খ) কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জলবায়ু উন্নত-স্মার্ট প্রযুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত শিক্ষা কোর্স-প্রণয়ন করে সেগুলো প্রান্তিক জনগণের কাছে, বিশেষ করে নারীদের জন্য সহজলভ্য করা।

গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর বৃহত্তম সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ব্যবস্থা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারীদের নবায়নযোগ্য শক্তিতে প্রবেশাধিকারের জন্য বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করা; আধুনিক সোলার হোম সিস্টেম তৈরি করা এবং নারীদেরকে তাদের শক্তির চাহিদা-সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।

ঘ) সৌর-শক্তিচালিত পণ্য স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া—নারীদের দক্ষতা সৃষ্টি এবং অবশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড নারীদেরকে যন্ত্র-স্থাপন ও মেরামতের কাজে আসতে সহায়তা করতে পারে, যেমন: সোলার সিস্টার প্রোগ্রাম।[246]

ঙ) অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নারীদের উপর ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাই পরিচ্ছন্ন রান্নার চুলার প্রচার করা; বিদ্যমান কর্মসূচিগুলো আরও সম্প্রসারিত করা।

১৭.৩.২.৪.২ নারীদের প্রযুক্তি সক্ষমতা তথা জ্ঞান ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

ক) পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়, বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত ক্ষেত্রগুলিতে নারীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে বৃত্তি প্রদান করা।

খ) আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনা, দর কষাকষি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পরিবেশগত আন্দোলনের সরকারি এবং বেসরকারি কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

---

[246] সোলার সিস্টার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে যান: https://solarsister.org/

১৭.৩.২.৪.৩ নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলা করা।

ক) প্রাকৃতিক বা জলবায়ু বিপর্যয়কালে যখন পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, তখন নারীদের জন্য সরকারের আইনি সহায়তা-প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি আইনি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আইনি ও কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা।

খ) দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকালে যাতে সহিংসতা, হয়রানি ও শোষণ না ঘটে, সে জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির বিধানগুলো খুবই সাধারণ; এগুলোকে আরও বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

গ) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির নির্দেশ মোতাবেক আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করা। যেমন: নারীদের জন্য আলাদা কক্ষ বা জায়গা রাখতে হবে।

১৭.৩.২.৪.৪ নারীদের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষা প্রচলন করা।

ক) জাতীয় পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে। আদিবাসী ভাষা ও ব্রেইল ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উপকরণ তৈরি করা।

খ) গ্রামাঞ্চলে নারীদের জন্য জলবায়ু ও পরিবেশ-সম্পর্কিত সাক্ষরতা কর্মসূচি প্রচলন করা।

গ) নারীদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়, সহায়ক নেটওয়ার্ক ও দেনদরবারের জন্য এলাকাভিত্তিক সহায়কদল তৈরি করা।

১৭.৩.২.৪.৫ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা-প্রয়োজনীয়তা মেটানো।

ক) ত্রাণকার্যক্রমে প্রজননস্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য-বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া এবং বিতরণের জন্য ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রাখা। দুর্যোগের সময় ও পুনর্বাসনকালে গর্ভবতী নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ঘূর্ণিঝড়-কেন্দ্র, বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য অস্থায়ী আশ্রয়ে দুর্যোগের সময় যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সুবিধা ও নিরাপদ পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা।

খ) দূষিত পানি নারীদের উপর অসম প্রভাব ফেলে এবং লবণাক্ত পানিপ্রবাহের কারণে জরায়ুর অসুখের ঝুঁকি বেড়ে যায়— এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ সমস্যার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা জনস্বাস্থ্য-কর্মসূচির অগ্রাধিকার দেওয়া।

১৭.৩.২.৪.৬ বিপর্যয় বা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাস্তুভিটা হারানো নারী ও তাদের পরিবারের জন্য জীবিকা সহায়তা

ক) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাস্তুভিটা হারানো নারীদের এবং যে পরিবারের পুরুষ পরিবারকে রেখে অন্যত্র গেছে, সে সব পরিবারের নারীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে জীবিকা-সহায়তা প্রদান করা।

খ) দুর্যোগের পর নারীদের আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করতে এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা। অভিযোজিত সামাজিক সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্তি এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে এবং অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। (চতুর্দশ অধ্যায় দেখুন)।

১৭.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৭.৩.৩.১ নীতি ও কর্মসূচী

ক) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা নারীদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা ও অভিযোজন সক্ষমতা নিশ্চিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১: প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশনের কাঠামো ও ভূমিকা

১. ভূমিকা ও যৌক্তিকতা

একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন নারীদের অধিকার-সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা-বিষয়ক নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি এবং আইনগত ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রস্তাবনায় বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবিত কাঠামো, কার্যাবলি ও যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন নীতিমালা, আইনি কাঠামো ও কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা এখনো বহুমুখী আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। নারীর উন্নয়নে বিদ্যমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য-নিরসনে সহায়ক পর্যাপ্ত ক্ষমতা, সম্পদ, দক্ষতা, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন নেই। তাই এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে এবং সরকার-কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে একটি আইনগত এবং আর্থিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ কমিশন সরকারের নারী-উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা-বিষয়ক নীতি, কর্মসূচি ও অন্যান্য ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবে, যাতে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নিয়মসমূহ নারীর অবস্থান-উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং জেন্ডার-ন্যায়বিচারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, নারী-অধিকার লঙ্ঘন ও ব্যক্তিগত অভিযোগের বিদ্যমান প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়াগুলোর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা যাবে। কমিশনের অন্যতম প্রধান একটি কাজ হবে নারী ও নারী-পুরুষের সমতা-বিষয়ক গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং সহায়তা করা, যাতে তথ্যউপাত্তভিত্তিক নীতিনির্ধারণ সম্ভব হয়-। কমিশন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সংযোগ ও সংলাপ গড়ে তুলবে, যাতে নারী-পুরুষের সমতার জন্য কার্যকর কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা যায়। নারীর উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা-সংক্রান্ত যে-কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত ও টেকসই সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যেখানে নারীর অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং তাদের সম্ভাবনাগুলো সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারবে।

২. জাতীয় নারী কমিশনের ভূমিকা

২.১ নীতিগত মতামত প্রদান ও আইনি সংস্কার

ক) নারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এমন সকল নীতিগত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

খ) সময় সময় সংবিধানের বিদ্যমান বিধানগুলো ও নারীদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য আইন পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের সুপারিশ করা, যাতে এ ধরনের আইনের যে-কোনো ঘাটতি, অপ্রতুলতা বা ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রতিকারমূলক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

গ) জাতীয় সকল আইনকে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসন সনদ (CEDAW), বেইজিং প্লাটফর্ম ফর একশন (BPfA) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-এর মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার তদারকি করা।

২.২ পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও তদন্ত

ক) অধিকার ও ন্যায়বিচার বিষয়ে প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা।

খ) সংবিধানের বিধান ও নারী-সম্পর্কিত অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করা।

গ) নিম্নোক্ত বিষয়ে পাওয়া অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নোটিশ (suo moto notice) দেওয়া এবং এ ধরনের বিষয়গুলো থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করা।

১। নারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

২। নারীদের সুরক্ষাপ্রদান, সমতা ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন না করা।

৩। নারীদের কষ্ট লাঘব, কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ত্রাণ-প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্ত, নির্দেশিকা বা নির্দেশাবলি না মানা।

ঘ) সংবিধানের বিধান ও নারী-সম্পর্কিত অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করা।

ঙ) সরকারি ও বেসরকারি খাতে নারী-পুরুষের সমতা আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা।

চ) সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কাজের ও সামাজিক সুরক্ষা-সহায়তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা।

ছ) নারীবান্ধব বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের হিসাব ও প্রকল্প-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করা।

জ) স্থানীয় সরকার, সংসদ ও সরকারি প্রশাসন নীতিনির্ধারণী সংস্থায় নারীদের সংখ্যাগত ও গুণগত অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা।

ঝ) পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, উত্যক্তকরণ, ধর্ষণ ,মানবপাচার ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের মামলাগুলোর তদন্ত পর্যবেক্ষণ করা।

ঞ) ভুক্তভোগীদের জন্য আইনি সহায়তা ও সুরক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

ট) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও সরকারি কর্মকর্তাদের জেন্ডার-সংবেদনশীল আচরণ বিষয়ে দক্ষতা-উন্নয়ন ও জবাবদিহি-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করা এবং এগুলো মানসম্মত ও শক্তিশালী করার জন্য পরামর্শ প্রদান।

ঠ) আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনী সদস্যদের দ্বারা নারীর প্রতি অন্যায় আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি জরুরি হস্তক্ষেপের সুপারিশ প্রদান করা।

২.৩ অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা

ক) একটি কার্যকরি অভিযোগ-প্রতিকার ব্যবস্থা স্থাপন করা।

খ) নারীদের অভিযোগ জানানোর জন্য হটলাইন ও অনলাইন পোর্টাল চালু করা এবং সেখানে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা।

গ) কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য সালিশ ও মধ্যস্থতা-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণপরামর্শ দান , ও প্রতিবেদন তৈরি করা।

ঘ) আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও নাগরিক সমাজের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।

২.৪ গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ

ক) নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের ফলে উদ্ভূত নির্দিষ্ট সমস্যা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা বা তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া/আহ্বান জানানো এবং বাধা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার কৌশল সুপারিশ করা।

খ) সকল ক্ষেত্রে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উপায় সুপারিশের জন্য প্রচারমূলক ও শিক্ষামূলক গবেষণা পর্যালোচনা করা।

গ) নারী পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে-বৈষম্য ও বৈষম্যের প্রবণতা চিহ্নিত করা।

ঘ) নারীদের অগ্রগতিতে বাধাসৃষ্টিকারী কারণগুলো চিহ্নিত করা, যেমন: আবাসন ও মৌলিক পরিষেবায় নারীদের অভিগম্যতার অভাব, অপর্যাপ্ত পরিষেবা, নারীদের পরিশ্রম ও পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি ,কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রযুক্তি সম্পর্কিত।

ঙ) প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-নিরীক্ষার জন্য সুপারিশ ও সহায়তা প্রদান করা।

২.৫ নারীদের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ

ক) স্থানীয় সরকার, সংসদ ও নীতিনির্ধারণী সংস্থায় নারীদের সংখ্যাগত ও গুণগত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করা।

খ) নারীদের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বাধা চিহ্নিত করে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া।

৩. জাতীয় নারী কমিশনের আইনি মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও দায়বদ্ধতা

ক) কমিশনটি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ,প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবে।

খ) একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে এটি একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে , যেমন, "বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশন অধ্যাদেশ"। গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হবে। পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার এটিকে "বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশন আইন" নামে অনুমোদন করবে।

গ) এ আইন বাস্তবায়নের জন্য আইন অনুমোদনের এক বছরের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুমোদন করা হবে।

ঘ) জাতীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।

ঙ) কমিশন তথ্য চাওয়া ,সাক্ষী-তলব, মামলা-তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতে পারবে।

চ) প্রতি বছর সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। কমিশন উল্লিখিত সমস্ত প্রতিবেদন সুপারিশ, গৃহীত বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপসহ সংসদের প্রতিটি কক্ষে পেশ করবে।

৪. জাতীয় নারী কমিশনের গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ক) **চেয়ারপারসন:** নারী-পুরুষের সমতা, মানবাধিকার বা আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিবেদিত প্রাণ ও এ বিষয়ে কমপক্ষে ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ নারী।

খ) **সদস্য (৫-৭ জন):** ১৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার-কর্মী, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, উন্নয়নকর্মী। এর মধ্যে কমপক্ষে একজন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (যেমন: আদিবাসী, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী নারী) নারী ও কমপক্ষে একজন সদস্য পুরুষ হবেন।

গ) **সচিব:** ১৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার-কর্মী, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, উন্নয়নকর্মী, যার ভোটাধিকার থাকবে না।

ঘ) **সরকারি সদস্য:** সর্বাধিক ২ জন সদস্য পদাধিকার বলে থাকবেন পরিকল্পনা কমিশন), আইন মন্ত্রণালয়, বা নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমপক্ষে অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার প্রতিনিধি(। তাঁদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

৫. জাতীয় নারী কমিশনের সহযোগী

ক) **পরামর্শদাতা উপদেষ্টা/পরিষদ:** জাতীয় নারী কমিশনের ৫ সদস্য-বিশিষ্ট একটি পরামর্শদাতা পরিষদ থাকবে। এরা হবেন উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিক সমাজ (CSOs), একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধি ও উন্নয়নকর্মী।

খ) **জাতীয় নারী কমিশন সচিবালয়:** কমিশনকে আইন পর্যালোচনা, গবেষণা, বাস্তবায়ন-পর্যবেক্ষণ ও প্রশাসনে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ) প্রশাসনিক ও হিসাব-ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে।

৬. জাতীয় নারী কমিশনের নিয়োগ

ক) বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান সমাজ কল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা কে প্রধান করে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রধান এবং আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫-৭ সদস্যের কমিটি গঠন করবেন। কমিটি প্রথম কমিশনের জন্য উপযুক্ত সদস্যদের নির্বাচন করবেন ও প্রধান উপদেষ্টার কাছে সুপারিশ করবেন। প্রধান উপদেষ্টা/রাষ্ট্রপতি কমিশনের নিয়োগ দেবেন।

খ) পরবর্তী মেয়াদে কমিশনের নির্বাচনের জন্য সংসদের স্পিকার একটি সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন এবং কমিটির সদস্য অর্ধেক সরকারি ও বাকি অর্ধেক বিরোধী দল থেকে থাকবেন।

গ) কমিশনের চেয়ারপারসন পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীর একটি তালিকা উপরিউক্ত সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে এবং তা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার কাছে জমা দেওয়া হবে। তারা তিনটি নাম চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির কাছে নির্বাচনের জন্য পাঠাবেন। নামের বিষয়ে ঐক্যমত্য না হলে উভয়ে দুইটি করে নাম ভিন্ন-ভিন্নভাবে পাঠাতে পারবেন।

ঘ) সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি একটি নাম বাছাই করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিবেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগ প্রদান করা হবে।

ঙ) কমিশনের সদস্য ও পরামর্শকদলের নিয়োগের জন্য প্রতিটি পদের বিপরীতে তিনটি নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে। নির্বাচন কমিটি সমানসংখ্যক ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে।

৭. জাতীয় নারী কমিশন সচিবালয়ের শাখাসমূহ

কমিশন সচিবালয় কাজের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন শাখা নিয়ে গঠিত হতে পারে:

ক) **আইন ও নীতি শাখা:** আইন পর্যালোচনা, আইনি সহায়তা প্রদান ও নীতিমালা সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ প্রদান।

খ) পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত শাখা: নারীর প্রতি বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা (GBV), কর্মস্থলে বৈষম্য ও নারীর অধিকার-লঙ্ঘনের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে তদন্ত করা।

গ) **গবেষণা ও প্রচার শাখা:** নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, প্রতিবেদন তৈরি ও নীতিগত পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালানো।

ঘ) **অভিযোগ ও প্রতিকার শাখা:** নারীদের প্রতি বৈষম্য বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ এবং তাদের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও সুপারিশ করা।

কমিশন নির্দিষ্ট কাজের সহায়তার জন্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কমিটি, উপ-কমিটি বা ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে পারে।

৮. কমিশন ও সদস্যদের মেয়াদ:

কমিশনটি তিন বা চার বছরের জন্য গঠিত হবে। চেয়ারপার্সন ও সদস্যরা সর্বাধিক দুটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য একই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৯. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয়:

বাংলাদেশ নিম্নলিখিত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে:

ক) **ফিলিপাইনের নারী কমিশন:** ফিলিপাইন নারী কমিশন (PCW) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নারীর সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান করে।

খ) **ভারতের জাতীয় নারী কমিশন:** এ কমিশন নারীর অধিকার-লঙ্ঘনের মামলার তদন্ত করে।

গ) **পাকিস্তানের জাতীয় নারী-মর্যাদা কমিশন:** নীতিনির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করে।

ঘ) **নেপালের জাতীয় নারী কমিশন:** নীতিগত সংস্কার ও আইনি সহায়তা নিয়ে কাজ করে।

ঙ) **লাওসের জাতীয় নারী কমিশন:** সমতা-উন্নয়ন, নারীর অধিকার-সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার, নারী-পুরুষের সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিপূরণে কমিশন একাধারে তদারককারী (watchdog), পরামর্শদাতা (advisor) ও প্রয়োগকারী (enforcer) হিসেবে সহায়তা করবে।

সংযুক্তি ২: নারী বিষয়ক সংস্কার উদ্যোগের সময়রেখা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর সম্মানজনক ও সমতার অবস্থান তৈরিতে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার সময়ানুক্রমিক তালিকা নিচে দেওয়া হলো।[247]

বছর	গৃহীত সংস্কার
১৯৭১	২২ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষণের শিকার নারীদেরকে "বীরঙ্গনা" বা যুদ্ধের বীর হিসেবে ঘোষণা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীদের ভূমিকা এবং তাদের যন্ত্রণা ও ত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এবং সরকার এই নারীদের পুনর্বাসনের জন্য সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে, তাদেরকে "ধর্ষণের শিকার" হিসেবে দেখা হত এবং তাদের "ইজ্জতের” বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলা হত।
১৯৭২	বীরঙ্গনাদের পুনর্বাসন করতে কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক প্লানড প্যারেন্টহুড, আন্তর্জাতিক গর্ভপাত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ক্যাথলিক চার্চ থেকে কারিগরি এবং মানবিক সহায়তা দিয়েছিল। গর্ভপাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে এবং দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়া চালু করে, সরকার নারীদের লক্ষ্য করে এবং পারিবারিক বিষয়ে সরকারি উদ্দ্যোগের একটি নজির স্থাপন করে।
	নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সংসদে ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।
	সরকারি চাকরিতে বীরঙ্গনাদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষিত হয়।
	নারীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৭৩	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে প্রথম অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান শুরু হয়।
১৯৭৪	কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থাকে বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়।
১৯৭৫	প্রথম জনসংখ্যা নীতিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যভিত্তিক বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
	দরিদ্র নারীদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদানকেন্দ্রিক ঝুঁকিগ্রস্থ নারী গোষ্ঠী উন্নয়ন (VGD) কর্মসূচি চালু করা হয়।
১৯৭৬	ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ জারির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য দুটি সংরক্ষিত আসন ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল কারণ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে অধিক বৈধতা এবং ভোটারদের প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়।
	সমাজ কল্যাণ দপ্তরে একটি নারী বিষয়ক সেল প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তরে নারী বিষয়ক সহকারী নিয়োগ করা হয়।
	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠিত হয়।
	১৯৭৬ সালে সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য (অফিসারদের জন্য ১০% এবং স্টাফদের জন্য ১৫%) কোটা ঘোষণা করা হয়। আগের বীরাঙ্গনা চাকুরী কোটাতে যথেষ্ট আবেদন না থাকাতে এই কোটা সকল নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়
	জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নারী সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক হিসেবে তাদের অংশগ্রহন ও সংগঠিত হওয়া কে সহায়তা করার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থা (শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে) প্রতিষ্ঠিত হয় ।

[247] Material was collected by BIGD for the ESRC funded project with IDS on Sustaining Power for Women's Rights

বছর	গৃহীত সংস্কার
১৯৭৮	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের মহিলা বিষয়ক বিভাগটি মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। এটি ছিল নারীদের বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহারণ। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটি ছিল সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উক্ত সম্মেলনে জাতিসংঘ ১৯৭৫-৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে, যা ছিল নারীপুরুষ সমতা এবং নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক প্রচেষ্টার সূচনা। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় এই সময়ে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর স্থাপিত হয়।
	কুমিল্লার শাহরাস্তিতে এলেন সাত্তার এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন সংস্থার আওতায় মেয়ে শিশুদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদানের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৭৯	নারী-অধিকার সংস্থাগুলির প্রচারণার ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় সংসদীয় নির্বাচনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ এ উন্নীত করা হয়। তবে, এই বিধান ১৯৮৭ সালে বাতিল হয়ে যায় এবং পরবর্তী তিন বছর জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না।
	যদিও ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি অনুযায়ী গর্ভপাত বেআইনি (একমাত্র নারীর জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম) , তথাপি মাসিক নিয়মিতকরণ পদ্ধতি (MR/MRM) চালু করা হয়, এবং এটি বাংলাদেশের জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অংশ হয়ে ওঠে। এই সরকারী নির্দেশনা আনুষ্ঠানিকভাবে গর্ভপাতের অধিকারকে স্বীকৃতি না দিলেও, একটি প্রক্রিয়ার অধীনে নির্দিষ্ট পরিসরে নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়।
১৯৮০	উপজেলা এবং তার নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার সাথে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যকরভাবে একীভূত করা হয়।
	১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন (Dowry Prohibition Act) অনুমোদন হয়। বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতার (VAWC) অন্যতম সাধারণ কারণ ভাবা হয়েছিল যৌতুক দাবি। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধের উদ্দেশ্যে এই আইন ছিল সাংস্কৃতিগতভাবে প্রচলিত ও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক একটি প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম আইনগত পদক্ষেপ।
	১৯৮০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 'নারী উন্নয়ন কমিশন' গঠন করেন, যেখানে ডা জাফরুল্লাহ চৌধুরী . সদস্য ছিলেন। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নারীর উন্নয়নে সহায়ক নানা নীতিমালা ও কর্মসূচি নেওয়া হয়।
১৯৮২	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে একীভূত করে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর কে এই সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়।
১৯৮৩	১৯৮৩ সালে 'নারীর উপর নির্যাতন প্রতিরোধ শাস্তি আইন' (Cruelty to Women Deterrent Punishment Act) অনুমোদিত হয়। এটি ছিল নারীর উপর সহিংসতা দমনে প্রথম পৃথক আইন। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অপহরণ, নারীদের পাচার, যৌতুকের কারণে মৃত্যু ঘটানো, ধর্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৯০ সালে আরও কঠোর শাস্তির বিধানসহ একটি নতুন আইনের দ্বারা এটি প্রতিস্থাপিত হয়।
১৯৮৪	বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'নারী প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' (CEDAW) অনুমোদন করে, তবে চারটি অনুচ্ছেদে সংরক্ষণ রাখে। সংরক্ষণগুলোর মধ্যে ছিল সমান পারিবারিক অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ২ (যেটি বৈষম্য সংজ্ঞায়িত করে) - যা সনদের মূল ভিত্তি। CEDAW সনদটি ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এটি নারীর অধিকারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সনদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সনদে বৈষম্য নিরসন, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, ও জণপরিসরে নারীর অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, এবং বৈবাহিক জীবন ও পরিবার পরিকল্পনায় সমতার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। CEDAW সনদ অনুমোদনের পর থেকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত আটটি অগ্রগতি প্রতিবেদন CEDAW কমিটিতে জমা দিয়েছে। সরকারি প্রতিবেদনের বিপরীতে নাগরিক সমাজ বিকল্প প্রতিবেদন জমা দিতে পারে। এই প্রক্রিয়া সরকারকে কিছু আইন বা নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে রিপোর্ট জমা দেয়ার আগে অগ্রগতি দেখানো যায়।

বছর	গৃহীত সংস্কার
১৯৮৫	নারীর প্রতি সহিংসতা (VAW) বিষয়ে স্বাধীন ককাস গঠিত হয়।
	১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ (Family Court Ordinance) অনুমোদিত হয়।
১৯৮৭	খাস জমি বণ্টন নীতিমালা' প্রণীত হয়, যেখানে নারীদের জন্য জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়।
১৯৮৯	একটি নতুন 'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়' গঠন করা হয়।
	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UN Child Rights Convention) তৈরি হয় এবং বাংলাদেশ ছিল প্রথম দিককার স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর একটি, যারা শিশুদের চারটি প্রধান অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।
	৮০'র দশকের শেষ দিকে প্রসব সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় 'থ্রি-ডিলে মডেল' (Three Delay Model) চালু করা হয়।
	প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণার জন্য 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অন প্রোমোশন অব এসেনশিয়াল রিপ্রডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড টেকনোলজি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ওপর গবেষণা করার জন্য এটি ছিল দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান।
১৯৯০	সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংসদে নারীদের জন্য ৩০টি আসন পুনর্বহাল করা হয়।
	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের বিষয়ে একটি পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	'মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর' (Directorate of Women's Affairs) 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর' (Department of Women's Affairs) এ উন্নীত করা হয়।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে 'নারী উন্নয়নে (WID) ফোকাল পয়েন্ট' (Women in Development Focal Points) প্রতিষ্ঠা হয়।
১৯৯১	শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। (তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন।)
	যৌনকর্মীদের বাসস্থানের অধিকার নিয়ে 'পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন' (PIL) বা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। নারী আন্দোলন যৌনকর্মীদের কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে। বাংলাদেশ সরকার একটি উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের বাসস্থানের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়।
	জাতীয় মহিলা সংস্থা (JMS) একটি সাংবিধানিক সংস্থা (statutory body) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সব জেলা ও থানায় এর কমিটি গঠিত হয়।
১৯৯২	বাংলাদেশ 'জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন' (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED), যা 'রিও সম্মেলন' (Rio Conference) নামে পরিচিত, তাতে অংশ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জানতে পারে কীভাবে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো নারীদের ওপর প্রভাব ফেলে। নারীর অধিকারকর্মীরাও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে নারীরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, সে বিষয়টি তুলে ধরেন। তারা সেই প্রচলিত ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ করেন যে, নারীদেরকেই পরিবেশের রক্ষক বা পরিচর্যাকারী (nurturer) হতে হবে।

বছর	গৃহীত সংস্কার
১৯৯৩	বাংলাদেশের সালমা খান, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন এবং সদস্য, ওমেন ফর ওমেন, CEDAW কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।
	অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার 'বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন' (World Conference on Human Rights) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম (International Press) ফতোয়ার বিষয়টি আলোচনায় আনে।
১৯৯৪	'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এর নাম পরিবর্তন করে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' (MoWCA) রাখা হয়।
	কায়রোতে 'আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন' (International Conference on Population and Development) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যৌন ও প্রজনন অধিকারকে (Sexual and Reproductive Rights) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়, যেখানে শুধু শারীরিক নয়, মানসিক সুস্থতাকেও অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রজনন দায়িত্ব (Reproductive Responsibility) এবং অবগত সম্মতি (Informed Consent) - এই দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং একটি শক্তিশালী ও প্রগতিশীল (Progressive) অবস্থান নেয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলে নারী সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন ডা. হালিদা হানুম আখতার, নাসরিন হক এবং ডা. শামীম আহমেদ। নারীর স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন কায়রো সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়।
	কায়রো সম্মেলনের পর, এর কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি করার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
	বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য 'মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচি' (Female Secondary School Stipend Program - FSSAP) চালু করা হয়। মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষা সমাপ্তির হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শর্তসাপেক্ষে অর্থ প্রদান কর্মসূচি (Conditional Cash Transfer Program) হিসেবে এটি ছিল একটি পথপ্রদর্শক।
	প্রসূতি ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যেমন: ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট (Family Welfare Assistants - FWA) এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর (Family Welfare Visitors-FWV) নিয়োগ এবং ডাক্তাদের কিছু দায়িত্ব প্যারামেডিকদের কাছে হস্তান্তর করা।
১৯৯৫	গণচীনের রাজধানী বেইজিংয়ে 'চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন' (Fourth World Conference on Women) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (Beijing Platform for Action - BPFA) এবং ঘোষণাপত্র (Declaration) অনুমোদন করে। এখানে নারী সংগঠন ও উন্নয়ন সংগঠন এর শক্তিশালী অংশগ্রহণ ছিল যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অধাপক ডঃ নাজমা চৌধুরী।
১৯৯৬	1995-1997: বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়নে WID (Women in Development) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার পর্যালোচনা করা হয় এবং এটি করার জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়।
	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals --MDGs) কার্যকর হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা ৩-এ নারী পুরুষ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার করা হয়। MDGs একটি কাঠামো প্রদান করে যার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফলাফলের জন্য দেন-দরবার এবং সরকারের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা যায়।

বছর	গৃহীত সংস্কার
১৯৯৭	একটি অপরিহার্য সেবার প্যাকেজ সহ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের কৌশল প্রচারিত হয়।
	বেইজিং ঘোষণাপত্র ও কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে ১২টি মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব দিয়ে সরকারের প্রথম নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই উদ্যোগ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়। এতে সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ছিল।
	প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। এটি ছিল সরকার এবং নারী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফল। তৎকালীন মহিলা বিষয়ক সচিব জনাব আকমল হসেন ও শিরীন হক নেতৃত্ব দেন, এবং অনেক নারী সংগঠন অংশ নেন।
	CEDAW -এ তৃতীয় ও চতুর্থ সাময়িক প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় এবং CEDAW কমিটির সেশনে প্রতিবেদন পর্যালোচনার সময় CEDAW -এ দুটি সংরক্ষণ অপসারণের ঘোষণা করা হয়। ডঃ নাজমা চৌধুরী সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ।
	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) দ্বিতীয় সংশোধনী আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সদস্য পদে তিনটি আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা বাধ্যতামূলক করা হয়। একটি সরকারি সার্কুলার দ্বারা নারী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের কর্তব্য এবং অধিকার নির্ধারণ করা হয়।
	নারীর উপর সহিংসতার (VAW) প্রথম পরীক্ষামূলক জরিপ অনুষ্ঠিত হয় এবং জহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।
	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রানালয়ের অধিনে পলিসি লিডারশীপ ও এডভোকেসি ইউনিট (PLAU) প্রতিস্থিত হয়।
	সালমা খান প্রথম বাংলাদেশী নারী হিসেবে CEDAW কমিটির সভাপ্রধান নির্বাচিত হন।
২০০০	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুমোদিত হয়।
	জাতিসংঘের ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম (UNTOC) বিরোধী সনদ গ্রহণ করা হয়। এর সাথে, মানব পাচার বিশেষত নারী এবং শিশু পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তির প্রটোকল (TIP প্রটোকল) ও গৃহীত হয়।
	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর উপর সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পটি ছিল প্রথম সরকারী পূর্ণাঙ্গ বহু-খাত- বিশিষ্ট উদ্যোগ, যা নারী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় এবং ডেনমার্কের সাহায্যে ডিজাইন করা হয়েছিল। প্রকল্পটি জাতিসংঘের CEDAW-এও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই প্রকল্পের অধীনে, সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং DNA পরীক্ষার সুবিধা চালু করা হয়।
২০০১	যৌনকর্মীদের জীবিকা এবং আশ্রয়ের অধিকার সুরক্ষার পক্ষে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় উচ্চ আদালতের রায় হয় — BSEHR বনাম বাংলাদেশ, রিট পিটিশন নং ২৮৭১/১৯৯৯। রায় ঘোষণা হয় ১৪ মার্চ ২০০০ তারিখে, ৫৩ ডিএলআর (২০০১)।
	মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করা হয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs) শেষের দিকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে, বিশেষ করে মাতৃমৃত্যুর হার কমানো এবং শিশুমৃত্যু হ্রাসে।
	ফতোয়া সংক্রান্ত রায়: উচ্চ আদালত (HCD) পূর্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Suo Moto) জারি করা একটি রুল চূড়ান্ত করে ঘোষণা করে যে সব ধরনের ফতোয়া অবৈধ ও অনুমোদনহীন, এবং ফতোয়া প্রদানের কার্যক্রম সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়। সরকার এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেনি, তবে দুজন ব্যক্তি আপিল করেন এবং চূড়ান্ত আদেশ ও রায় মে ২০১১ সালে ঘোষণা করা হয়।
	মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষার বিষয়ে একটি নির্দেশনা (সার্কুলার) অনুমোদিত হয়, যাতে ইউনিয়ন পর্যায়েই মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষা করার সুযোগ রাখা হয়। এর উদ্দেশ ছিল নারীর জন্য ধর্ষণের প্রমাণ দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করা।
	নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর, বিশেষ করে নারীদের ওপর সহিংসতা বেড়ে যায়, এবং নারীবাদী সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।
	সরকা বনাম মইনুল হক (২০০১) মামলায় পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের ঘটনায় আদালত রায় দেন যে ধর্ষণের মামলায় প্রমাণের দায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর বর্তাবে।

বছর	গৃহীত সংস্কার
২০০২	নারীপক্ষ এবং আইসিডিডিআর'বি যৌথভাবে নারীর উপর সহিংসতা (VAW) বিষয়ক একটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা করে। এটি ছিল বাংলাদেশের নারীদের স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে প্রথম জাতীয় প্রতিবেদন। এটি একটি বহু-দেশীয় গবেষণার অংশ ছিল এবং প্রতিবেদনটি ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়।
	নারীর উপর এসিড সহিংসতা মোকাবিলায় নারী আন্দোলন ও অন্যান্য অধিকার সংগঠনগুলোর জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে "এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২" প্রণীত হয়।
২০০৩	নারীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গিতে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র (PRSP) তৈরি করা হয়, যেখানে নারী সংগঠন সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
	নারী শ্রমিকদের অভিবাসনের ওপর পূর্বের বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। নারী অভিবাসী শ্রমিকদের আন্দোলন এবং গার্মেন্ট শ্রমিকদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়।
২০০৪	সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৫ করা হয়, এবং নির্ধারণ করা হয় যে এই আসনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসন সংখ্যার অনুপাতে বণ্টিত হবে।
	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র যৌথভাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের (MLGRD&C) একটি সার্কুলারের বিরুদ্ধে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানায়, যেখানে নারী ওয়ার্ড কমিশনারদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। উচ্চ আদালত ওই সার্কুলারকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং নিশ্চিত করে যে পুরুষ ও নারী ওয়ার্ড কমিশনারদের দায়িত্ব পালনে সমান ক্ষমতা ও সুযোগ থাকবে। এটি জাতীয় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী সংগঠনগুলোর প্রভাব এবং বিচার ব্যবস্থাকে শাসনব্যবস্থার বিতর্কের একটি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়।
	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পরিমার্জন করা হয় এবং পরে তা উপেক্ষা করা হয়।
২০০৫	নারীর স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বহু দেশীয় গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
	ইউরোপ কাউন্সিলের উদ্যোগে মানব পাচার বিরোধী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত সনদ উন্মুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষর বা অনুসমর্থন করেনি।
২০০৬	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পুনরায় প্রবর্তন করা হয়, যা রক্ষণশীল মহলের মধ্যে বিতর্ক ও প্রতিরোধের সৃষ্টি করে।
	নির্বাচনী সংস্কারের অংশ হিসেবে জনপ্রতিনিধিত্ব (Representation of the People Order) অধ্যাদেশ সংস্কারের সময় নারী সংগঠনগুলোর দেয়া প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছিল । এই বিধান সমূহ পরবর্তী সরকারের আমলে দুর্বল করা হয়।
	তত্ত্বাবধায়ক সরকার নারী অধিকার সংগঠনগুলোকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য একটি জোট গঠনের আহ্বান জানায়। এর ফলে **পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক উদ্যোগ** (Citizen's Initiative against Domestic Violence - CIDV) গঠিত হয়।
	প্রথমবারের মতো কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (Sexual and Reproductive Health and Rights - SRHR) বিষয়ক একটি জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করা হয়।
	গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬" অনুমোদিত হয়। এই আইনে প্রসুতিকালীন ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি, আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র প্রদান এবং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সুবিধাসহ বিভিন্ন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হয়।
	ড. হালিদা হানুম আখতার বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃমৃত্যুর মূল্যায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য "জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার" লাভ করেন।

বছর	গৃহীত সংস্কার
২০০৭	২০০৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে।
২০০৯	জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
	উপজেলা নির্বাচন চালু হয় এবং উপজেলায় নারী সহ সভাপ্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়।
	২০০৯-১০ সালের বাজেটে প্রথমবারের মতো “জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেটিং” (নারীবান্ধব বাজেট) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (BNWLA) বনাম বাংলাদেশ সরকারের রিট পিটিশনের ফলস্বরূপ কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির প্রতিরোধ বিষয়ে উচ্চ আদালত নির্দেশনা প্রদান করে। এটি যৌন হয়রানির একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদানকারী প্রথম আইনগত দলিল এবং এখন পর্যন্ত এটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একমাত্র সুরক্ষামূলক দলিল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।
	পৌরসভা আইন (Municipal Act)-এ একটি ওয়ার্ড কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়, যেখানে ৪০% নারী প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়।
২০১০	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ অনুমোদন হয়। এই আইনে পারিবারিক সহিংসতাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জটিলতা বিবেচনায় রেখে, এই আইনটি আদালতে কোন বিষয় শাস্তিযোগ্য হবে এবং কোন বিষয় কমিউনিটিতে জনপরিসরে সমাধানযোগ্য হবে, তা নির্ধারণে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
	হাইকোর্ট বিভাগ ফতোয়াজনিত সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট রিট পিটিশনগুলোর নিষ্পত্তিতে রায় প্রদান করে। রায়ে স্থানীয় সালিশ বা ফতোয়ার নামে সব ধরনের বাইরের (আদালতের বাইরে) শাস্তি প্রদানকে অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ববিহীন ঘোষণা করা হয়। আদালত আরও ঘোষণা করে, এমন যেকোনো ঘটনায় জড়িত, উপস্থিত, অংশগ্রহণকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি ফৌজদারি আইন অনুযায়ী অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ এর মাধ্যমে আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সমাধানযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়।
২০১১	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (BNWLA) বনাম বাংলাদেশ মামলায় কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনপরিসরে যৌন হয়রানির সংজ্ঞার মধ্যে "উত্যক্তকরণ" (stalking) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এটিকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেন্ডার, এনজিও এবং স্টেকহোল্ডার অংশগ্রহণ ইউনিট (GNSPU) গঠিত হয়। এই ইউনিটের লক্ষ্য ছিলো স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের মূলধারায় জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার ইস্যুতে কাজ করা এনজিওগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করা।
২০১২	বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি গৃহীত হয়।
	২০১২ সালে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন অনুমোদিত হয়।
	২০১২ সালে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন পাস হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক চুক্তির সব বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
	সংসদে কণ্ঠভোটের মাধ্যমে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন পাস করা হয়, যেখানে নিবন্ধন ঐচ্ছিক রাখার বিধান রাখা হয়েছে।

বছর	গৃহীত সংস্কার
২০১৩	জাতীয় নারী নীতির বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।
	সরকার নারীর উপর সহিংসতা (VAW) প্রতিরোধের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করে।
	রানা প্লাজা ধ্বস ২০১৩ - এর পর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০১৩ সংশোধনীতে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্স গঠন, 'ওয়্যার্কার পার্টিসিপেশন কমিটি' (WPC) এবং 'স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি' গঠন এবং এসব ক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, অনেক কারখানায় কাঠামোগত সংস্কার গৃহীত হয়েছে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য 'গ্রিন ফ্যাক্টরি' উদ্যোগ শুরু হয়েছে।
	বিদেশে কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুমোদিত হয়, যা নারী গৃহকর্মীসহ অভিবাসী শ্রমিকদের নিবন্ধন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সমন্বিত যৌন শিক্ষা (Comprehensive Sexuality Education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	শিশু আইন অনুমোদিত হয়, যেখানে ১৯ বছরের নিচে যে কাউকে শিশু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
	পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত আইন অনুমোদিত হয়।
	খসড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা (ccGAP) প্রণয়ন করা হয়।
	তৃতীয় লিঙ্গের জনগণের ভোটাধিকার স্বীকৃতি দিয়ে সরকার গেজেট প্রকাশ করে।
২০১৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে মাসিক নিয়ন্ত্রণ (Menstruation Regulation with Medication - MRM) অনুমোদন দেয়।
	বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি (BNWLA) এবং মিতালী হোসেনের দায়ের করা একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সরকারকে জিজ্ঞাসা করে যে কেন বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করা উচিত নয়।
	বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০-১১-২০১৪ তারিখের মানবসম্পদ বিভাগ-১ এর প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি নং-২১ অনুসারে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি বিভাগে সহ সকল শাখায় নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট (WEDU) গঠিত হয়।
২০১৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয় UNFPA, UNESCO এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থার সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (Adolescent Sexual and Reproductive Health - ASRH) বিষয়ক জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (National Curriculum Framework) উন্নয়ন করেছে।
	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ পাস হয়।
	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ২০১৫ সালের ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো ৪৩ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণা করে এবং তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো একই ধরনের সরকারি সুবিধা প্রদান করে।
	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি পৃথক জেন্ডার কৌশল প্রণয়ন করা হয়।
	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) অনুমোদিত হয়, যা দারিদ্র্যপীড়িত নারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং প্রজনন চাহিদা পূরণের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।
২০১৬	২০১৬ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি প্রণীত হয়। এতে অভিবাসী নারী কর্মীদের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেহেতু তারা কিছু নির্দিষ্ট ধরণের কাজে নিয়োজিত। সরকারকে নারী অভিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়; পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নকেও উৎসাহিত করা হয়েছে।

<table>
<tr><th>বছর</th><th>গৃহীত সংস্কার</th></tr>
<tr><td rowspan="3">২০১৭</td><td>১৯২৯ সালের পুরনো আইন বাতিল করে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুমোদিত হয়, যা নারীদের জন্য বিয়ের ন্যূনতম আইনগত বয়স ১৮ বছর এবং পুরুষদের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করে। তবে, আইনটির ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী "বিশেষ পরিস্থিতিতে" আদালত এবং পিতামাতার সম্মতিতে ন্যূনতম বয়সের নিচেও বিয়ের অনুমতির বিধান রাখায় এটি ব্যাপক সমালোচিত হয়। এই আইনে "বিশেষ পরিস্থিতি" কী, বা এইরকম বিয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স কত হবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।</td></tr>
<tr><td>২০১৭-২০৩০ সময়কালের জন্য কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কৌশল (National Strategy for Adolescent Health) প্রণয়ন করা হয়।</td></tr>
<tr><td>জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">২০১৮</td><td>নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের জন্য নতুন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) অনুমোদিত হয়।</td></tr>
<tr><td>সামাজিক নিরাপত্তার জন্য জেন্ডার নীতি (Gender Policy for Social Security) অনুমোদিত হয়।</td></tr>
<tr><td>হাইকোর্ট ধর্ষণের শিকার নারীদের জন্য 'দুই আঙ্গুলে পরীক্ষা' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।</td></tr>
<tr><td>২০১৮ সালে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন (Dowry Prohibition Act) পাস হয়।</td></tr>
<tr><td>শিশু বিবাহ নির্মূলের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) প্রবর্তন করা হয় যার লক্ষ্য ছিল ১৫ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করা; ১৮ বছরের মেয়েদের মধ্যে বিয়ের হার ২০২১ সালের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কমানো; এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শিশু বিবাহ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা।</td></tr>
<tr><td>২০১৯</td><td>বাংলাদেশ জাতীয় ভোটার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের জন্য একটি বিশেষ ক্যাটাগরি চালু করে।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২০২০</td><td>আদালত সাক্ষীদের অনলাইনে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়।</td></tr>
<tr><td>অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার কৌশলে জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি (Gender Responsive Infrastructure) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।</td></tr>
<tr><td>২০২২</td><td>নভেম্বর ২০২২-এ, "প্রমাণ (সংশোধন) বিল, ২০২২" (The Evidence (Amendment) Bill, 2022) জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়, যাতে আদালতে ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইসঙ্গে, এই আইনে বলা হয় যে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টার মামলায় ভুক্তভোগীর সাধারণ নৈতিক চরিত্র বা পূর্ববর্তী যৌন আচরণের বিষয়ে জেরা করা যাবে না।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">২০২৩</td><td>২০২৩ সালে, সংসদ 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল ২০২৩' অনুমোদন করে, যা শ্রমিক এবং নারীর অধিকার সংক্রান্ত কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, যদিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ রয়ে যায়।</td></tr>
<tr><td>জাতীয় নারী নীতির বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) অনুমোদিত হয়।</td></tr>
<tr><td>স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP) (২০১৭-২০২২) এবং</td></tr>
<tr><td>২০২৩ সালের টেকসই ক্রয় নীতি অনুমোদিত হয়েছে, যা সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২০২৪</td><td>জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা (ccGAP) অনুমোদিত হয়।</td></tr>
<tr><td>দশ সদস্যবিশিষ্ট নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।</td></tr>
<tr><td>২০২৫</td><td>নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন এপ্রিল মাসে জমা হয়।</td></tr>
</table>

সংযুক্তি ৩: তথ্যসূত্র

1. Adams, A. M., Ahmed, S. M., & Evans, T. G. (2018). Universal health care in Bangladesh—Promises and perils. *The Lancet Global Health*, *6*(1), e10–e11. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30470-9

2. Ahmed, N., & Hasan, S. (2017). Alangkar or Ahankar?: Reserved Seat Women Members in the Bangladesh Parliament. In Women in Governing Institutions in South Asia: Parliament, Civil Service and Local Government (pp. 17–40). https://doi.org/10.1007/978-3-319-57475-2_2

3. Ahmed, T. (2016). *Bangladesh reform agenda for local governance*. BRAC Institute for Governance and Development. Dhaka: Prothoma Prokashan.

4. Association for Prevention of Septic Abortion, Bangladesh (BAPSA). (2017). *Menstrual Regulation and Unsafe Abortion in Bangladesh*. Guttmacher Institute. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/menstrual-regulation-unsafe-abortion-bangladesh.pdf

5. Azad, M. (2019). *Sexual Harassment against Girls and Women at Public Places: A Study to Assess the Trend* (p. 30) [Research report]. National Girl Child Advocacy Forum. https://girlchildforum.org/wp-content/uploads/2020/03/REPORT-ON-SEXUAL-HARASSMENT.pdf

6. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). (2023). *Bangladesh Education Statistics 2022*. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). https://banbeis.portal.gov.bd/sites/default/files/files/banbeis.portal.gov.bd/page/6d10c6e9_d26c_4b9b_9c7f_770f9c68df7c/Bangladesh%20Education%20Statistics%202022%20%281%29_compressed.pdf

7. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), & UN Women Bangladesh. (2023). *Time Use Survey 2021* https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-07-23-04-53-6417fa2e9d03538a1342942614845984.pdf

8. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2020). *Wholesale and Retail Trade Survey 2020* (p. 14). Bangladesh Bureau of Statistics. https://bbs.gov.bd/site/page/175a795a-df34-4118-9ed6-1ec769fa03de/-

9. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2022). *Population and Housing Census 2022*. Bangladesh Bureau of Statistics. https://bbs.portal.gov.bd/site/page/b432a7e5-8b4d-4dac-a76c-a9be4e85828c

10. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2023a). *Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2022*. Bangladesh Bureau of Statistics. https://bbs.gov.bd/site/page/b588b454-0f88-4679-bf20-90e06dc1d10b/-

11. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2023b). *Labour Force Survey 2022* (p. 200). Bangladesh Bureau of Statistics. https://bbs.gov.bd/site/page/111d09ce-718a-4ae6-8188-f7d938ada348/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F

12. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2024). *Bangladesh Sample Vital Statistics 2023*. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning. https://bbs.gov.bd/site/page/ef4d6756-2685-485a-b707-aa2d96bd4c6c/-

13. Bangladesh Climate Change Trust & UN Women Bangladesh. (2024). *Bangladesh climate change and gender action plan 2023.*

14. Barkat, A., & Ahsan, M. (2014). *Gender and migration from Bangladesh: Mainstreaming migration into the national development plans from a gender perspective*. International Labour Organization (ILO), ILO Country Office for Bangladesh. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_310411.pdf

15. Boerma, T., Eozenou, P., Evans, D., Evans, T., Kieny, M.-P., & Wagstaff, A. (2014). Monitoring progress towards universal health coverage at country and global levels. *PLoS Medicine*, *11*(9), e1001731. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001731

16. Chowdhury, A. M. R., Bhuiya, A., Chowdhury, M. E., Rasheed, S., Hussain, Z., & Chen, L. C. (2013). The Bangladesh paradox: Exceptional health achievement despite economic poverty. *The Lancet*, *382*(9906), 1734–1745. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62148-0

17. Chowdhury, N. (2002, September). *The implementation of quotas: Bangladesh experience—Dependence and marginality in politics.* In *International IDEA Workshop "The Implementation of Quotas: Asian Experiences"*, Jakarta, Indonesia (Vol. 25).

18. Costopoulos, E., Imamura, A., Khan, N., Butler, A., Millett, C., Hoque, M., et al. (n.d.). *Adverse health outcomes associated with drinking high-salinity water* (Unpublished manuscript).

19. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1897-4. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

20. Dhali, B. (2020, November 9). Never-ending woes of female migrant workers. *Dhaka Tribune*. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/migration/229554/never-ending-woes-of-female-migrant-workers

21. Djerf-Pierre, Monika, & Maria Edström. (2020). The GEM-Index: Constructing a unitary measure of gender equality in the news. In Monika Djerf-Pierre, & Maria Edström (Eds.), *Comparing gender and media equality across the globe: A cross-national study of the qualities, causes, and consequences of gender equality in and through the news media* (pp.59-98). University of Gothenburg Sweden: Nordicom

22. Dr. Iftekharuzzaman. (2022, April 10). *Draft mass media employees bill: Towards stricter control?* Transparency International Bangladesh. https://ti-bangladesh.org/articles/commentary/6439

23. Eckstein, D., Kunzel, V., & Schafer, L. (2021). *Global Climate Risk Index 2021: Who sufferes most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2019 and 2000-2019* [Briefing Paper]. Germanwatch. https://www.germanwatch.org/en/node/19777

24. Enokwenw, O., Garner, E., & Karanja, A. (2024). *Women's land rights in Bangladesh: Securing women's resource rights through gender transformative approaches.* Global Initiative for Gender Transformative Approaches for Securing Women's Resource Rights (WRR), Center for International Forestry Research (CIFOR) & World Agroforestry (ICRAF). https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/Books/Socio-legal-review-Bangladesh.pdf

25. Fatima, K., Khanam, S. J., Rahman, M. M., Kabir, M. I., & Khan, M. N. (2024). Clustering of home delivery in Bangladesh and its predictors: Evidence from the linked household and health facility level survey data. *PLOS Global Public Health*, *4*(2), e0002607. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002607

26. Finance Division. (2024). *Social Security Programs: Fiscal Year 2023-24*. Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. https://mof.gov.bd/site/page/5f9be3bc-923f-4c27-8a65-c5e7fe417945/Social-Security-Programs

27. Fox, W. F., & Menon, B. (2008). Decentralization in Bangladesh: Change Has Been Elusive. *International Center for Public Policy Working Paper Series, at Andrew Young School of Policy Studies (AYSPS), Georgia State University(GSU)*, Article paper0829. https://ideas.repec.org//p/ays/ispwps/paper0829.html

28. Hasan, E., & Das, D. (2025, February 2). Diversifying Female Employment Beyond the RMG Sector. *Sanem Core*. https://sanemblog.org/2025/02/diversifying-female-employment-beyond-the-rmg-sector/

29. Hasan, Md. R., Nasreen, M., & Chowdhury, Md. A. (2019). Gender-inclusive disaster management policy in Bangladesh: A content analysis of national and international regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *41*. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101324

30. Heise, L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., Zewdie, D., Darmstadt, G. L., Greene, M. E., Hawkes, S., Heise, L., Henry, S., Heymann, J., Klugman, J., Levine, R., Raj, A., & Gupta, G. R. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: Framing the challenges to health. *The Lancet*, *393*(10189), 2440–2454. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30652-X

31. Hossain, Mr. J. S. M., & Siddiqui, Mr. J. Q. I. (2009). *Writ Petition No. 5916 of 2008*. Supreme Court of Bangladesh. https://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/276907_Writ_Petition_5916_08.pdf

32. Hossain, N., & Akhter, S. (2011). *Gender, Power and Politics in Bangladesh: A study for the Upazila Support Project.* Dhaka: UNDP. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1671.0561

33. Islam, Dr. Md. N. (2008). *Gender Analysis of Migration from Bangladesh*. Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET). https://bmet.gov.bd/site/view/publications/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-

34. Islam, Dr. Md. N. (2010). *Women Migrants Situation: (Profile of women migrants, causes, problems & prospects of migration*. Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET). https://bmet.gov.bd/site/publications/64c8b0f7-eef6-4c9b-8116-12cb8906816e/Survey-on-Female-migrant

35. Jabeen, H. (2014). Adapting the built environment: The role of gender in shaping vulnerability and resilience to climate extremes in Dhaka. *Environment & Urbanization*, *26*(1), 147–165. https://doi.org/10.1177/0956247813517851

36. Khan, A. E., Ireson, A., Kovats, S., Mojumder, S. K., Khusru, A., Rahman, A., & Vineis, P. (2011). Drinking Water Salinity and Maternal Health in Coastal Bangladesh: Implications of Climate Change. *Environmental Health Perspectives*, *119*(9), 1328–1332. https://doi.org/10.1289/ehp.1002804

37. Khan, A. E., Scheelbeek, P. F. D., Shilpi, A. B., Chan, Q., Mojumder, S. K., Rahman, A., Haines, A., & Vineis, P. (2014). Salinity in drinking water and the risk of (pre)eclampsia and gestational hypertension in coastal Bangladesh: A case-control study. *PloS One*, *9*(9), e108715. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108715

38. Khan, M. Z. H., & Rabbi, S. E. (2021). *Assessment of Climate Induced Migrant Women in Bangladesh: A Case for Dhaka Based Slum Dwellers*. Bangladesh Nari Sramik Kendra (BNSK).https://www.indiaspend.com/h-library/assessment-of-climate-induced-migrant women-in-bangladeshzhkhanci.pdf

39. Khan, Z. R., & Mohsin, A. (2008). *Women's empowerment through local governance: Emerging issues and debates*. Paper presented at the Pathways of Women's Empowerment RPC Mid-Term Review Conference, Cairo, 20–24 January 2009.

40. Management and Resource Development Initiative (MRDI). (2022). *Gender Equality and Media Regulation Study Bangladesh*. https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2023/03/GMR-BANGLADESH-REPORT.pdf

41. Management and Resource Development Initiative (MRDI). (2023). *Women and Hijras in Bangladeshi News Media*. https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2023/04/Women-and-Hijras-in-Bangladeshi-News-Media-1.pdf

42. Ministry of Public Administration (MoPA). (2023). *Statistics of Government Servants 2022*. Ministry of Public Administration. https://www.mopa.gov.bd/site/mopa_report_publication/d8ea2eb9-75d5-4afe-a4d5-2dbf04b29e85/ সরকারি২০২২-পরিসংখ্যান-কর্মচারীদের-

43. Ministry of Women and Children's Affair. (2023). *National Action Plan (2021-2030) for the Implementation of the National Women's Development Policy 2011*. Ministry of Women and Children's Affair.

44. Moser, C., Norton, A., Stein, A., & Georgieva, S. (2010). *Pro-poor adaptation to climate change in urban centers: Case studies of vulnerability and resilience in Kenya and Nicaragua.* World Bank. http://hdl.handle.net/10986/3001

45. Mridha, R. U. (2024, September 21). Unrest emerges as a new threat to RMG recovery. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/business/economy/news/unrest-emerges-new-threat-rmg-recovery-3707986

46. Nasreen, M. (1995). *Coping with floods: The experience of rural women in Bangladesh* (Unpublished doctoral dissertation). Massey University, New Zealand.

47. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. (2023). *Bangladesh Demographic and Health Survey 2022: Key Indicators Report*. NIPORT and ICF. https://niport.portal.gov.bd/sites/default/files/files/niport.portal.gov.bd/miscellaneousinfo/5585841a_d4fe_405c_b235_fbc4873ae742/2023-04-17-03-16-9833e31b63e1944d5796a1e4ec40d708.pdf

48. Nazneen, S., & Tasneem, S. (2010). A Silver Lining: Women in Reserved Seats in Local Government in Bangladesh. *IDS Bulletin*, *41*, 35–42. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2010.00164.x

49. Nazneen, S., Ehsan, I., & Hasan, B. (2014). Exceptional women: Reserved councillors in municipal corporations in Bangladesh. In M. Tadros (Ed.), *Women in politics: Gender, power and development*. Zed Books. https://www.researchgate.net/publication/316481704_Exceptional_Women_ReservedCouncillors_in_Municipal_Government_in_Bangladesh

50. OKUP. (2019). *Policy Brief: Health Risk of Migrant Workers: Challenges and Scopes of Improvement*. OKUP. https://www.okup.org.bd/wp-content/uploads/2019/07/Policy_Brief_Health_Risk_Migrant_workers.pdf

51. Panday, P. K. (2013). *Impact study on women empowerment through effective, transparent, and inclusive local governance (Sharique case)*. Report prepared for Sharique, Local Governance Programme.

52. Panday, P., & Feldman, S. (2015). Mainstreaming Gender in Politics in Bangladesh: Role of NGOs. *Asian Journal of Political Science*, *23*, 1–20. https://doi.org/10.1080/02185377.2015.1055772

53. Rabbi, Md. Z. (2024, March 11). 79% female commuters in Dhaka experience sexual harassment on public transport: Research says. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/tech-startup/news/79-female-commuters-dhaka-experience-sexual-harassment-public-transport-research-says-3564351

54. Rahman, M. S., Rahman, M. M., Gilmour, S., Swe, K. T., Abe, S. K., & Shibuya, K. (2018). Trends in, and projections of, indicators of universal health coverage in Bangladesh, 1995–2030: A Bayesian analysis of population-based household data. *The Lancet Global Health*, *6*(1), e84–e94. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30413-8

55. Rana, M. (2025, March 8). সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিসি ও সচিব এখন নারী. *jagonews24.com*. https://www.jagonews24.com/women-and-children/article/1006422

56. Sardar, A. (2024, March 14). How national footballer Razia Sultana died. *Dhaka Tribune*. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/341811/how-national-footballer-razia-sultana-died

57. Scheelbeek, P. F. D., Khan, A. E., Mojumder, S., Elliott, P., & Vineis, P. (2016). Drinking Water Sodium and Elevated Blood Pressure of Healthy Pregnant Women in Salinity-Affected Coastal Areas. *Hypertension (Dallas, Tex.: 1979)*, *68*(2), 464–470. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07743

58. Shamim, I., & Holliday, J. (2018). *Women and Migration in Bangladesh*. UN Women. https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2018/03/Country-Overview-on-UN-WOMEN-migration.pdf

59. Shammi, M., Rahman, M. M., Bondad, S. E., & Bodrud-Doza, M. (2019). Impacts of Salinity Intrusion in Community Health: A Review of Experiences on Drinking Water Sodium from Coastal Areas of Bangladesh. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, *7*(1), 50. https://doi.org/10.3390/healthcare7010050

60. Siddiqa, N., & Braga, A. (2019). *Barriers to STEM education for rural girls: A missing link to innovation for a better Bangladesh* (p. 21). Center for Universal Education at Brookings. https://www.brookings.edu/articles/barriers-to-stem-education-for-rural-girls/

61. Siddiqui, T. (2008). *Migration and Gender in Asia*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_egm_200809_paper_siddiqui_mig_gender_asia.pdf

62. Siddiqui, T. (2023). *Death of Bangladeshi Female Labour Migrants in Destination Countries*. The Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU). https://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2023/10/Death-of-Women-Migrants-in-Destination-Countries.pdf

63. Sultan, M., Hasan, B., Khondaker, S. I., Enam, A. A., Mahmood, T. I., & Nazneen, S. (2016). *Women's representation in the union parishad*. BRAC Institute of Governance and Development (BIGD). https://dspace.bracu.ac.bd:8443/xmlui/handle/10361/10995

64. Task Force Committee. (2025). *Re-strategising the Economy and Mobilizing Resources for Equitable and Sustainable Development. Dhaka: Government of Bangladesh*. https://plandiv.gov.bd/site/notices/157583e9-4cc8-4f8f-9d9e-e624e3f0141f/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8

65. The Business Standard. (2019, December 5). High Court allows organ donation beyond relatives. *The Business Standard*. https://www.tbsnews.net/bangladesh/high-court-allows-organ-donation-beyond-relatives

66. *The Business Standard. (2025, February 11). ২০২৩–২৪ অর্থবছরে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি শিল্প খাতে: বিবিএস-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন.* *The Business Standard*. https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF/news-details-310526

67. The Daily Star. (2025, March 19). Barriers to Ensuring Women's Land Rights and the Way Forward. *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/roundtables/news/barriers-ensuring-womens-land-rights-and-the-way-forward-3851936

68. The Glocal Cancer Observatory. (2024). *Globocan 2022: Bangladesh*. World Health Organization. https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/50-bangladesh-fact-sheet.pdf

69. UN Womwn. (2023). *Gender and disaster early warning systems in Bangladesh* (p. 88) [Assessments]. UN Women. https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/08/gender-and-disaster-early-warning-systems-in-bangladesh

70. United Nations Children's Fund. (2020). *Ending Child Marriage: A profile of progress in Bangladesh*. UNICEF. https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/ending-child-marriage

71. World Bank Group. (2022). *Bangladesh—Country Climate and Development Report* (No. 177262; CCDR Series). World Bank Group.
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/en/099510110202254063

72. World Bank. (2022). *World Bank Open Data*. World Bank Group. https://data.worldbank.org

73. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023* (p. 382). World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/

74. World Food Programme (WFP). (2025). *Bangladesh Market Monitor (December 2024)* (p. 4). World Food Programme. https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-market-monitor-december-2024

75. Yi, E. J. A. (2022). Supporting Women Fish Farmers in Bangladesh to Recover Pandemic Losses. *World Bank Blogs*. https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/supporting-women-fish-farmers-bangladesh-recover-pandemic-losses

76. Zaman, K. T. (2022, September 24). Do we really know how to celebrate our champions? *The Daily Star*. https://www.thedailystar.net/life-living/news/bangladesh-womens-football-team-do-we-really-know-how-celebrate-our-champions-3127026

77. আহাম্মেদ, জুবায়ের (2024, December 24a). ক্রীড়াঙ্গনে আর্থিক অসমতা: ক্রিকেটই সর্বেসর্বা, বাকিদের দৈন্যদশা. dhakapost.com. https://www.dhakapost.com/sports/331712

78. *আহাম্মেদ, জুবায়ের (2024, December 29b). ক্রীড়াঙ্গনে আর্থিক অসমতাবেতন আরস্পম্পরহীনতায়: অ্যাথলেটরা. dhakapost.com*. https://www.dhakapost.com/sports/332762

79. ডালিম, মেহেদী হাসান. (2025, March 8). *উচ্চ আদালতে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন ৯ নারী বিচারপতি.* dhakapost.com. https://www.dhakapost.com/law-courts/349291

80. যূথী, জান্নাতুল (2022, October 3). ক্রীড়াঙ্গনে নারী.পুরুষের এত বৈষম্য কেন- *songbadprokash.com*. https://www.songbadprokash.com/opinion/why-is-there-so-much-discrimination-between-men-and-women-in-sports/35617

81. হাসান, ইশরাত (2023, June 12). সাইবারক্রাইম এবং অনলাইনে নারীর নিরাপত্তা. *Prothomalo*. https://www.prothomalo.com/bangladesh/9jb3rq7v01

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন
জয়িতা টাওয়ার (লেভেল-৮), সড়ক ২৭ (পুরাতন), ১৬ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা।